ভারত
ইতিহাসের
ধারা
নবম শ্রেণীর জন্য
ডক্টর নিমাই সাধন বসু

Approved as a textbook by the West Bengal Board of Secondary Education. Vide Notification No. TB/74/IX/H/19, dated 24. 11. 75

ভারত-ইতিহাসের ধারা

প্রথম খণ্ড

(নবম শ্রেণীর জন্য)

ডক্টর নিমাইসাধন বসু, এম. এ. (ক্যাল.), পি-এইচ্. ডি. (লণ্ডন), ডি. লিট্. (লণ্ডন),
প্রফেসর অফ্ হিস্ট্রি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ;
ভূতপূর্ব রিসার্চ ফেলো, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়
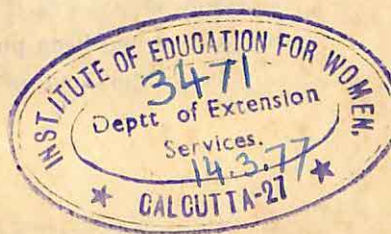
দি ম্যাকমিলান কোম্পানি অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
২৯৪, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১৯৭৬

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রবর্তিত নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে 'ভারত-ইতিহাসের ধারা' রচিত হয়েছে। নীরস ও অপ্রয়োজনীয় নাম, সন-তারিখ, ঘটনা ইত্যাদি উল্লেখ করে ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিশক্তি ভারাক্রান্ত ও ইতিহাসপাঠে নিরুৎসাহ না করে তাদের ভারতীয় ইতিহাসের মূলধারা ও বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচিত করার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ও আধুনিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান সন্নিবিষ্ট করে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে সম্ভাব্য প্রশ্ন ও তার উত্তর-সংকেত পরিশেষে যোগ করা হয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরের প্রতি দৃষ্টি রেখে পাঠ্যপুস্তক রচিত হওয়া উচিত নয়। জাতীয় ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিস্ফুট হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই গ্রন্থ রচনাকালে সীমিত পরিসরের মধ্যেও সেই দিকে লক্ষ্য রেখেছি। ভারতের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য, ভারত-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতির উন্মেষ, ধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শ ও ঐতিহ্য, বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবদান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করে তোলা এই গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য। কতখানি সফল হয়েছি তার বিচার করবেন সহৃদয় শিক্ষকমণ্ডলী। এই গ্রন্থের ভবিষ্যৎ উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত অমূল্য ও অপরিহার্য বলে মনে করি।

ইতিহাস বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩

নিমাইসাধন বসু

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 'ভারত-ইতিহাসের ধারা'র প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে বইটি অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ও অনুসন্ধিৎসু ছাত্রছাত্রীদের অনুমোদন লাভ করেছে। সময়ের স্বল্পতা সত্ত্বেও কেবলমাত্র পুনর্মুদ্রণ না করে বইটির উৎকর্ষ-বৃদ্ধির চেষ্টা করেছি। কিছু নতুন তথ্য এবং পরিশেষে বিষয়মুখ প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। এই সুযোগে শিক্ষকমণ্ডলীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যে সব শিক্ষক তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত জানিয়েছেন, তাঁদের জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪

নিমাইসাধন বসু

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'ভারত-ইতিহাসের ধারা'র দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু সময়স্বল্পতার জন্য নতুন সংস্করণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সংস্করণে মানচিত্রে ঐতিহাসিক স্থান নির্দেশে (Map-pointing) ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য দুটি ভৌগোলিক রেখাচিত্র সংযোজন করা হয়েছে। কিছু কিছু নতুন তথ্যও যোগ করা হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলীর নতুন ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নমুনা প্রশ্নগুলির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করেছি। আশা করি শিক্ষকমণ্ডলী পূর্বের মত তাঁদের অভিমত জানিয়ে বইটির উৎকর্ষ সাধনে সহযোগিতা করবেন।

নিমাই সাধন বসু

১৫ এপ্রিল, ১৯৭৬
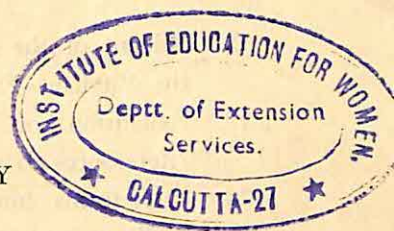
SYLLABUS IN HISTORY

For Class IX

1. Geography: Its influence on the country, its people and History. Elements of India's population—Evolution of composite culture—Fundamental unity.
2. Source material: Ancient, medieval and modern period.
3. Antiquity of India and her civilisation. Indus Valley Civilisation. Coming of the Aryans, Civilisation and religion as revealed in the Vedas and the Upanishads.
4. Growth of Jainism and Buddhism.
5. (*i*) Foreign invasions: Persian, Greek (Macedonian and Bactrian), Scythian (Saka-Parthians, Kusanas and Huns).
   (*ii*) General nature of resistance. Impact of foreign inroads on the social and cultural life. Redisposition of Indian Society: Rise of the Rajputs.
6. Bid towards Imperial Unity: its different phases: Under Magadha: (*i*) From Bimbisara to Asoka. (*ii*) Chandragupta I to Skandagupta. Under Kanauj: From Pusyabhuti Harsha to Pratihara Mahendrapala. Under Gauda: From Sasanka to Devapala.
7. Society and Culture (in North and South India) from the 4th Century B.C. to the 14th Century A.D.
8. Indian Culture and Civilisation beyond India.
9. (*a*) Rise, growth and decline of Tuco-Afghan Power.
   (*b*) Rise, growth and decline of Mughal Power in India.
10. Impact of Mahomedan rule on social and economic life on art, architecture, literature, language and religion. Religious reformers.
11. (*a*) The Mahrattas: From Sivaji to Baji Rao-II (in outline).
    (*b*) The Sikhs: from Nanaka's successors to Ranjit Singh (in outline).

12. Advent of the Europeans: Their rivalries: Emergence of the English—From Trade to Political domination.
13. Expansion of British Power from Clive to Dalhousie (References to wars with the Sikhs, in outline).
14. (*i*) Reforms under Warren Hastings, Cornwallis, Bentinck, Ripon and Dalhousie.

    (*ii*) Social, cultural and religious reforms under Indian initiative.

    Rammohan Roy, Derozio and Young Bengal, Brahma Samaj leaders, Iswar Chandra Vidyasagar, Syed Ahmed Khan, Prarthana Samaj, Dayananda, Ramkrishna Paramhansa.
15. Reaction against British rule. Background of the Mutiny and Revolt of 1857—causes, progress, nature. Its outcome. End of the rule of the East India Company. India on the threshold of a new era.

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক প্রভাব

অজ্ঞাত-পরিচয় ও স্মৃতিলুপ্ত কোন ব্যক্তি যেমন অসহায় ও করুণার পাত্র তেমনি 'ইতিহাস'-বিহীন দেশ বা জাতি সম্মান ও মর্যাদা লাভে বঞ্চিত।

ভূমিকা

ইতিহাসের নায়ক মানুষ। তার প্রচেষ্টা, প্রয়াস, চিন্তা, সংগ্রাম ও পরিবর্তনই ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু। রাজা-মহারাজার ব্যক্তিগত কাহিনী, রাজ্যজয় বা যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণই কোন দেশের প্রকৃত ইতিহাস হতে পারে না। সাধারণ মানুষের নিরন্তর অগ্রগতির সংগ্রামই ইতিহাসের মূখ্য প্রসঙ্গ।

অতীতের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা ভবিষ্যতের পথনির্দেশ করে। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুশীলন সাহস, আত্মবিশ্বাস ও স্বদেশপ্রেমের উন্মেষে

ইতিহাস-চর্চার গুরুত্ব

সাহায্য করে। বহু দেশের মানুষ তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অতীত গৌরব ও ঐতিহ্য স্মরণ করে মানসিক বল ও দৃঢ়তা অর্জন করেছে। আধুনিক ভারতবর্ষেও দেশাত্মবোধের বিকাশে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ইতিহাস-চর্চার অসামান্য অবদান আছে।

যে কোন দেশের ইতিহাসের সঙ্গে ভৌগোলিক পরিবেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা 'নীল নদের দান' রূপে খ্যাত।

ইতিহাস ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক

সুমের ও ব্যাবিলনের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী এবং তাদের উপত্যকাকে কেন্দ্র করে। ভৌগোলিক পরিবেশ প্রাচীন গ্রীসদেশের অধিবাসীদের সামুদ্রিক বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনে সহায়তা করেছিল। পৃথিবীব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান ভিত্তি ছিল বৃটিশ নৌশক্তি। চারিদিকে জল-পরিবেষ্টিত দ্বীপে বাস করার জন্যই ইংরাজ জাতি নৌবাহিনীর বিশেষ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী ও চারিত্রিক গঠন ঐ দেশের ভৌগোলিক সীমানার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস ও জীবন এই ঐতিহাসিক সত্যের ব্যতিক্রম নয়।

ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ

প্রকৃতিদেবী অকৃপণ হাতে ভারতভূমিকে সৌন্দর্যভূষিত করেছেন। 'ভুবনমনোমোহিনী' ভারতবর্ষ কবির কল্পনায় চিন্ময়ীরূপ ধারণ করেছে।

হিমালয় পর্বত

ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রধান বৈচিত্র্য হল উত্তরের হিমালয় পর্বতশ্রেণী। পূর্ব পশ্চিম দুই দিকেই তার গগনচুম্বী বিপুল বিশাল বিস্তার। ভারতের দুই প্রধান নদী গঙ্গা ও সিন্ধুর উৎসস্থল হিমালয়। ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত সু-উচ্চ সুবিস্তৃত বিন্ধ্য

পর্বত ভারতবর্ষকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। উত্তর দিকে হিমালয় থেকে দক্ষিণের বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত অঞ্চলটির নাম **আর্যাবর্ত** বা **উত্তরাপথ**।
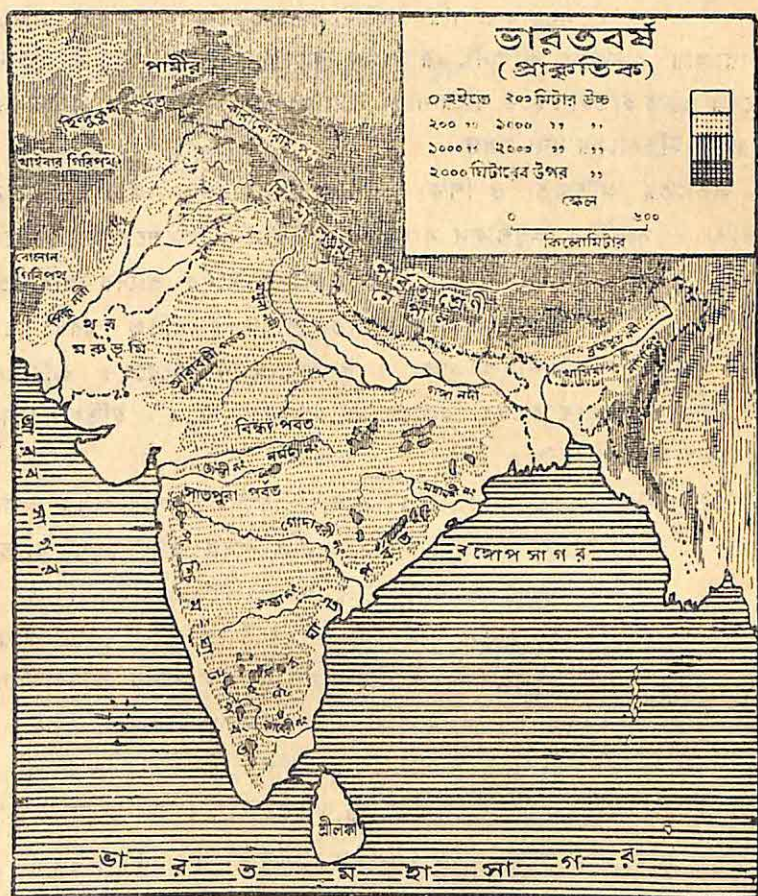
আর বিন্ধ্য থেকে দক্ষিণ প্রান্তের সমুদ্র পর্যন্ত অঞ্চলটির নাম **দাক্ষিণাত্য** বা **দক্ষিণাপথ**। প্রাকৃতিক বিভাগ অনুসারে ভারতবর্ষকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ—

বিন্ধ্য পর্বত

(১) **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ঃ** হিমালয়-সংলগ্ন কাশ্মীর, কাংড়া, নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি রাজ্য এই অঞ্চলভুক্ত। এই ভূভাগকে 'হিমালয় প্রদেশ' বলা হয়।

ভারতবর্ষের প্রধান পাঁচটি প্রাকৃতিক বিভাগ

(২) **সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমতল অঞ্চল ঃ** ভারতের ইতিহাসে এই অঞ্চলটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কারণ হিমালয় থেকে উৎসারিত সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা এবং ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত সমতল প্রদেশেই বহু প্রাচীন সাম্রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই অঞ্চলটিই 'হিন্দুস্থান' নামে পরিচিত। সিন্ধু নদের নিম্ন উপত্যকার সিন্ধু প্রদেশ এখন পাকিস্তান সীমানাভুক্ত।

(৩) **মধ্যভারতের মালভূমি ঃ** 'হিন্দুস্থান' নামে পরিচিত অঞ্চলের দক্ষিণে এবং বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর উত্তরে এই অঞ্চলটির অবস্থান।

(৪) **দক্ষিণাপথের মালভূমি ঃ** বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণী দক্ষিণ দিকে দাক্ষিণাত্যের এই অধিত্যকা। এই সুবিশাল অঞ্চলের পশ্চিম দিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং পূর্ব দিকে পূর্বঘাট পর্বতমালা। গোদাবরী, কাবেরী, কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী এই অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করেছে।

(৫) **সুদূর দাক্ষিণাত্য ঃ** কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ থেকে সুরু করে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত মালভূমি অঞ্চলকে 'সুদূর দাক্ষিণাত্য' বলা হয়ে থাকে।

ভারতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

পর্বতশ্রেণী ও অসংখ্য ছোটবড় নদনদী ভারতের ইতিহাস ও জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। গিরিরাজ হিমালয় উত্তর সীমান্তে ভারতবর্ষকে এশিয়া মহাদেশ তথা বিশ্বের অন্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। অনেকে মনে করেন, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্রে ঘেরা ভারতবর্ষ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভাববিনিময়ের উপযুক্ত সুযোগ পায়নি। ফলে ভারতীয় সভ্যতা অনেকখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও মৌলিক। কিন্তু এই মতবাদ সকল ঐতিহাসিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। তাঁরা বলেন, হিমালয় কোন দিনই সম্পূর্ণ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ছিল না। উত্তর-পশ্চিমের খাইবার, বোলান, গোমল, কারাকোরম প্রভৃতি বিভিন্ন গিরিপথ দিয়ে যুগ যুগ ধরে ব্যবসায়ী,

প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতা ও ভারতীয় সভ্যতার মৌলিকত্ব

ভাগ্যান্বেষী ও রাজ্যলোভীরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে। ঐ একই পথ ধরে ভারতীয় পণ্যসামগ্রী ও সংস্কৃতি বাইরের জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। গিরিপথগুলিই ভারতবর্ষে বৈদেশিক আক্রমণ ও বৈদেশিক কর্তৃত্ব স্থাপনে সহায়তা করেছে। গ্রীক, শক, হুণ, পাঠান ও মোগলরা গিরিপথগুলি অতিক্রম করেই ভারতে এসেছিল। বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রীকরাজ্য, শকরাজ্য, কুষাণ সাম্রাজ্য, মুঘল-সাম্রাজ্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মূলে গিরিপথগুলির বিশেষ ভূমিকা ছিল। সুতরাং ভারতবর্ষের, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে গিরিপথগুলির বিশেষ প্রভাব ছিল। ভারতবর্ষের জাতি-বৈচিত্র্য এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বিত রূপের জন্যও গিরিপথগুলির প্রভাব স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে গিরিপথের প্রভাব

ভারতের জনজীবন ও অর্থনীতি চিরকালই প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে মৌসুমী বায়ু ও বৃষ্টিপাত এই দেশের কৃষিকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে প্রকৃতির লীলার গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। প্রসন্না প্রকৃতিদেবী যেমন ঢেলে দেন প্রাচুর্য তেমনি তাঁর রুদ্রাণীরূপ সৃষ্টি করে বন্যা, অনাবৃষ্টি ও মহামারী। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতা প্রাচীন যুগের মানুষের ছিল না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ ছিল নিষ্ফল। ফলে প্রাচীন ভারতের মানুষ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যকে সমান ভাবে মেনে নিত। অনেকে মনে করেন, এই কারণে ভারতীয়দের মধ্যে নির্লিপ্ততা ও অদৃষ্টবাদের জন্ম হয়। আংশিক সত্য হলেও এই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ মানা যায় না।

ভারতীয় মন ও দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর প্রকৃতির প্রভাব

বিপরীতমুখী মনোভাবের জন্ম

'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' দেশ ভারতবর্ষ। এ দেশের উর্বর মাটিতে নানা রকমের শস্য ও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ভারতে তেল, কয়লা, লোহা, অভ্র, সোনা প্রভৃতি খনিজ সম্পদ রয়েছে। জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভারতীয় বণিকরা ভোগ করে এসেছে। অন্য দিকে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য বিদেশী শত্রুর লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বারবার। এর ফলে ভারতের বুকে একাধিকবার বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের সুফল ও কুফল

অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও দীর্ঘ অবসর ভারতীয়দের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পচর্চা ও ধর্মসাধনার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। ভারতীয় জনগণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে হিমালয়, বিন্ধ্য প্রমুখ পর্বতশ্রেণী, গভীর অরণ্যরাজি, গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, কৃষ্ণা, গোদাবরী ইত্যাদি নদনদী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে।

জ্ঞানচর্চা ও ধর্ম-সাধনার সুবিধা

আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে যোগাযোগ ও যাতায়াত খুব সহজসাধ্য ছিল না। ফলে উত্তরের আর্যসভ্যতা ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সভ্যতা এক বৃহত্তর ভারত সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও নিজের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য রক্ষা করে প্রবাহিত হয়েছিল। নদনদী, পর্বত, মরুভূমি ও দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথ ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মিলনের পথে অন্তরায় হয়েছে। ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ভারতবর্ষে একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ খুব সহজ ছিল না।

রাজনৈতিক ঐক্যের পথে প্রাকৃতিক বাধা

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের প্রভাব ভারতীয়দের চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গী ও বৃত্তিগত পার্থক্যেও লক্ষ্য করা যায়। পর্বত, অরণ্য বা মরু অঞ্চলের মানুষ কঠোর-পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু ও নির্ভীক। সমতল অঞ্চলের লোক কৃষি ও শিল্পনির্ভর। তাদের জীবন সাধারণভাবে কিছুটা সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। অন্যদিকে প্রয়োজনের তাগিদে সীমান্ত অঞ্চলের মানুষ রণকুশল ও দৃঢ়চেতা। উপকূল অঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রধান বৃত্তি ব্যবসা-বাণিজ্য ও মৎস্যশিকার। এইভাবে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ভারতীয় জীবনযাত্রায় বিভিন্নতা ও বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে।

ভারতীয় জীবন-যাত্রায় প্রকৃতির প্রভাব

ভারতবর্ষের মানুষ ও জাতিবৈচিত্র্য

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ্ (Vincent Smith) ভারতবর্ষকে **'নৃতাত্ত্বিক যাদুশালা'** বলে বর্ণনা করেছেন। ইতিহাসের সূচনাকাল থেকে সুরু করে কালস্রোতে ভারতবর্ষের বুকে কত যে বিভিন্ন জাতির আগমন, মিলন ও সমন্বয় ঘটেছে তা ভাবলে বিস্ময় লাগে। বিশ্বের মানুষের মিলনভূমি ভারতকে রবীন্দ্রনাথ 'পুণ্যতীর্থ' এবং 'মহামানবের সাগরতীর' বলে বন্দনা করেছেন। প্রাচীন

ভারতবর্ষ বহু জাতির মিলনভূমি

ভারতের দুই প্রধান জাতি ছিল আর্য ও দ্রাবিড়। এই দুই জাতির মধ্যে প্রথম উন্নতিলাভ করেছিল দ্রাবিড়রা। দ্রাবিড় সভ্যতার পর উন্নত হয় আর্য সভ্যতা। এরপর সুরু হয় বিভিন্ন বিদেশী জাতির আগমন। ভারতের সীমান্ত দিয়ে পর পর আসতে থাকে পারসীক, গ্রীক, শক, পল্লব, কুষাণ, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি জাতি। ক্রমে ক্রমে এই সব জাতি ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে এই দেশের জনসমুদ্রে মিশে যায়। মধ্যযুগেও বৈদেশিক আগমনের স্রোত বন্ধ হয়ে যায়নি। ইসলাম-ধর্মাবলম্বী যে সব জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে বসবাস বা রাজ্যস্থাপন করে ছিল তাদের মধ্যে ছিল তুর্কী, আফগান, মোঙ্গল এবং আবিসিনীয়রা। আরও পরে সামুদ্রিক বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে জলপথে ভারতবর্ষে এসে বসবাস করতে সুরু করে পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরাজ ও ফরাসী প্রমুখ বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলে ভারত-জনমণ্ডলী সমৃদ্ধ হয়েছে।

দেহের গঠন ও ভাষার ভিত্তিতে সাধারণতঃ ভারতের জনসাধারণকে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ

ভারতের প্রধান জাতিবিভাগ

নর্ডিক বা আর্যজাতি ঃ এই জাতি ছিল সুদর্শন, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায়। প্রধানতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের বসবাস।

দ্রাবিড় জাতি ঃ দ্রাবিড় জাতির বাসভূমি ছিল দাক্ষিণাত্য। দেহের গড়ন, সামাজিক প্রথা, ভাষা ও সংস্কৃতি সকল দিক থেকেই দ্রাবিড়রা আর্যদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল।

নেগ্রিটো জাতি ঃ আফ্রিকার নিগ্রো জাতি থেকে উদ্ভূত নেগ্রিটো জাতিভুক্ত মানুষ কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায় ও খর্বনাসা। এই জাতির মানুষ এখন খুব বিরল। আন্দামান-নিকোবর, আসাম ও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে নেগ্রিটো জাতির মানুষের বসবাস আছে।

মোঙ্গলীয় জাতি ঃ এই জাতিভুক্ত মানুষের গায়ের রং হলদে, মুখ এবং নাক চ্যাপ্টা। গোঁফদাড়ি প্রায় নেই। এরা অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি হিমালয়ের পার্বত্যাঞ্চলে এবং ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় এই জাতির মানুষ বাস করে।

এই চারটি প্রধান জাতিগত ভাগ ছাড়া আরও কয়েকটি ভাগের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল,

দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট ও তামিল এবং মহারাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চলের মানুষকে **ব্র্যাকিসিফেলাস** জাতি বলে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় সিন্ধু, পাঞ্জাব, রাজপুতানার কিছু অধিবাসীদের **ভূমধ্যসাগরীয়** জাতি বলা হয়। আবার ভারতবর্ষ, সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি অনুন্নত জাতির সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সাদৃশ্য থাকায় এই জাতির মানুষকে **প্রোটো অষ্ট্রোলয়ড** জাতি বলা হয়। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন ভারতীয়েরই নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ মনে করে গর্ববোধ করার কোন যুক্তিসম্মত কারণ নেই। বিভিন্ন জাতির মেলামেশা ও সামাজিক যোগসূত্রের ফলে একের সঙ্গে অপরের রক্ত মিশে গেছে। ভারতের প্রতিটি মানুষ এক বিরাট মানবগোষ্ঠীর অংশ মাত্র। এই তার প্রকৃত ও সঠিক পরিচয়।

কোন ভারতীয়েরই জাতিগর্ব করার কারণ নেই

বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতের মূলগত ঐক্য ঃ একই দেশের মানুষের মধ্যে এত বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের জন্য ভারতবর্ষকে পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা হয়। ভারতীয় জনসাধারণের বেশীর ভাগ হিন্দু হলেও মুসলমানদের সংখ্যা কম নয়। এমন কি বহু ইসলাম-ধর্মাবলম্বী দেশের জনসংখ্যার থেকেও ভারতীয় মুসলমানদের সংখ্যা বেশী। এছাড়া বহু বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, জরথুষ্ট্রবাদী পারসীক এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষ ভারতে বাস করে। ভারতে চৌদ্দটি প্রধান ভাষা ছাড়া আরও দু'শোর বেশী ভাষার প্রচলন আছে। **ঐতিহাসিক স্মিথ্ ভারতবর্ষের বিভিন্নতার কথা উল্লেখ করার সময় এই দেশের 'মৌলিক ঐক্য' এবং 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এই দুটি কথার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।** ভারতীয় কবি, সাহিত্যিক ও মনীষীরাও এই ঐক্যের কথা বলেছেন।

ভারতের বৈচিত্র্য

বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলন

অতি প্রাচীন যুগে পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন প্রভৃতি হিন্দু পণ্ডিত ও মনীষীরা ভারতের ভৌগোলিক ঐক্যের কথা লিখেছেন। চিরকালই আমাদের মাতৃভূমি 'ভারতবর্ষ' নামে সারা বিশ্বে পরিচিত। অনেক বাধা ও অসুবিধা সত্ত্বেও দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে বহু ভারতীয় নানান কারণে যাতায়াত করেছে। আধুনিক যুগে এই ভৌগোলিক ঐক্যের রূপ আরও সুস্পষ্ট হয়েছে।

ভৌগোলিক ঐক্যবোধ

সাধারণভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজনৈতিক অনৈক্য দেখা দিলেও রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ সুপ্রাচীন। বেদ, পুরাণ ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 'চক্রবর্তী রাজা', 'একরাট্', 'সম্রাট', 'রাজাধিরাজ' প্রভৃতি রাজপদের এবং 'রাজসূয়' 'অশ্বমেধ' ও 'বাজপেয়' যজ্ঞের উল্লেখ থেকেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে এক সার্বভৌম রাষ্ট্রের চিন্তা কতখানি প্রবল ছিল।

রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ

দেবভূমি ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে রয়েছে এক সুগভীর ধর্মীয় ঐক্য। ভারতের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ছোট-বড় খ্যাত-অখ্যাত তীর্থস্থান। তীর্থযাত্রা ও তীর্থবাসকালে হাজার হাজার পুণ্যার্থী অখণ্ড ভারতের বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করেন। দেবাত্মা হিমালয় ও পুণ্যসলিলা গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী নদী হিন্দু-ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বৈদিক সাহিত্য, গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতের মত কাব্যগ্রন্থ ও মহাকাব্য ভারতের জাতীয় ঐক্যবোধকে সুদৃঢ় করেছে। প্রাচীন ভারতীয় দেবভাষা সংস্কৃত থেকে বহু আধুনিক ভারতীয় ভাষার জন্ম হয়েছে।

ধর্মীয় ঐক্য

হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পৃথক ও স্বতন্ত্র হলেও দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। উভয়ে উভয়ের আচার-ব্যবহার, খাদ্য, বেশভূষা, ভাষা, এমন কি ধর্মকে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে। বৃটিশ আমলে একই বিদেশী শাসকের অধীনে সুখদুঃখের সমভাগী হওয়ার ফলেও এই দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। সমন্বয়-বিশ্বাসী ভারতবর্ষ বহু জাতি, বহু মতবাদ, বহু বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, ধর্ম ও আদর্শকে গ্রহণ করেছে ও মেনে নিয়েছে। কিন্তু নিজের মৌলিক সত্তাকে বিসর্জন দেয়নি। গ্রহণযোগ্য যা কিছু সব গ্রহণ করে ভারতবর্ষ মহামানবের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সমন্বয়

বৃটিশ শাসনের কল্যাণেই ভারতে এসেছে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ঐক্য—এটি আংশিক সত্য মাত্র। কিন্তু বিদেশী শাসনের শিকলমুক্ত হবার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যে ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক রাষ্ট্রচেতনা ও স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ হয়েছিল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদান

ইতিহাস ঐতিহাসিকের কল্পনাপ্রসূত কাহিনী নয়। বিভিন্ন প্রকারের প্রামাণ্য উপকরণ বা উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনা করেন। যে সব মৌলিক তথ্যের সাহায্যে ইতিহাস রচিত হয় সেই-গুলিকে ইতিহাসের উপাদান বলে।

ভূমিকা : ইতিহাসের উপাদান কি?

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সাধারণতঃ তিনটি যুগে ভাগ করা হয়—প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। প্রতিটি যুগের আছে নিজস্ব রূপ ও বৈশিষ্ট্য। কালক্রমে মানুষ ও তার পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের উপাদানেরও প্রকারভেদ ঘটেছে।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান ঃ কোন কোন পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ ইতিহাস-সচেতন ছিল না। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস লিখে গেছেন হেরোদোতাস ও থুকিদিদিস্। পলিবিয়াস ও লিভির মত ঐতিহাসিক রচনা করেছিলেন প্রাচীন রোমের ইতিহাস। কিন্তু আমাদের দেশে ঐ রকম কোন ঐতিহাসিক বা ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার বহু মূল্যবান উপাদান নষ্ট হয়ে গেছে মানুষের অযত্ন, অবহেলা, প্রাকৃতিক ক্ষয়ক্ষতি, যুদ্ধের ধ্বংসলীলা ইত্যাদি নানান কারণে। যে সব উপাদান তা সত্ত্বেও রক্ষা পেয়েছে তা বিক্ষিপ্ত ও এখনও কিছুটা অবহেলিত।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার অসুবিধা

বৈদিক সাহিত্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে। বৈদিক সাহিত্য পাঠ করলে আর্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানা যায়। পরবর্তী যুগের মানুষ ও তাদের জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায় অন্যান্য সাহিত্যে। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ পড়লে সমসাময়িক জীবন ও রাজনীতি সম্পর্কে অনেকটা ধারণা করা যায়।

সাহিত্য

প্রাচীন ভারত

১ হরপ্পা
২ মহেঞ্জোদড়ো
৩ বৈশালী
৪ কপিলাবস্তু
৫ বুদ্ধগয়া
৬ বারাণসী
৭ কুশীনগর
৮ পুরুষপুর (পেশোয়ার)
৯ পাটলিপুত্র (পাটনা)
১০ কান্যকুব্জ
১১ নালন্দা
১২ বিক্রমশীলা
১৩ উদ্দন্তপুরী (বিহার)
১৪ সোমপুরী (উত্তরবঙ্গ)
১৫ মথুরা
১৬ তাম্রলিপ্ত
১৭ কাঞ্চী
১৮ মহাবলীপুরম
১৯ অজন্তা
২০ ইলোরা (আওরঙ্গাবাদ)
২১ তাঞ্জোর
২২ খাজুরাহো
২৩ কোনারক
২৪ গৌড়
২৫ উজ্জয়িনী
২৬ সোমনাথ
২৭ প্রয়াগ
২৮ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (গৌহাটি)

ঐতিহাসিক স্থান-নির্দেশক মানচিত্র

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণী', বিহ্লণের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত', বাক্‌পতির 'গৌড়বাহ' ইত্যাদি অসংখ্য গ্রন্থে প্রাচীন যুগের ইতিহাস সম্পর্কে বহু তথ্য রয়েছে।

শিলালিপি ও তাম্রলিপি

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস রচনার আর এক প্রধান উপাদান হল শিলালিপি। বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন রাজ্যের রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ও অর্থনীতি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় শিলালিপিতে। সম্রাট অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে ইংরাজ পণ্ডিত ও রাজকর্মচারী জেমস্ প্রিন্সেপ্ মৌর্য যুগ সম্বন্ধে জ্ঞানভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালের রাজা ও রাজ-বংশসমূহের শিলালিপিও বিশেষ মূল্যবান। তাম্র-শাসন ও তাম্রলিপিও নির্ভরযোগ্য উপাদান। বেশীর ভাগ তাম্রলিপি ছিল দানের দলিলের মত। রাজার নাম, রাজ-বংশের পরিচয়, রাজত্ব-কাল ও অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ থাকায় এই সব তাম্রফলকের ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। ভারতের বাইরেও কোন কোন দেশে কিছু শিলালিপি পাওয়া গেছে যাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তথ্য আছে।
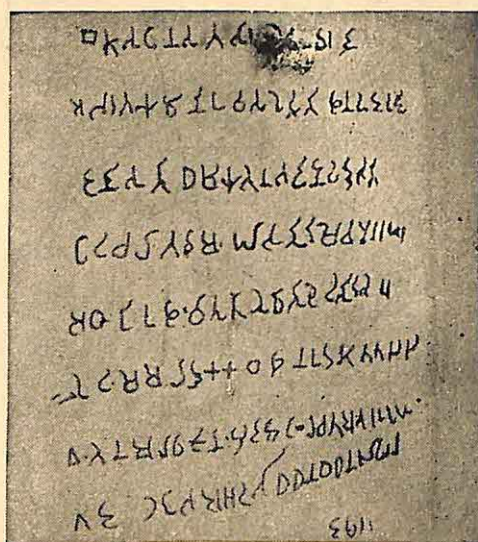
অশোকের শিলালিপি

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

মাটির নীচে ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে প্রাচীন ইতিহাসের বহু উপাদান পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায়। এ ছাড়া নালন্দা, রাজগৃহ, সারনাথ, সাঁচী, মহাবলীপুরম, খাজুরাহো, কোনারক, বর্তমান বাংলাদেশের পাহাড়পুর প্রভৃতি বহু জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

হয়েছে। এই সব আবিষ্কার প্রাচীন যুগের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ করে দেয়।

প্রাচীন ইতিহাসের এক প্রয়োজনীয় উপাদান হল মুদ্রা ও সীলমোহর। রাজ্যের শাসক ও তার শাসনকাল সংক্রান্ত তথ্য ছাড়া দেশের আর্থিক অবস্থা ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধেও ধারণা পাওয়া যায় মুদ্রা থেকে। গুপ্ত রাজবংশের দুই শ্রেষ্ঠ সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে তাঁদের মুদ্রা থেকে। ভারতের গ্রীক, পহ্লব, কুষাণ ও শক রাজাদের সম্পর্কে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তা বিশেষভাবে সে যুগের আবিষ্কৃত মুদ্রার ওপর নির্ভরশীল।

মুদ্রা

গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময় থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত কত বিদেশী যে ভারত সম্বন্ধে লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতাস এ দেশে না এলেও তাঁর লেখা ইতিহাসে ভারতের প্রসঙ্গ আছে। অন্যান্য বিদেশীদের মধ্যে মেগাস্থিনিস, টলেমি, প্লিনি, জ্যাস্টিন, কার্টিয়াস ও আরো অনেকের ভারত-সম্পর্কীয় রচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী' নামে একটি গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ ও ইৎ সিং-এর বিবরণীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্-বিদুরী, সুলেমান, আল-মাসুদী প্রভৃতি আরব বণিক ও পর্যটকদের লেখা থেকে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর ভারত সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু মুসলমান লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিচিত হলেন পণ্ডিত আল-বেরুনী। তিনি দশম শতকে এদেশে এসে 'কিতাব-উল-হিন্দ্' নামে যে বইটি লিখেছিলেন তাতে সমসাময়িক যুগ সম্বন্ধে বহু তথ্য আছে।

বৈদেশিক বিবরণ

মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান ঃ হিন্দুদের থেকে মুসলমানরা বেশী ইতিহাস-চেতনার প্রমাণ রেখে গেছেন। মধ্যযুগে ফার্সী ভাষায় প্রচুর ইতিবৃত্ত লেখা হয়েছিল। কাজী মিনহাজউদ্দীন তাঁর 'তবকৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে দাস রাজবংশের ইতিহাস লিখেছেন। জিয়াউদ্দীন বরনী মহম্মদ তুঘলক ও ফিরোজ শাহের রাজত্ব সম্বন্ধে লিখেছেন তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী' গ্রন্থে। তুঘলক আমল সম্বন্ধে জানবার আর একটি উৎস হল ইবন বতুতার 'সফরনামা'।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস

মুঘল যুগ সম্বন্ধে সমসাময়িক ঐতিহাসিক রচনা, বিবরণ, স্মৃতিকথা ইত্যাদি প্রচুর রয়েছে। প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরের স্মৃতিকথা, গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন-নামা', আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবরনামা', জাহাঙ্গীরের আত্মকথা ইত্যাদি গ্রন্থের বিশেষ মূল্য আছে। বদায়ুনী, ফিরিস্তা, কাফি খাঁ প্রমুখ ইতিহাস-লেখকদের গ্রন্থগুলিতে মূল্যবান উপাদান রয়েছে।

মুঘল আমলের স্মৃতিকথা ও অন্যান্য রচনা

রাজস্থানী, মারাঠী ও গুরুমুখী ভাষায় লেখা গ্রন্থ থেকেও মধ্যযুগের ইতিহাসের তথ্য পাওয়া যায়। এই ধরনের রচনাগুলির মধ্যে শিবাজীর সময়ে লেখা 'সভাসদ বখর' নামে একটি মারাঠী গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। রাজপুতদের সম্বন্ধে টডের বিখ্যাত বই Annals and Antiquities of Rajasthan রাজপুত চারণ-গাথা ও কাব্যের ভিত্তিতে লেখা হয়েছিল।

ভারতীয় ভাষায় লেখা গ্রন্থ

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যদেশের বহু পর্যটক, বণিক ও ধর্মযাজক এসেছিলেন। তাঁদের লেখা বিবরণগুলি সে যুগের ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। যাঁরা বিবরণ ও ইতিবৃত্ত লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন রলফ্ ফিচ্, টেরী, স্যার টমাস রো, টেভার্নিয়ে, বার্ণিয়ে, মানুচি, কারেরি, নিকোলা কণ্টি ইত্যাদি।

বৈদেশিক বিবরণ

সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও বৈদেশিক বিবরণ মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রধান উপাদান হলেও অন্যান্য উপাদানও আছে। যেমন ঔরংজীব ও তাঁর বংশধরদের রাজত্বকালের অনেক সংবাদ-লিপি (আকবরাত্) পাওয়া গেছে। এছাড়া প্রাচীন ইতিহাসের মত মধ্যযুগের ইতিহাস লেখার জন্য শিলালিপি, মুদ্রা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, চিত্রকলা, স্মৃতিস্তম্ভ ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের প্রয়োজন কিছু কম নয়।

অন্যান্য উপাদান

আধুনিক যুগের ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান ঃ আধুনিক যুগের ইতিহাসের প্রধান উপাদান সরকারী দলিল ও নথিপত্র। নতুন দিল্লীর জাতীয় মহাফেজখানা ও পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের মহাফেজখানায় এই ধরনের প্রচুর উপাদান সংরক্ষিত আছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্র ছাড়া পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকদের কুঠি-সংক্রান্ত দলিল, চিঠিপত্র, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদিও মহাফেজখানায়

সরকারী দলিল ও নথিপত্র
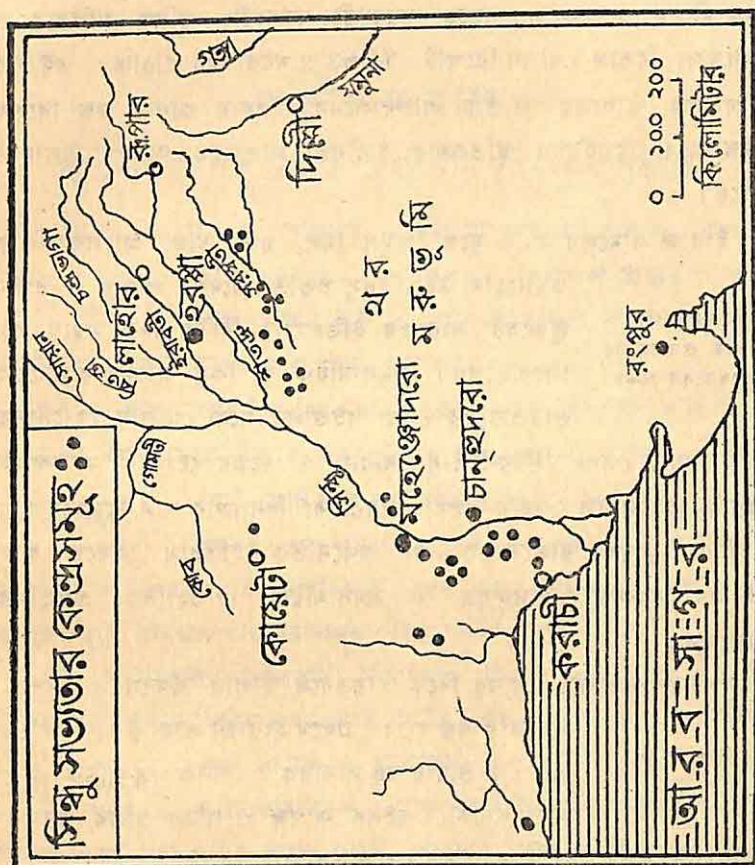
সুরক্ষিত আছে। বৃটিশ যুগের মূল্যবান অনেক উপাদান লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া অফিস' লাইব্রেরী, 'বৃটিশ মিউজিয়াম' ও অন্যান্য স্থানেও রয়েছে। ইংরাজ শাসক, রাজপুরুষ প্রভৃতির ব্যক্তিগত কাগজপত্রও (Private papers) আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার কাজে লাগে। বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা ও বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হত। সদস্যদের অবগতির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পার্লামেণ্টে পেশ করা হত। সুতরাং বৃটিশ পার্লামেণ্টের কাগজপত্রেও (Parliamentary papers) অনেক মূল্যবান তথ্য আছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বিভিন্ন অঞ্চলের পরিস্থিতি ও স্বাধীনতা-

ব্যক্তিগত কাগজপত্র

বৃটিশ পার্লামেণ্টের কাগজপত্র

সংগ্রামীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সরকারী কর্মচারী, পুলিশ অফিসার ও গোয়েন্দা বিভাগ গোপন রিপোর্ট, চিঠিপত্র ও খবরাখবর পাঠাত। এই সব কাগজপত্র ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস রচনার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। বিপ্লবীদের স্মৃতিকথায় স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক উপাদান আছে।

প্রথম যুগের ইংরাজ ও ভারতীয় লেখকদের রচনা

ইংরাজ আমলের প্রথম যুগে জেম্‌স্ মিল, গ্রাণ্ট ডাফ, আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, উইলকিনস্ প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিত ও রাজ-পুরুষেরা ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বই লিখেছিলেন। সমসাময়িক বা কিছু আগেকার সময়ের ভারতীয়দের লেখা বইগুলির মধ্যে গোলাম হোসেনের ফার্সী ভাষায় লেখা 'সিউর-উল-মুতাখরিন্' ও ডুপ্লের দোভাষী আনন্দরঙ্গ পিল্লাই-এর তামিল ভাষায় লেখা ডায়েরী বা দিনপঞ্জীর নাম উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখতে হলে এই সব সরকারী কাগজপত্র ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলির প্রয়োজন।

সংবাদপত্র-পত্রিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতবর্ষে ছাপার অক্ষরে সংবাদপত্র-পত্রিকার জন্ম হয়। প্রথমে ইংরাজী ভাষা ও পরে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বহু সাময়িক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকা বার হতে থাকে। এইসব কাগজ ও পত্রিকাগুলির পুরানো সংখ্যাগুলিতে বহু খবরাখবর ও মতামত পাওয়া যায়।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিখতে হলে একটু অন্য ধরনের উপাদানের প্রয়োজন আছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আত্ম-জীবনী, রচনাবলী, সে যুগের সাহিত্য, বিভিন্ন জনকল্যাণ-মূলক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর বিবরণী ও সংবাদপত্র-পত্রিকায় সেকালের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মচিন্তা ও জীবনযাত্রার পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

যে কোন যুগের মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস লেখার পূর্বে সব রকমের উপাদান সংগ্রহ করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক ভারত ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা

পণ্ডিতেরা ভারত তথা পৃথিবীর আদিম মানুষের ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেনঃ **পুরাতন-প্রস্তর যুগ, নব্য-প্রস্তর যুগ** ও তারপর **ধাতুর যুগ**। এই এক একটি যুগ বলতে কয়েক হাজার বছর বোঝায়।

ভারতের আদিম মানুষের ইতিহাস

পুরাতন-প্রস্তর যুগের (Palaeolithic Age) মানুষ খাদ্য সংগ্রহ ও হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে বাঁচার জন্য ভোঁতা পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তারা ঘুরে বেড়াত। চাষবাস করতে ও আগুন জ্বালাতে জানত না। গাছের ও জীবজন্তুর ছাল পরত। ধাতুর ব্যবহার তাদের জানা ছিল না। এই যুগের মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্রশস্ত্র কিছু পাওয়া গেছে।

পুরাতন-প্রস্তর যুগ

এরপর সুরু হয় নব্য-প্রস্তর যুগ (Neolithic Age)। এ যুগের মানুষও পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্রের ওপর নির্ভর করত। তবে তারা পাথরকে মসৃণ করতে ও প্রয়োজনমত আকার দিতে জানত। তারা কৃষি-কাজ ও আগুনের ব্যবহার শিখেছিল। মাটির জিনিস তৈরী করত, গরু-ছাগল প্রভৃতি জীবজন্তু পালন করত। এই যুগের মানুষ গুহায় বাস করত, কাপড় বুনত ও মৃতদেহ কবর দিত। অনেকে মনে করেন যে ভারতের পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চলের আদিবাসীরা নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষেরই বংশধর।

নব্য-প্রস্তর যুগ

কালক্রমে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল। প্রথমে সোনার অলঙ্কার এবং পরে তামার ও লোহার অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্রের ব্যবহার সুরু হয়। পাথর থেকে ধাতুর ব্যবহার ঠিক কোন্ সময়ে আরম্ভ হয়েছিল তা বলা সম্ভব নয়। তবে পণ্ডিতদের মতে উত্তর ভারতে প্রথমে পাথর থেকে তামা ও তারপর লোহার ব্যবহার সুরু হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে পাথরের পরই লোহার যুগ এসেছিল। ভারতে ব্রোঞ্জের বহুল প্রচলন কখনও হয়নি। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোন সময়কেই ব্রোঞ্জের যুগ বলা হয় না।

ধাতুর যুগ

সিন্ধু সভ্যতাঃ ধাতুর প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শেষ ও ঐতিহাসিক যুগের সূচনা। তাম্রযুগের সভ্যতা কতখানি উন্নত হয়েছিল তার অপূর্ব ও বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হল সিন্ধু সভ্যতা। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে পাঞ্জাবে সিন্ধু নদের শাখা রাভি (ইরাবতী) নদীর ধারে হরপ্পা এবং সিন্ধু প্রদেশে সিন্ধু নদের ধারে মহেঞ্জোদড়ো নামে তুটি জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে এক প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এই জায়গা তুটি বর্তমানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। সিন্ধু নদের উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল বলে এর নামকরণ হয় সিন্ধু সভ্যতা। এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম সাহানী, স্যার জন মার্শ্যাল ও স্যার মার্টিমার হুইলারের।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার

সিন্ধু উপত্যকায় মাটি খুঁড়ে যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তার স্তরবিভাগের সাহায্যে এই সভ্যতার প্রাচীনত্ব স্থির করার চেষ্টা হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা করে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে প্রথম গড়ে উঠেছিল। কিছুকাল আগে পর্যন্ত মনে করা হত যে আর্য সভ্যতা হল ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা। কিন্তু মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কার প্রমাণ করল যে সিন্ধু সভ্যতা আরও পুরনো।

সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীনত্ব

সিন্ধু সভ্যতা মূলতঃ ছিল নাগরিক সভ্যতা। শহরের ইটের তৈরী ছোট বাড়ীগুলির বাইরের সৌন্দর্য না থাকলেও ভেতরে থাকার ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল। সংলগ্ন স্নানাগার, কূপ, জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল আধুনিক ধরনের। বাড়ীর স্নানাগার ছাড়া সর্বসাধারণের ব্যবহার-উপযোগী স্নানাগারও ছিল। মহেঞ্জোদড়োয় একটি খুব বড় স্নানাগার পাওয়া গেছে। হরপ্পায় শস্য মজুত রাখার একটি বড় গোলা ছিল। শহরের প্রশস্ত রাজপথগুলি ছিল সোজা ও
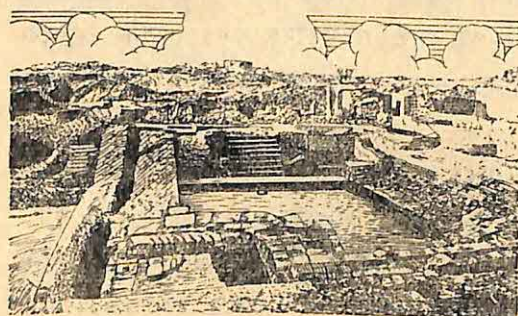
মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগার

বাঁধানো। বাসগৃহ ছাড়া যে বড় বড় বাড়ীগুলি দেখা যায় সেগুলি পৌরসভাগৃহ বলে অনুমান করা হয়। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা এই দুই শহরের একদিকে ছিল ধনীর প্রাসাদ আর অন্য দিকে নিম্নবিত্তের গৃহ। শহরের বাড়ীগুলির এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল যে বড় রাস্তার দিকে কোন দরজা বা জানলা ছিল না। বাড়ীর পাশের গলির দিকের দরজা দিয়ে যাতায়াত হত। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা সিন্ধু সভ্যতার নাগরিক জীবনের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির ইঙ্গিত করে।

নাগরিক জীবন

সিন্ধু সভ্যতার লোকদের খাদ্য ছিল খেজুর, দুধ, মটর, যব, গম, তরমুজ, ইত্যাদি। মাছ, মাংস, ডিমও তাঁরা খেতেন। হাতী, গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, কুকুর ও উট ছিল গৃহপালিত জীবজন্তু। সাধারণতঃ যাতায়াত ছিল গরুর গাড়ী করে। এই যুগের মানুষ তুলো ও পশমের জামা-কাপড় পরত। সাজপোশাক ছিল জমকালো। মেয়েরা ও ছেলেরা উভয়েই অলঙ্কার পরত।

খাদ্যদ্রব্য, বেশভূষা

কৃষিকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও হাতের কাজ ছিল তাঁদের প্রধান বৃত্তি। মধ্য এশিয়া ও তিব্বতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল বলে মনে করা হয়। ধাতু ও মৃৎশিল্পে তাঁরা দক্ষ ছিলেন। তুলোর চাষ হত খুব বেশী। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় কাঠের ও মাটির তৈরী অনেক ছোট ছোট মূর্তি ও জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। তাঁরা পালিশ করা পোড়ামাটির ওপর গৃহপালিত জীবজন্তু, মানুষের মূর্তি, ফুললতা ও পাখির সুন্দর রঙিন ছবি আঁকতে পারতেন। তামা, সীসা ও ব্রোঞ্জের তৈরী কুঠার, বর্শা, ছোরা, ক্ষুর, বড়শী ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। কিন্তু এই যুগের লোহার কোন জিনিস পাওয়া যায়নি।
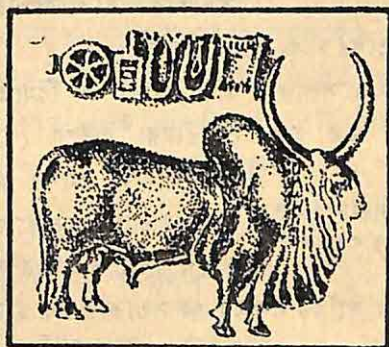
মহেঞ্জোদড়োর সীলমোহর

জীবিকা

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োয় বহু সীলমোহর পাওয়া গেছে। এইগুলিতে জীবজন্তুর মূর্তি ও একরকম লেখা পাওয়া গেছে। এই লেখার পাঠোদ্ধার

করা এখনও সম্ভব হয়নি। মনে হয় এই সীলমোহরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগত। প্রতিটি ব্যবসায়ী ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সীলমোহর ছিল। হয়তো মাদুলি করেও পরত।

সীলমোহর

সিন্ধু সভ্যতার লোকেদের ধর্ম কি ছিল তা সঠিক বলা সম্ভব নয়। কোনও উপাসনাগৃহ বা মন্দির পাওয়া যায়নি। যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে কয়েকটি হল দেবী ও পুরুষ মূর্তি। এর থেকে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে জগন্মাতা দুর্গা ও জগৎপতি শিব-পশুপতির পূজার প্রচলন ছিল। শিবলিঙ্গ পূজারও রীতি ছিল। পাথর, গাছপালা ও জীবজন্তুর পূজাও হত।

ধর্ম

সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে মিশর ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিম এশিয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের যে যোগাযোগ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দুই অঞ্চলের দুই প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক কি ছিল এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।

অন্য প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক

সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা কারা এ বিষয়েও ঐতিহাসিকেরা একমত নন। একটি মত হল, সুমেরীয়রা বাইরে থেকে এসে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো গড়েছিলেন। অপর একটি বিশ্বাস হল, দ্রাবিড় জাতি সিন্ধু সভ্যতা গড়েছিলেন। কিন্তু কোন একটি জাতির মানুষ সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্টি করেছিলেন বলে মনে হয় না। বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে এই সভ্যতার জন্ম হয়েছিল এই মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা সম্বন্ধে মতানৈক্য

সিন্ধু সভ্যতা কি করে ধ্বংস হয়েছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। একটি অনুমান হল যে সিন্ধু নদের আকস্মিক প্রবল প্লাবন বা অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। আর একটি অনুমান হল যে কোন দুর্ধর্ষ ও নৃশংস বিদেশী আক্রমণের ফলে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো ধ্বংস হয়েছিল। এই আক্রমণকারীদের রাজ্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে ছিল না। সম্পূর্ণ বিনষ্ট করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কোন অভিমত পোষণ করা যায় না।

ধ্বংসের কারণ

দ্রাবিড় সভ্যতা ঃ দ্রাবিড়রা ভারতবর্ষের আর এক প্রাচীন সভ্যতার

উত্তরাধিকারী। মাতৃপ্রধান দ্রাবিড় সমাজের নিয়মকানুন ও রীতি ছিল আর্যদের থেকে স্বতন্ত্র। জাতি-ভেদ প্রথা ছিল না। দ্রাবিড় সভ্যতা ছিল খুবই উন্নত। তাঁরা ধাতুর ব্যবহার জানতেন। বৃহৎ ও সুন্দর প্রাসাদ, গৃহ ও দুর্গ তাঁরা নির্মাণ করেছিলেন। দ্রাবিড় ভূমি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। নদী ও সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য হত ও বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। কৃষি ও সেচ-ব্যবস্থা ভালো ছিল। তাঁরা দেবী অম্বিকা ও দানবের পূজা করতেন। নরবলির প্রচলন ছিল। দ্রাবিড়দের তৈরী সুন্দর সুন্দর মাটির পাত্র তাঁদের শিল্পরুচির প্রমাণ। প্রাচীন তামিল সাহিত্য দ্রাবিড় সভ্যতার ইতিহাসের মুখ্য উপাদান। কালক্রমে দ্রাবিড়রা আর্যদের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁদের ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু বিজয়ী আর্যরা পরাজিত দ্রাবিড়দের 'কুৎসিত ও কদাচারী' বলে বর্ণনা করলেও তাঁদের প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেননি। দ্রাবিড়দের উপাস্য কিছু কিছু দানব আর্য দেবতায় রূপান্তরিত হয়। দ্রাবিড় গ্রাম্যজীবনই বৈদিক ধর্মের ভক্তিভাব ও তত্ত্বের উৎস বলে অনেকে মনে করেন। পরবর্তী কালের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থাও দ্রাবিড়দের কাছে ঋণী। সংস্কৃত ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও অন্যান্য উপাদানের অভাবে দ্রাবিড় সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে দ্রাবিড় সভ্যতার দান ও গুরুত্ব অবহেলা করা যায় না।

বৈশিষ্ট্য

গুরুত্ব

আর্যদের ভারত আগমন

আর্য কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'শ্রেষ্ঠ', সৎকুলজাত বা সুসভ্য। আর্যদের আদি বাসভূমি কোথায় তা নিয়ে মতভেদ আছে। একটি মত হ'ল, ভারতবর্ষই তাঁদের বাসভূমি। কিন্তু বেশীর ভাগ পণ্ডিতের বিশ্বাস যে আর্যরা বাইরের কোন অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। এঁদের কেউ বলেন আর্যদের আদি বাসভূমি মধ্য এশিয়া, কেউ বলেন উত্তর মেরু-প্রদেশ, কেউ বলেন রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল, আবার কারোর মতে আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও বোহেমিয়ায়। কোন মতটি যে বেশী গ্রহণযোগ্য তা বলা দুরূহ। তবে আর্য জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুল প্রচলিত মত হল যে বহুদিন আগে কোন এক

আর্যদের আদি বাসভূমি

অঞ্চলে গ্রীক, রোমান, জার্মান, ইংরাজ, ফরাসী ও রুশ জাতির পূর্বপুরুষেরা ও আর্যরা একসঙ্গে বাস করতেন। পরে একসময়ে এঁরা বিভক্ত হয়ে নানান দিকে যাত্রা করেন। এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাঁদের বংশধরদের বসতি গড়ে ওঠে। এই রকম দু'টি দল পারস্য ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কালক্রমে ভারতবর্ষে তাঁরা যে সভ্যতা সৃষ্টি করেছিলেন তা আর্য সভ্যতা বা তাঁদের শ্রেষ্ঠ ধর্মসাহিত্য বেদের নামানুসারে বৈদিক সভ্যতা নামে খ্যাতি লাভ করে।

আর্যদের উৎপত্তি

আর্যদের ভারত আগমনের সঠিক কালনির্ণয় সম্ভব হয়নি। তবে খ্রীস্টের জন্মের আনুমানিক দু'হাজার বছর আগে তাঁরা ভারতে বসতি স্থাপন করেছিলেন, এই মতের সপক্ষে যুক্তি আছে।

আর্যদের ক্রমবিস্তার

প্রথমে আর্যরা আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব অঞ্চলে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। সিন্ধু প্রভৃতি সাতটি নদীর নামানুসারে সমগ্র এলাকাটির প্রাচীন নাম ছিল 'সপ্তসিন্ধু'। ক্রমে ক্রমে আর্যরা পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকেন ও কুরুক্ষেত্র কোশল, বিদেহ, মগধ প্রভৃতি অঞ্চলে আর্যবসতি গড়ে ওঠে। আরও দীর্ঘদিন পর দাক্ষিণাত্যেও আর্য প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আর্যজাতির কোন কোন শাখা বিন্ধ্যপর্বত পার হয়ে দাক্ষিণাত্যে বসতি স্থাপন করে। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে পশ্চিম ভারতে আর্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব ভারতে আর্য অধিকার বিস্তারে অনেক দেরী হয়েছিল।

বৈদিক সাহিত্য : আর্য ও আর্য সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল বেদ বা বৈদিক সাহিত্য। আর্যদের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন ধর্মসাহিত্যের নাম **বেদ**। হিন্দুদের বিশ্বাস, বেদ স্বয়ং ঈশ্বর-নিঃসৃত বাক্য। বেদ অভ্রান্ত ও তর্ক-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। বেদ 'নিত্য' ও 'অপৌরুষেয়'। বেদ লিখিত সাহিত্য ছিল না। ঋষিরা মুখে মুখে বেদ রচনা করতেন। গুরুর কাছে শ্রবণ করে শিষ্য বেদ মুখস্থ করে নিতেন। শিষ্য আবার পরে তাঁর শিষ্যদের বেদ শোনাতেন। এইজন্য বেদের অপর নাম **'শ্রুতি'**। সকলের আশঙ্কা ছিল যে বেদ-পাঠে কোন ভুলভ্রান্তি হলে বিপদ হবে। তাই কেবলমাত্র শ্রুতিনির্ভর হলেও বৈদিক মন্ত্র বা স্তোত্রের কোন বিকৃতি ঘটেনি। পরবর্তী যুগের হিন্দুধর্ম, সমাজ, দর্শন ও সাহিত্যের মূল উৎস বেদ।

বেদ

বেদের আর এক নাম 'শ্রুতি'

বেদ চারভাগে বিভক্ত—**ঋক, সাম, যজুঃ** এবং **অথর্ব**। প্রত্যেকটি বেদের আবার দুটি ভাগ আছে—**সংহিতা** ও **ব্রাহ্মণ**। সংহিতা পদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ প্রধানতঃ গদ্যে রচিত। সংহিতায় আছে প্রার্থনা, মন্ত্র ও দেবদেবীর স্তবস্তুতি। ব্রাহ্মণে যাগ-যজ্ঞের বিধি-নিয়ম নির্দেশ করা আছে। পরবর্তী যুগে বেদের আরও দুটি ভাগের সৃষ্টি হয়—**আরণ্যক ও উপনিষদ্**। যাঁরা বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করে অরণ্যবাসী হতেন তাঁদের উপযোগী ধর্মতত্ত্ব রয়েছে আরণ্যকে। উপনিষদে দার্শনিক তত্ত্ব সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট রেখা টানা শক্ত, কেননা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপনিষদ্ আরণ্যকের অংশমাত্র। সমগ্রভাবে উপনিষদ্গুলি বেদের অন্ত বা শেষ অংশ। এই কারণে উপনিষদের আর এক নাম **বেদান্ত**।

চতুর্বেদ

সংহিতা ও ব্রাহ্মণ

আরণ্যক ও উপনিষদ্

বেদান্ত

কালক্রমে বৈদিক সাহিত্য বিশাল ও জটিল হয়ে উঠলে তার নির্ভুল সংক্ষিপ্তসার রূপে সৃষ্টি হয় **সূত্র-সাহিত্য**। সূত্র-সাহিত্যের দুটি ভাগ—**বেদাঙ্গ ও ষড়্‌দর্শন**। বেদাঙ্গের সংখ্যা ছ'টি। যথা—শিক্ষা (উচ্চারণ), ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দের উৎপত্তির ব্যাখ্যা), জ্যোতিষ ও কল্প (যাগযজ্ঞের বিধান)। ছ'টি হিন্দু দর্শন শাস্ত্র ষড়্‌দর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

সূত্র-সাহিত্য

কালক্রমে আর্যরা আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, সঙ্গীত ও শিল্পশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কারু-কর্ম, অশ্ববিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়েরও বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে বৈদিক সাহিত্য এবং ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চাকে সমৃদ্ধ করেন।

অন্যান্য বিষয়ের সাহিত্য

সমগ্র বেদ একই সময়ে রচিত হয়নি। বৈদিক সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে সৃষ্টি হয়েছিল। চতুর্বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম। খ্রীষ্টের জন্মের আনুমানিক দু'হাজার থেকে দেড় হাজার বছর আগে ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে বৈদিক সাহিত্যের অন্যান্য অংশ রচিত হয়। সবশেষে রচিত হয়েছিল অথর্ব বেদ।

বৈদিক সভ্যতা ঃ আর্য সভ্যতাকে আদি-বৈদিক ও উত্তর-বৈদিক এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, কেননা প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও বেশী দীর্ঘ সময় ধরে এই সভ্যতা বিবর্তিত হয়েছিল। ঋগ্বেদে বর্ণিত আর্য সভ্যতাকে **আদি-বৈদিক সভ্যতা** বলা হয়।

আর্যদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। পরিবারের কর্তাকে বলা হত 'গৃহপতি'। কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি নিয়ে 'গ্রাম' এবং গ্রামের সমষ্টি নিয়ে 'বিশ্' বা 'জন' গঠিত হত। গ্রামের প্রধান 'গ্রামণী', 'বিশ্' বা 'জন'-এর প্রধান 'বিশ্পতি' বা 'রাজন্' নামে পরিচিত হতেন। রাজন্ বা রাজাই ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। বৈদিক যুগে রাজতন্ত্রের প্রচলন থাকলেও অরাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী বা 'গণ' এবং তাদের নেতা 'গণপতি' বা 'জ্যেষ্ঠ'-এর কিছু কিছু উল্লেখ আছে।

রাজনৈতিক জীবন

রাজা রাজ্যের মধ্যে সর্বশক্তিমান হলেও স্বেচ্ছাচারী হতে পারতেন না। তিনি 'গ্রামণী', 'সেনানী' ও পুরোহিতের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। পুরোহিত রাজ্যের কল্যাণ কামনায় মন্ত্রণা দান ও যাগযজ্ঞ করতেন। সেনানী সৈন্যবাহিনীর প্রধান ছিলেন। এ ছাড়া **'সভা' ও 'সমিতি'** নামে জন-সাধারণের দু'টি রাজনৈতিক পরিষদ ছিল। এই দু'টি সঙ্ঘের গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। অনুমান করা হয় যে রাজ্যশাসনে রাজা পরিষদ-সদস্যদের মতা-মতের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। আর্য সভ্যতার প্রথম যুগে প্রজারাই রাজাকে নির্বাচন করতেন। পরে উত্তরাধিকার প্রথার প্রচলন হয়। এর ফলে প্রজাদের ক্ষমতা হ্রাস পেলেও রাজা প্রজাকল্যাণের আদর্শচ্যুত হতে পারতেন না। তাঁকে ধর্মগ্রন্থসমূহের নির্দেশ অনুযায়ী রাজকর্তব্য পালন করতে হত।

রাজশক্তি

সভা ও সমিতি

বৈদিক যুগের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত এবং এর ফলে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিত। এক রাজা অন্য রাজাদের পরাজিত করে 'রাজচক্রবর্তী' বলে নিজেকে ঘোষণা করতেন। 'রাজসূয়', 'অশ্বমেধ' প্রভৃতি যজ্ঞ সুসম্পন্ন করে শক্তিশালী সম্রাট তাঁর প্রাধান্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতেন।

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা

আর্যদের সামাজিক জীবনেরও মূল ভিত্তি ছিল পরিবার। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবারের প্রধান ছিলেন গৃহপতি। গৃহের মধ্যে স্ত্রীর ছিল উচ্চাসন ও মর্যাদা। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে যজ্ঞ ও পূজার্চনা করতেন। কন্যারা পিতৃগৃহে সুশিক্ষা লাভ করতেন। লোপামুদ্রা, মমতা, বিশ্ববারা, ঘোষার মত উচ্চশিক্ষিতা ও বিদুষী নারী বেদ-মন্ত্রও রচনা করেছিলেন। একবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ বিধবা-

সামাজিক জীবন

বিবাহ প্রথাও চালু ছিল। বাল্যবিবাহ হত না। পারিবারিক জীবনের মান ও নৈতিক আদর্শ ছিল সু-উচ্চ।

আর্য সমাজ-ব্যবস্থার দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল **বর্ণভেদপ্রথা ও চতুরাশ্রম**। বর্তমান হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথা বৈদিক যুগের বর্ণভেদ প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আর্য সভ্যতার প্রথম যুগে এই জাতিভেদ ছিল কিনা সন্দেহ। তখন দুই প্রধান ভাগ ছিল, বিজয়ী গৌরবর্ণ আর্য জাতি ও বিজিত কৃষ্ণবর্ণ অনার্য জাতি। ক্রমে ক্রমে আর্যদের মধ্যে চারিটি শ্রেণীর জন্ম হয়—**ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র**। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে এই শ্রেণীভেদের উল্লেখ আছে। শাস্ত্রপাঠ ও যাগ-যজ্ঞাদিতে যাঁরা দক্ষ ও নিযুক্ত থাকতেন তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। রাজ্যশাসন, রাজ্যরক্ষা ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ও নিযুক্ত ব্যক্তিরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। কৃষিকর্ম, শিল্প ও বাণিজ্য যাঁদের জীবিকা ছিল তাঁরা খ্যাত ছিলেন বৈশ্যরূপে। সমাজের সর্বনিম্নশ্রেণীর মানুষ, যাঁরা ভৃত্য বা দাসের কাজ করতেন, তাঁদের পরিচয় ছিল শূদ্র।

বর্ণভেদ প্রথা

প্রথমে বৃত্তিনির্ভর এই বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথা কঠোর ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে বা বৃত্তি পরিবর্তনে কোন বাধানিষেধ ছিল না। কিন্তু কালক্রমে বর্ণপ্রথা কঠোর ও সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে। পূর্বের উদারতা লোপ পায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

বর্ণভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মানুষের জীবন **চারিটি 'আশ্রম'** বা ভাগে বিভক্ত ছিল—**ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ** ও **সন্ন্যাস**। আশ্রম বলতে জীবনের একটি বিশেষ অবস্থা বোঝাত। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষার্থী গুরুগৃহে সংযমী ও সদাচারী হয়ে বাস করে অধ্যয়ন করত। গার্হস্থ্যাশ্রমে বিবাহ ও সংসার ধর্ম পালন করা কর্তব্য ছিল। বানপ্রস্থাশ্রমে সংসার-জীবনের শেষে প্রৌঢ় বয়সে নির্জনে ধর্মসাধনারত হওয়া আবশ্যক ছিল। সবশেষে সন্ন্যাসাশ্রমে সমস্ত সাংসারিক বন্ধনমুক্ত হয়ে পরমার্থ-চিন্তামগ্ন হওয়া ছিল একমাত্র লক্ষ্য। এই অবস্থার আর এক নাম যতি বা ভৈক্ষ্য। সকলের পক্ষে চতুরাশ্রমের আদর্শ পালন করা সহজসাধ্য না হলেও ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ পালন ছিল অপরিহার্য।

চতুরাশ্রম

আর্যদের জীবনে আহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আমোদ-প্রমোদের বাহুল্য বা আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু অলঙ্কারের ব্যবহার ছিল জনপ্রিয়। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা উত্তরীয় ও মাথায় উষ্ণীষ পরতেন। তাঁরা সুতো ও পশমের জামাকাপড় পরতেন। ঘি, দুধ, মাখন, যব ও ফলমূল ছিল প্রধান খাদ্য। উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাংসভোজন হত। সোমরস ও সুরা-পান প্রচলিত ছিল। যাগ-যজ্ঞের জন্য সোমরসের প্রয়োজন ছিল। আর্যরা নৃত্যগীত ও বাদ্যযন্ত্র পছন্দ করতেন। জীবজন্তু-শিকার, রথচালনা, পাশাখেলা ইত্যাদি ছিল তাঁদের প্রিয় আমোদ-প্রমোদ।

আহার, পোশাক ও আমোদ-প্রমোদ

আর্যরা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস করতেন। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ ও শক্তিকে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবী কল্পনা করে বন্দনা করতেন। আর্যদের উপাস্য দেব-দেবীর মধ্যে ছিলেন ধাত্রী, বিধাত্রী, বিশ্বকর্মন্, প্রজাপতি, শ্রদ্ধা, মায়া, পৃথ্বী, অদিতি, ঊষা, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, (মিত্র) ইত্যাদি। কিন্তু বহু দেব-দেবীর উপাসনা করলেও আর্যরা উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ একই পরমেশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সুতরাং বৈদিক আরাধনার অন্তর্নিহিত মূল আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল একই ঈশ্বরের পূজা বা একেশ্বরবাদ। দেবতাদের তুষ্টির জন্য আর্যরা যাগযজ্ঞ করতেন। যজ্ঞাগ্নিতে দুধ, ঘি, যব ইত্যাদি আহুতি দেওয়া হত। প্রথম দিকে যাগযজ্ঞের বিধান সহজ সরল থাকলেও পরে জটিল হয়ে পড়ে। যজ্ঞ পরিচালনার জন্য বেদবিদ্ পুরোহিতের প্রয়োজন দেখা দেয়। এইভাবে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের সূত্রপাত হয়। ক্রমশঃ আর্য পূজা উপাসনা পদ্ধতিতে অনার্য প্রভাব প্রবেশ করে। মূর্তি পূজা ও পশু বলিদান প্রভৃতি প্রথা প্রবর্তিত হয়। হিন্দুদের বর্তমান পূজাপদ্ধতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির সৃষ্টি হয়েছে এই সংমিশ্রণের ফলে।

ধর্মীয় জীবন

উপাস্য দেব-দেবী ও অন্তর্নিহিত একেশ্বরবাদ

যাগযজ্ঞ

আর্যরা ছোট ছোট গ্রামে খড়ের ছাউনি দেওয়া কাঠের বা লতাপাতার তৈরী গৃহে বাস করতেন। নগরের কোন উল্লেখ আদি-বৈদিক সাহিত্যে নেই। কৃষিকর্ম ছিল প্রধান জীবিকা। সার ও জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। গৃহে তাঁরা পশুপালন ও দুগ্ধজাত খাদ্য উৎপন্ন করতেন। কিন্তু আর্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা উদাসীন ছিলেন না। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছাড়া তাঁরা সামুদ্রিক বাণিজ্যেও

অর্থনৈতিক জীবন

লিপ্ত ছিলেন। মুদ্রার ব্যবহার অজানা না হলেও বিনিময়-প্রথার বেশী প্রচলন ছিল। প্রধান বিনিময় সামগ্রী ছিল গরু। অন্যান্য বৃত্তিতে নিযুক্তদের মধ্যে ধাতুশিল্পী, চর্মকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

উত্তর-বৈদিক যুগের সভ্যতা ঃ আদি-বৈদিক এবং উত্তর-বৈদিক যুগের মধ্যে সময়ের বিরাট ব্যবধানে আর্য সভ্যতার প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছিল। সংক্ষেপে এই পরিবর্তনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ভৌগোলিক আয়তন ও সেই সঙ্গে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বৃহত্তর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা প্রবল হয়। রাজার ক্ষমতা ও রাজ্যবৃদ্ধির ফলে রাজ্যশাসন ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে।

রাজনৈতিক

সামাজিক অনুশাসন ক্রমশঃ কঠোর হয়ে ওঠে। বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথার উদারতা লুপ্ত হয়ে সামাজিক বৈষম্য ও জটিলতা দেখা দেয়। দেশরক্ষা ও শাসনে ক্ষত্রিয়ের এবং ধর্মজীবনে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্য দুই শ্রেণীর বিশেষ করে শূদ্রের অবস্থার অবনতি হয়। সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি, বরং বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের প্রচলন হওয়ায় তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

সামাজিক

ধর্মজীবনে প্রজাপতি, শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা প্রাধান্য লাভ করে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিস্তারিত নিয়মপদ্ধতি ও সার্থকতা সম্পর্কে কোন কোন দার্শনিকের মনে সংশয় দেখা দেয়।

ধর্মজীবন

উত্তর-বৈদিক যুগে আর্যদের অর্থনৈতিক জীবনেরও পরিবর্তন হয়। প্রথম যুগের বিশুদ্ধ গ্রামীণ সভ্যতার পরিবর্তে কাম্পিল, কৌশাম্বী, কাশীর মত জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী নগর গড়ে ওঠে। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার হয়। ব্যবসায়ী সঙ্ঘ বা 'গণ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

অর্থনৈতিক জীবন

সিন্ধু সভ্যতা ও আর্য সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য ঃ বিশ্বের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ সভ্যতার মধ্যে অন্যতম সিন্ধু ও আর্য সভ্যতা ভারতবর্ষের মাটিতে গড়ে উঠেছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, এই দুই সভ্যতার মধ্যে কোনও সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল কি না। সিন্ধু ও আর্য সভ্যতার মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সিন্ধু সভ্যতা ছিল নাগরিক সভ্যতা, কিন্তু আর্য সভ্যতা মূলতঃ গ্রামীণ সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার যুগে লোহার ব্যবহার

ছিল না। কিন্তু বৈদিক আর্যেরা এই ধাতুর অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস তৈরী করেছিলেন। তেমনি মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় অশ্বের উল্লেখ না থাকলেও বৈদিক সাহিত্যে অশ্বের উল্লেখ আছে। সিন্ধু সভ্যতার যুগে বৃষের উপাসনা হত, কিন্তু আর্যেরা গাভীর পূজা করতেন। মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতায় মূর্তিপূজার প্রচলন থাকলেও আর্যেরা মূর্তি উপাসনা করতেন না। সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম-জীবনে মাতৃদেবীর আরাধনার প্রাধান্য ছিল। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে পুরুষ-দেবতাদের আধিপত্য সুস্পষ্ট। এই সব বিভিন্ন কারণে পণ্ডিতরা মনে করেন যে সিন্ধু সভ্যতা প্রাচীনতর এবং এই দুই সভ্যতার মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না।

চতুর্থ অধ্যায়

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

আধ্যাত্মিক চিন্তা ও সাধনার তীর্থক্ষেত্র ভারতবর্ষ। যুগ যুগ ধরে যে সব ধর্মপ্রবর্তক, সংস্কারক, সাধক ও সন্ন্যাসী এই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন মহাবীর বর্ধমান ও গৌতম বুদ্ধ। ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ হতে উদ্ভূত দুটি বিশিষ্ট ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারকরূপে এই দুই যুগপুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। **বৈদিক যুগের শেষভাগে জাতিভেদ প্রথা, বর্ণবৈষম্য, বলিদান, যাগযজ্ঞের বাহুল্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।** ধর্মের জটিলতা ও আচার-অনুষ্ঠানের সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণরা সমাজে নিজেদের যে প্রাধান্য সৃষ্টি করেছিলেন তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ধর্মের নামে জীবহত্যা অনেককে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করে। ক্রমে ক্রমে এই বিক্ষোভ ধর্মান্দোলনের রূপ নেয় এবং জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সূত্রপাত হয়। ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য এবং অন্তঃসারশূন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পরিণতিরূপেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের জন্ম হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

মহাবীর বর্ধমান ও জৈন ধর্ম ঃ মহাবীরকে জৈন ধর্মের প্রবর্তক মনে করা হলেও তাঁর আগে আরও তেইশ জন তীর্থঙ্কর (ধর্মপ্রবর্তক) এই ধর্ম

প্রচার করেছিলেন। মহাবীর ছিলেন শেষ তীর্থঙ্কর, প্রথম ঋষভ। মহাবীরের আগের তীর্থঙ্কর ছিলেন **পার্শ্বনাথ**। তিনিই জৈনধর্মের সূত্রপাত করেন। তিনি যে মত প্রচার করেছিলেন তার মূল শিক্ষা ছিল অহিংসা, সত্য, অ-চৌর্য (চুরি না করা) ও অ-প্রতিগ্রহ (কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহ না করা অর্থাৎ দান গ্রহণ না করা)।

পার্শ্বনাথ

মহাবীরের পূর্বনাম ছিল বর্ধমান। প্রাচীন বৈশালী নগরের কাছে খ্রীস্টের জন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। কিছুকাল গার্হস্থ্য জীবনের পর তিরিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। এরপর দীর্ঘ বারো বছর ধরে কঠোর তপস্যার ফলে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন ও 'জিন' (রিপুজয়ী), 'নিগ্র্ন্থ' (বন্ধন-মুক্ত) ও **মহাবীর** নামে পরিচিত হন। 'জিন' থেকেই জৈন নামের উৎপত্তি হয়েছে। সিদ্ধিলাভের পর মহাবীর আরও তিরিশ বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে ধর্ম-প্রচার করেন। বাহাত্তর বছর বয়সে পাবা নগরে (বর্তমান পাটনা জেলায়) তিনি দেহত্যাগ করেন।

মহাবীরের জীবনী

মহাবীর

পার্শ্বনাথ যে চারটি শিক্ষা প্রচার করেছিলেন মহাবীর তার সঙ্গে আরও একটি শিক্ষা যোগ করেন। পঞ্চম শিক্ষাটি হল ব্রহ্মচর্য বা জিতেন্দ্রিয়তা। পাঁচটি নীতি একসঙ্গে **পঞ্চ মহাব্রত** নামে খ্যাত। এ ছাড়া মহাবীর ত্রিরত্ন অর্থাৎ সত্যবিশ্বাস, সত্যজ্ঞান ও সত্য-আচরণ—এই তিনটি প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেছিলেন। জৈনরা হিন্দুদের কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশই তাঁদের মতে প্রকৃত ঐশী শক্তি। কৃচ্ছ্রসাধন ও পঞ্চ মহাব্রত পালন করলে জন্মান্তরের

জৈনধর্মের মূলনীতি

বন্ধনমুক্ত হওয়া যায়। জৈনমতে সকল বস্তুর প্রাণ আছে এবং হিংসা মহাপাপ।

জৈন ধর্মশাস্ত্র

পরবর্তী কালে সঙ্কলিত মহাবীরের বাণী বারটি অঙ্গ বা খণ্ডে বিভক্ত। কালক্রমে জৈন ধর্মশাস্ত্রের এক নতুন সংস্করণ সংকলন করা হয়। পরিশোধিত জৈন ধর্মশাস্ত্রের চারটি ভাগ আছে—অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সূত্র।

প্রথম দিকে ব্যাপক প্রসার লাভ না করলেও মৌর্য যুগের সূচনায় জৈন ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। কথিত আছে যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শেষজীবনে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষদিকে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বহু জৈন সন্ন্যাসী উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ ভারতে যাত্রা করেন। এই দলের নেতা ছিলেন **ভদ্রবাহু**। তিনি মহাবীর-প্রবর্তিত রীতি অনুযায়ী জৈনদের

জৈনধর্মের অন্তর্বিরোধ দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জন্ম

বস্ত্র পরিধানের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু উত্তর দিকে যে জৈনরা রয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের নেতা **স্থূলভদ্র** শ্বেতবস্ত্র পরিধানের সমর্থক ছিলেন। এইভাবে বস্ত্রপরিধান সম্পর্কে বিরোধী মতকে কেন্দ্র করে জৈনরা **শ্বেতাম্বর** ও **দিগম্বর** এই দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে এই বিরোধ সুস্পষ্ট রূপ নেয়। পরবর্তী যুগে প্রায় সব জৈন ধর্মাবলম্বীরাই বস্ত্র পরিধান করলেও দুই শাখার মধ্যে বিরোধের অবসান হয়নি। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর শাখা দুটির মধ্যে বিরোধের আর একটি কারণ হল জৈন শাস্ত্র সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। দিগম্বর জৈনরা অবশিষ্ট চারটি 'অঙ্গ'কে প্রামাণিক জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে মূল 'অঙ্গ'গুলি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে।

জৈন ধর্ম কখনও বহির্ভারতে প্রচারিত হয়নি। কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বহু জৈন-ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। এখনও গুজরাট ও রাজপুতানা অঞ্চলে অনেক জৈনধর্মী আছেন।

গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম ঃ মহাবীর বর্ধমান ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। গৌতমের আর এক নাম ছিল সিদ্ধার্থ। নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবস্তু নগরের কাছে লুম্বিনী উদ্যানে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন তাঁর জন্ম হয়। পিতা শুদ্ধোধন ছিলেন ক্ষত্রিয় শাক্যবংশের নেতা। গৌতমের জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাতা মায়া দেবীর মৃত্যু হয়। তখন নবজাত গৌতমের বিমাতা ও মাতৃস্বসা গোতমী তাঁকে মানুষ করেন। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে গৌতম বড় হতে থাকেন। ষোল

বছর বয়সে যশোধরা বা গোপা নামে এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ঊনত্রিশ বছর বয়সে গৌতমের রাহুল নামে এক পুত্র হয়। ইতিমধ্যেই মানুষের জরা, রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি দুর্দশা দেখে তাঁর মন সংসারে বীতরাগ ও অস্থির হয়ে উঠেছিল। পুত্রের জন্মের পর তিনি সংসার বন্ধনে আরও জড়িত হয়ে পড়ার ভয়ে একদিন গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করেন।

বুদ্ধ

গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী গৌতম সত্যজ্ঞানের সন্ধানে দীর্ঘকাল নানান স্থানে ভ্রমণ ও শাস্ত্রপাঠ করেও মনে শান্তি লাভ করতে পারেননি। তখন তিনি কঠোর সাধনা ও কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হন। কিন্তু তবুও তিনি সত্যের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হন। এর পর তিনি বর্তমান বুদ্ধগয়ার কাছে এক বোধি বৃক্ষের নীচে গভীর ধ্যানমগ্ন হন ও অবশেষে 'বোধি' বা 'দিব্যজ্ঞান' লাভ করেন ও 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানী নামে খ্যাত হন। তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ।

গৌতম বুদ্ধের জীবনী

সংসার ত্যাগ

সাধনা ও সিদ্ধিলাভ

একা নিজের মুক্তিতে তৃপ্ত না হয়ে বুদ্ধ তাঁর জীবনের অবশিষ্ট ভাগ ধর্মপ্রচার করেন। সর্বপ্রথম তিনি উপদেশ দেন বারাণসীর কাছে সারনাথের মৃগদাব অরণ্যে। এই সময় পাঁচ জন তাঁর শিষ্য হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সারিপুত্ত ও মোগ্‌গলান। ক্রমশঃ তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, মগধরাজ বিম্বিসার ও অন্যান্য বহু রাজ্যের ধনী ও দরিদ্র মানুষ তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেন। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর বিভিন্ন স্থানে ধর্ম-প্রচারের পর আশি বছর বয়সে কুশীনগরে তাঁর দেহান্ত বা 'মহাপরিনির্বাণ' ঘটে।

ধর্মপ্রচার

নির্বাণ

দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায় সন্ধান করা বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান লক্ষ্য।

চারটি মূল নীতি বা **'আর্যসত্য'** এই ধর্মের ভিত্তি ঃ জগতে দুঃখ আছে; দুঃখের কারণ আছে; দুঃখ নিবারণ সম্ভব; দুঃখ বিনাশের উপায় আছে। দুঃখ বিনাশ করতে কামনা-বাসনা দূর করতে হবে। কামনা-বাসনা নিবৃত্ত করার কতকগুলি উপায় আছে, যথা—সম্যক্ দৃষ্টি, সৎকর্ম, সদ্‌বাক্য, সৎসঙ্কল্প, সৎচেষ্টা, সৎজীবন, সৎস্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি। এই আটটি উপায়ের নাম **'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'**। এই পথেই মুক্তি বা 'নির্বাণ' সম্ভব। নির্বাণ লাভ করলে মানুষের আর জন্ম হয় না, দুঃখভোগ থেকে মুক্তি হয়।

বুদ্ধের ধর্মমত

কর্মবাদ ও অহিংসা বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি। এই ধর্মের আর এক বৈশিষ্ট্য **'পঞ্চশীল'**। এই শীল বা নীতিগুলি হল মিথ্যা না বলা, চুরি না করা, অন্যায় আচরণ না করা, জীব-হিংসা ও বিলাসব্যসন বর্জন করা। বুদ্ধ ভোগবিলাস বা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন দুয়েরই বিরোধী ছিলেন। তিনি 'মঝ্‌ঝিম পথ' বা মধ্যপন্থাকেই শ্রেয়ঃ মনে করতেন। বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বলেননি। তিনি জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। যাগযজ্ঞের সার্থকতায় তিনি অবিশ্বাস করতেন।

মূলনীতি

বৌদ্ধ সাহিত্য ও বৌদ্ধ সঙ্ঘ ঃ বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মমত মুখে প্রচার করেছিলেন, লিখে যাননি। সাধারণ মানুষ যাতে তাঁর উপদেশের মর্ম বুঝতে পারে তার জন্য তিনি সংস্কৃত ভাষার বদলে পালি ভাষায় উপদেশ দিতেন। পালি ছিল সে যুগের কথ্য ভাষা। বুদ্ধের নির্বাণের পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর বাণীগুলি লিপিবদ্ধ করেন। সংকলিত উপদেশগুলি **'ত্রিপিটক'** নামে পরিচিত হয়। এই সংকলনের তিনটি অংশ—(১) সূত্রপিটক ঃ এতে বুদ্ধের বাণী ও প্রচার-কাহিনী আছে; (২) বিনয়পিটক ঃ এই অংশে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের জন্য নির্দেশ ও নিয়মাবলী আছে ও (৩) অভিধর্ম পিটক ঃ এই অংশে বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি ও তত্ত্ব সংকলিত হয়েছে। পরবর্তী কালে জৈন ধর্মের মত বৌদ্ধ ধর্মও দুভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। একটির নাম হয় **হীনযান** ও আর একটির নাম **মহাযান**। এই মতভেদের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ, ব্যাখ্যা, কোষগ্রন্থ প্রভৃতি লেখা হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্যের আর এক সম্পদ **'জাতক'**। জাতকের অপূর্ব সুন্দর গল্পগুলি বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী। জাতকের কাহিনীগুলিতে মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদানও রয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ

বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের জন্য একটি **সঙ্ঘ** গড়েন ও তাঁদের জন্য কয়েকটি

নিয়ম নির্দেশ করেছিলেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা 'ভিক্ষু'রা বৌদ্ধ মঠ বা সঙ্ঘারামে বাস করতেন। প্রথমে বৌদ্ধ সঙ্ঘে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ হলেও পরে তাদের 'ভিক্ষুণী' হবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও সঙ্গীতি

বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভের পর ক্রমে ক্রমে তাঁর মত ও পথের সঠিক ব্যাখ্যা ও অনুসরণ করা নিয়ে বৌদ্ধদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। এই সমাধানের জন্য তাঁর শিষ্যরা রাজগৃহে প্রথম একটি **বৌদ্ধ সঙ্গীতি** (Buddhist Council) আহ্বান করেন। এই সম্মেলনেই বুদ্ধের উপদেশ সঙ্কলিত করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে আরও তিনটি বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহূত হয়েছিল।

হীনযান বৌদ্ধেরা বুদ্ধের সনাতন আদর্শ ও মতামতের কোনও পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু মহাযান বৌদ্ধেরা তাঁদের ধর্মকে আরও সহজ সরল করার পক্ষপাতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা মূর্তিপূজা, ভক্তিবাদ ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মভুক্ত করেছিলেন। বুদ্ধের দেহান্তের পরবর্তী যুগে বহু বিদেশী জাতির মানুষ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ও বিদেশী প্রভাব বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে মতবিরোধের প্রধান কারণ ছিল। কুষাণ আমলে মহাযান মতবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়

এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষ এবং বহির্বিশ্বে প্রচারিত হয়েছিল। এদেশে এবং বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সম্রাট অশোক পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। কুষাণ যুগে, বিশেষতঃ কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায়, বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। মধ্য এশিয়া, দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। এখনও ঐ সব অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আছেন।

বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার

মৌর্য সম্রাট অশোক ও কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের মত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা, বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্নিহিত উদারতা, যুগোপযোগী নমনীয়তা, সাংগঠনিক শক্তি এবং সকল মানুষের সমান অধিকার ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বৌদ্ধ ধর্ম সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

সাফল্যের কারণ

বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য চিরস্থায়ী হয়নি। বর্তমান বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী থাকলেও এই ধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। বৌদ্ধ ধর্মের পতনের মূলে কতকগুলি কারণ ছিল। ব্রাহ্মণরা এই ধর্মের প্রবল বিরোধী ছিলেন। কালক্রমে ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সক্রিয় হন। কণিষ্কের পর একমাত্র হর্ষবর্ধন ছাড়া বৌদ্ধ ধর্ম কোন শক্তিশালী ভারতীয় সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। মধ্যযুগে মুসলমান শাসকদের উৎপীড়ন বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তির অন্যতম কারণ। বৌদ্ধ সঙ্ঘের মধ্যেও কালক্রমে বহু অন্যায় ও অনাচার প্রবেশ করায় বৌদ্ধ সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। হিন্দু ধর্মের আত্মীকরণের ক্ষমতাও বৌদ্ধ ধর্মের পতনের আর এক কারণ।

পতনের কারণ

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ ঃ প্রতিরোধ ও প্রভাব

গগনচুম্বী হিমালয় পর্বতশ্রেণী, বিশাল সমুদ্র ও দুস্তর মরুভূমির বেষ্টনী সত্ত্বেও ভারত-ভূমি বৈদেশিক আক্রমণমুক্ত থাকতে পারেনি। ভারতের ঐশ্বর্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য যুগে যুগে রাজ্য ও যশোলোভী বিদেশী বীর ও অর্থলোভী বণিক ও লুণ্ঠনকারীদের প্রলুব্ধ করেছে।

খ্রীস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে বৈদেশিক আক্রমণের সূচনা করেন পারস্য সম্রাট **কুরুস** বা **কাইরাস**। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তারপর পারস্য-সম্রাট **দারায়ুস** গান্ধার ও সিন্ধু উপত্যকা জয় করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে পারসীক অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

পারসীক আক্রমণ

পরবর্তী বৈদেশিক আক্রমণের ঘটনা (৩২৭-৩২৬ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ) ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক সুপরিচিত অধ্যায়। পিতা ফিলিপের মৃত্যুর পর মাত্র কুড়ি বছর বয়সে **আলেকজাণ্ডার** গ্রীস দেশে ম্যাসিডনের রাজা হন। তিনি গ্রীসের প্রাচীন শত্রু পারস্য সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ জয় করে দিগ্বিজয়ের পথে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন কয়েকটি ছোট ছোট

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ

রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজনৈতিক অনৈক্য আলেকজাণ্ডারের ভারতজয়ের পথ সহজ করেছিল। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি বিনা যুদ্ধে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। সিন্ধুনদের পশ্চিম পারের রাজ্যগুলি জয় করে আলেকজাণ্ডার বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী একটি ছোট্ট রাজ্য আক্রমণ করেন। এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন পুরু। আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে পুরুর সংগ্রামের কাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। এর পর বিপাশা নদী পার হয়ে পূর্ব দিকে গাঙ্গেয় উপত্যকা জয় করে পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত অগ্রসর হবার বাসনা আলেকজাণ্ডারের ছিল। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিশাল নন্দ সাম্রাজ্যের বিরাট সৈন্য বাহিনীর কথা শুনে গ্রীক সৈন্যরা আর অগ্রসর হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তারা দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে রণক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সৈন্যবাহিনীর অনিচ্ছা ও অন্যান্য কারণে আলেকজাণ্ডার স্বদেশে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত করেন। পথে ব্যাবিলনে ৩২৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতে গ্রীক অধিকার বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গ্রীক সেনাপতিদের পরাজিত করে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলি গ্রীক অধিকারমুক্ত করেন। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি ও অন্যতম উত্তরাধিকারী **সেলুকাস** ভারতবর্ষে গ্রীক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে শান্তি ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক অধিকারের অবসান ও সেলুকাসের পরাজয়

সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর (২৩২ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে পার্থিয়া ও বহ্লীক দেশের গ্রীক রাজারা বারবার ভারত আক্রমণ করতে থাকেন। মৌর্য বংশের শেষ সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মগধের সিংহাসনে বসে শুঙ্গবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে শুঙ্গবংশের রাজারাও দুর্বল হয়ে পড়েন ও কান্নবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু কান্নবংশের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শুঙ্গ ও কান্ন বংশের রাজত্বকালে যে সব বিদেশী রাজা উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করে প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সিরিয়ার গ্রীক রাজা **তৃতীয় আন্তিয়োকস্**, ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজা **ডেমেট্রিয়স্, য়ুক্রাতিদিস্** ও **মিনান্দার** প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক অধিকারের সীমানা কম ছিল

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর বহ্লীক গ্রীকদের আক্রমণ

না। পাঞ্জাবের শাকল (শিয়ালকোট) নগর ছিল মিনান্দারের রাজধানী।

বহ্লীক রাজ্যের গ্রীকদের পর ভারতবর্ষে আসে মধ্য-এশিয়ার যাযাবর জাতি। এরা **শক, পহ্লব** ও **ইউ-চি** এই তিন দলে বিভক্ত ছিল। শকদের আদি বাসস্থান ছিল অক্ষু (Oxus) নদীর উত্তর পারে।

শক আক্রমণ

ঘটনাচক্রে ইউ-চি জাতি কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে শকরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতের গ্রীকদের পরাজিত করে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করে। তক্ষশীলা, মথুরা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নগর তারা জয় করেছিল। ক্রমশঃ পশ্চিম ভারতের মালব ও সৌরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শক রাজ্যগুলির শাসকদের মধ্যে সৌরাষ্ট্রের মহাক্ষত্রপ **রুদ্রদামন** (১৩০-১৫০ খ্রীস্টাব্দ) ও ভৃগুকচ্ছের (বর্তমান ব্রোচ) ক্ষত্রপ **নহপান**-এর বিশেষ ক্ষমতা ও খ্যাতি ছিল। পশ্চিম ভারতের শক রাজ্যগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত চতুর্থ শতকের শেষভাগে শকদের পরাজিত করে 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে শকদের পর আসে **পহ্লব** বা **পারদ** জাতি। পহ্লব রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল **গণ্ডোফারনিস**। এঁরই রাজসভায়

পহ্লব আক্রমণ

যীশুখ্রীস্টের শিষ্য সেণ্ট টমাস এসেছিলেন বলে কথিত আছে।

শক ও পহ্লবদের পর **কুষাণরা** ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। কুষাণরা ছিল মধ্য এশিয়ার ইউ-চি জাতির একটি শাখা। অনুমানিক ৫০ খ্রীস্টাব্দে কুষাণ-নায়ক **কুজল কদফিস্‌** কাবুল ও কান্দাহার জয় করে কুষাণ সাম্রাজ্যের

কুষাণ যুগের সূচনা

ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি ভারতবর্ষে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কি না সঠিক জানা যায় না। তাঁর পুত্র **বিম কদফিস্‌** বা **দ্বিতীয় কদফিস্‌** কুষাণ সাম্রাজ্যকে গান্ধার থেকে কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে এই ভারত সাম্রাজ্য শাসন না করে তাঁর প্রতিনিধিদের ওপর শাসনের ভার দিয়েছিলেন।

কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন **কণিষ্ক**। তাঁর সঙ্গে বিম্‌ কদফিসের কি সম্পর্ক ছিল বলা যায় না। কণিষ্ক কবে সিংহাসনে বসেছিলেন তা নিয়েও

কণিষ্ক

ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রবল মতানৈক্য আছে। একটি মত হল, যীশুর মৃত্যুর ৭৮ বছর পরে তিনি রাজা হন ও তখন থেকে শকাব্দ গণনা সুরু হয়। অনেকে কিন্তু এই মত গ্রহণ না করে

অন্যান্য সময়ের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। কণিষ্ক এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। এই সাম্রাজ্যের সীমানা মধ্য এশিয়া থেকে কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুরুষপুর (পেশোয়ার) ছিল তাঁর রাজধানী। চীনের সম্রাটকে যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি এক চীন রাজকুমারকে নিজের রাজ্যে জামিনস্বরূপ রেখেছিলেন।

কণিষ্কের মুদ্রা

কণিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে পুরুষপুরে বুদ্ধের দেহাবশেষের ওপর এক বিরাট স্তূপ নির্মিত হয়। অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, বসুমিত্র, চরক প্রভৃতি বৌদ্ধ কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁরই রাজত্বকালের শেষে বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহূত হয়েছিল।

কণিষ্কের কৃতিত্ব

কণিষ্কের মৃত্যুর পর **বাসিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব** প্রভৃতি রাজত্ব করেন। কুষাণ সাম্রাজ্যের সীমানা ক্রমশঃ ছোট হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কুষাণ অধিকার উত্তর-পশ্চিম ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

কুষাণদের পতন

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত বারবার আক্রান্ত হলেও দক্ষিণ-ভারতে কোন বৈদেশিক আক্রমণ হয়নি। গিরিপথ দিয়ে উত্তর ভারতে প্রবেশ করা খুব দুঃসাধ্য ছিল না। কিন্তু বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণী, নদনদী ও অন্যান্য বাধা থাকায় দক্ষিণ ভারত বিদেশী আক্রমণ হতে দীর্ঘদিন রক্ষা পায়। মৌর্যোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান ছিল **কলিঙ্গের চেত বংশ** ও **অন্ধ্রের সাতবাহন** রাজবংশ। কলিঙ্গের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন **খারবেল**। সাতবাহনরাজ **প্রথম শাতকর্ণির** মৃত্যুর পর সাতবাহন রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে পশ্চিম ভারতের শকরা এই রাজ্যের কিছু অংশ জয় করে নেয়। কিন্তু **গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি** (১০৭-১৩০ খ্রীস্টাব্দ) শকদের পরাজিত করে সাতবাহন-গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি উজ্জয়িনীর শক অধিপতি রুদ্রদামনের কাছে পরাজিত হন। পরে দুই রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হলেও শক-সাতবাহন বিরোধের অবসান হয়নি। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে দুটি রাজ্যই দুর্বল হয়ে পড়ে।

দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

সুদূর দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির মধ্যে **চোল, পাণ্ড্য, চের** প্রভৃতি রাজ্যগুলি ছিল উল্লেখযোগ্য। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে মাদ্রাজের কাছে **পল্লব** নামে এক জাতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কাঞ্চী বা কাঞ্জীভেরাম ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। একটি মত হল যে বৈদেশিক পহ্লব জাতি ও পল্লবরা অভিন্ন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিত এই মত অগ্রাহ্য করেন।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের কয়েক শতাব্দী পর উত্তর ভারতে আর একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন মগধের গুপ্ত রাজবংশ। গুপ্ত যুগের গৌরবময় কাহিনী পরের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল থেকেই মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ বর্বর **হূণ** জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে থাকে। কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত হূণদের সাময়িকভাবে প্রতিরোধ করলেও পরবর্তী দুর্বল গুপ্তবংশের রাজারা সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেননি। হূণরা **তোরমান** ও তাঁর পুত্র **মিহিরকুল** বা **মিহিরগুলের** নেতৃত্বে পাঞ্জাব, মালব ও মধ্যভারতের কিছু অংশ জয় করে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করে। অত্যাচারী হূণরাজ মিহিরকুলকে পরাজিত করে (আঃ ৫৩০ খ্রীস্টাব্দে) গৌরব ও খ্যাতি অর্জন করেন মালবের রাজা **যশোধর্মণ**। তাঁকে এই মহান কাজে সাহায্য করেছিলেন মগধের গুপ্তবংশীয় রাজা বালাদিত্য। হূণদের বিরুদ্ধে তাঁর অসামান্য সাফল্যের জন্য কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে যশোধর্মণই কিংবদন্তীর রাজা 'বিক্রমাদিত্য'। কিন্তু এই মতের সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

গুপ্তযুগে হূণ-আক্রমণ

মালবরাজ যশোধর্মণের কাছে হূণদের পরাজয়

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে কনৌজ। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব ও হিন্দু রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ ভারতে মুসলমান বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। মুসলমান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক নতুন যুগের সূচনা হয়।

মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য

বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা

প্রাচীন ভারতবর্ষে একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণের কাহিনী পড়তে পড়তে মনে প্রশ্ন জাগে যে এই সব আক্রমণের বিরুদ্ধে কি কোন

প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি ? ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা ও অধিবাসীরা কি বিনা সংগ্রামে তাঁদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়েছিলেন ? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামের বহু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে। প্রাচীন যুগের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ করলে এই প্রতিরোধের রূপ ও প্রকৃতি উপলব্ধি করা সহজ হবে।

প্রতিরোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের মত রণকুশল ও দিগ্বিজয়ী সম্রাট পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই জন্মেছেন। তাঁর বাহিনী ছিল অজেয় ও অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু ভারতে প্রবেশের পথে ছোট ছোট পার্বত্য রাজ্যগুলির কাছ থেকে তিনি প্রবল বাধা পেয়েছিলেন। এই অসম যুদ্ধে গ্রীকদের জয় হলেও তাদের তীব্র লড়াই করতে হয়েছিল। তারপর বিতস্তা নদীর তীরে এক ছোট্ট রাজ্যের অধিপতি **পুরু** যেভাবে আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করেছিলেন তার তুলনা বিরল। হিদাস্পিসের স্মরণীয় যুদ্ধে পুরু পরাজিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার পর্যন্ত পুরুর সাহস ও শৌর্যে অভিভূত না হয়ে পারেননি। কথিত আছে যে পরাজিত বন্দী পুরুরাজকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বন্দী, তুমি এখন আমার কাছে কি রকম ব্যবহার প্রত্যাশা কর ?' উত্তরে নির্ভীক বীর পুরু সগর্বে বলেছিলেন, 'রাজার প্রতি রাজার মত।' এক বীরের মর্যাদা দিয়ে আর এক বীর তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে পুরুর সংগ্রাম ও আত্মমর্যাদাবোধের কাহিনী অমর হয়ে আছে।

পুরুর বীরত্ব

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক অধিকার উচ্ছেদ করে ও যুদ্ধে সেলুকাসকে পরাজিত করে **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য** ভারতীয় রণকৌশল ও বীরত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। যতদিন মৌর্য সাম্রাজ্য শক্তিশালী ছিল ততদিন কোন বৈদেশিক জাতি ভারত আক্রমণে সাহসী হয়নি। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সময় থেকে সুরু করে গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময় তার মধ্যে ভারতে একের পর এক বিদেশী জাতি প্রবেশ করে নিজেদের অধিকার বিস্তার করেছিল। বিক্ষিপ্তভাবে কোন কোন রাজ্যে বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ বা বিদেশীদের বিতাড়িত করার চেষ্টা হলেও তা বিশেষ সফল হয়নি। এর প্রধান কারণ ঐ যুগে ভারতে কোন রাজ-

গ্রীকদের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাফল্য

নৈতিক সংহতি ছিল না ও সে রকম শক্তিশালী কোন হিন্দু রাজার জন্ম হয়নি।

মৌর্য সাম্রাজ্যের মত গুপ্ত সাম্রাজ্যও যতদিন শক্তিশালী ছিল ততদিন কোন বৈদেশিক আক্রমন হয়নি। **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত** শকদের বিতাড়িত করেছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গেই হূণ আক্রমণ সুরু হয়ে যায়। কিন্তু মালবের রাজা **যশোধর্মণ** নৃশংস হূণ নেতা মিহিরকুলকে পরাজিত করে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। যশোধর্মণের সাফল্য প্রমাণ করেছিল যে উপযুক্ত নেতৃত্ব ও মনোবল থাকলে হূণদের মত দুর্ধর্ষ জাতিকেও পরাজিত করা সম্ভব।

যশোধর্মণের কৃতিত্ব

পরবর্তী কালে তুর্ক-আফগান এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের বহু দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল।

বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

ইতিহাসের প্রায় সূচনাকাল থেকে ভারতে বৈদেশিক জাতির আগমনের যে স্রোত সুরু হয়েছিল তা এদেশের কেবলমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্বস্তরে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের ফলেই দেখা দিয়েছিল ভারতের জাতিবৈচিত্র্য ও বৈষম্য। যুগ যুগ ধরে কত মানুষের কত স্রোত যে ভারতের জনমহাসমুদ্রে মিশে গিয়ে ভারত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে তার হিসাব নেই। ভারতীয় জীবনের এই অপূর্ব সমন্বয়ের ভাবমূর্তিটি রূপ পেয়েছে কবিগুরুর 'ভারততীর্থ' সঙ্গীতে ঃ

'কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক-হূনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।'

ভারত-ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করলে বৈদেশিক প্রভাবের প্রকৃতি ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ হবে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মৌর্য শিল্পকলা পারস্যের শিল্পকলার প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই মত সকলে গ্রহণ করেন না। তাঁদের মতে মৌর্য শিল্পকলা ছিল আরও উন্নত এবং ভারতীয় শিল্পরীতিরই উজ্জ্বল নিদর্শন।

পারসীক আক্রমণের প্রভাব

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে ভারতীয় শিল্প, জ্যোতিষ ও সাহিত্য কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতায় যে গ্রীক প্রভাব পরবর্তীকালে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় তা বহ্লীক দেশীয় গ্রীকদের সংস্পর্শের ফল। অবশ্য আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ পরোক্ষভাবে বহ্লীক বা ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকদের আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফল

ভারতীয় সভ্যতায় গ্রীক প্রভাবের এক অপূর্ব সুন্দর নিদর্শন হল **গান্ধার-শিল্প**। গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণের ফলে এই শিল্পের বিকাশ হয়েছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গান্ধার অঞ্চলে এই

বুদ্ধের মূর্তি (গান্ধার শিল্প)

শিল্পরীতির প্রচুর নমুনা পাওয়া গেছে বলে এই নামকরণ হয়েছে। কুষাণ যুগে গান্ধার শিল্পের বিশেষ বিকাশ হয়েছিল। এই শিল্পে বৌদ্ধ বিষয়বস্তুর সঙ্গে গ্রীক আঙ্গিকের সমন্বয় ঘটেছিল বলে এই রীতিকে গ্রীক-বৌদ্ধ (Graeco-Buddhist) শিল্পরীতি নামেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। মথুরা ও অমরাবতীর শিল্পকলায় গান্ধার শিল্পরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

গান্ধার শিল্পরীতির বিকাশ

ভারতীয় মুদ্রারচনা ও মুদ্রাঙ্কনেও গ্রীক ও রোমক প্রভাব পড়েছিল। বহ্লীক গ্রীকদের আগমনের পূর্বে ভারতীয় মুদ্রাশিল্প বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেনি। কিন্তু পরবর্তী কালের মুদ্রাগুলিতে উন্নত রুচি ও শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় মুদ্রায় বিদেশী প্রভাব

ভারতবর্ষে বহ্লীক দেশীয় গ্রীক, শক, পহ্লব, ইউ-চি প্রভৃতি যে সব জাতি প্রবেশ করেছিল তারা কালক্রমে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। অনেক গ্রীক হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিল। হেলিওডোরস্ নামে এক গ্রীক দূত বিষ্ণুভক্ত হয়ে একটি গরুড় স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এই যুগের বৈদেশিক জাতির অধিকাংশ মানুষই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। মিনান্দার বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধাচার্য নাগসেনকে বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত যে সব প্রশ্ন করেছিলেন তা 'মিলিন্দ পাঞ্ঞহো' নামে একটি গ্রন্থে লেখা রয়েছে। কুষাণ যুগে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের কথা সুপরিচিত। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে হীনযান ও মহাযান শাখার উৎপত্তির মূলে ছিল বৈদেশিক প্রভাব। মৌর্যোত্তর যুগের শিল্প ও স্থাপত্যেও এই প্রভাব সুস্পষ্ট। গ্রীক শিল্পীদের নির্মিত অনেক বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধলীলার প্রতিমা পাওয়া গেছে।

বৌদ্ধ ধর্মে বিদেশী প্রভাব

বিদেশী জাতিভুক্ত অধিকাংশ লোকই কেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তার কারণ উপলব্ধি করা দুরূহ নয়। ঐ যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে তাদের পক্ষে ভারতীয় সমাজে প্রবেশ ও মর্যাদালাভ করা অনেক সহজ ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সম্মানলাভের জন্য জন্মগত পরিচয়ের মূল্য ছিল খুব বেশী। সেই তুলনায় বৌদ্ধ ধর্ম ছিল উদার ও সমদর্শী। তাছাড়া মৌর্যোত্তর যুগ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্যের যুগ। এই ধর্ম গ্রহণ করে সমাজে মেলামেশার ও স্বীকৃতি পাবার সুযোগ-সুবিধা ছিল বেশী।

বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকর্ষণের কারণ

ভারতে বিদেশী অধিকারের এক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ফল ছিল সমাজে বণিক শ্রেণীর উত্থান ও প্রাধান্য। বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির আগমনের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দূর-প্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সমসাময়িক শিলালিপি, তাম্রলিপি ও সাহিত্যে বণিক শ্রেণীর আর্থিক সমৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বণিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য মৌর্যোত্তর যুগ থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের এক বৈশিষ্ট্য। এই যুগে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধির মূলেও ছিল এই শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা।

বণিক শ্রেণীর উত্থান ও প্রাধান্য

ভারতে আগমনের পর কালক্রমে গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি জাতিভুক্ত লোকেরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হতে সক্ষম হয়। তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পক্ষে এদের উপেক্ষা বা অবহেলা করা আর সম্ভব ছিল না। **প্রভাবশালী ও বিত্তশালী বৈদেশিক জাতিগুলিকে 'পতিত ক্ষত্রিয়' আখ্যা দিয়ে হিন্দু সমাজভুক্ত করার চেষ্টা সুরু হয়।** গুপ্তোত্তর যুগে অনেক বিদেশী জাতি-উদ্ভূত মানুষ নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করেছিল।

বিদেশী জাতির প্রতি হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন

বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের আর একটি ফল ছিল **কারিগরী শিল্পী এবং তাদের 'সঙ্ঘ'গুলির (Guild) সংখ্যা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি।** তাদের কর্মদক্ষতার ওপর রপ্তানি বাণিজ্য নির্ভরশীল ছিল বলে কারিগরী শিল্পীদের সামাজিক মানও উন্নত হয়। শিল্পী 'সঙ্ঘ'গুলি খনি-বিদ্যা, ধাতু-বিদ্যা, বয়ন-বিদ্যা, রঞ্জনীবিদ্যা ইত্যাদি কারিগরী বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্ররূপেও পরিচিতি লাভ করেছিল।

কারিগরী শিল্প ও শিল্পীসঙ্ঘের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি

হিন্দু সমাজব্যবস্থার ওপর বৈদেশিক জাতিগুলির আগমনের প্রভাব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন বিভিন্ন বিদেশী জাতি দলে দলে ভারতে প্রবেশ করতে সুরু করে তখন হিন্দু সমাজরক্ষকরা সমাজে 'ম্লেচ্ছ জাতির' অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েন। **বিদেশীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি এবং প্রাধান্য জাতিভেদ প্রথার ওপর চাপ সৃষ্টি করে।** তাই সমাজব্যবস্থা রক্ষার জন্য নানারকম বিধিনিষেধ রচনা করা হয়। এর ফলে হিন্দুসমাজের উদারতা অনেকখানি লুপ্ত হয়ে সঙ্কীর্ণতা দেখা দেয়। জাতিভেদ-

বিদেশী আগমনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া

প্রথা কঠোর হয়ে পড়ে। হিন্দুরা বিদেশীদের 'ম্লেচ্ছ' অভিহিত করে তাদের সঙ্গে মেলামেশা পরিহার করার চেষ্টা করতে থাকে।

ক্রমে ক্রমে সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে হিন্দু শাস্ত্রকাররা বিধিনিষেধ আরোপ করতে সুরু করেন। **'কালাপানি' পার হওয়ার বিরুদ্ধে সংস্কারের জন্ম হয়।** ধর্মজীবনে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্য দেখা দেওয়ায় মনে করা হত যে সমুদ্র-যাত্রাকালে এবং বিদেশে (ম্লেচ্ছদের রাজ্যে) সবরকম বিধিনিষেধ ঠিক মত পালন করা সম্ভব নয়। এই মনোভাব আরো তীব্র হলে বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। এর ফলে দেশে বণিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্যও কিছুটা হ্রাস পেয়ে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

সমুদ্র-যাত্রাবিরোধী মনোভাবের জন্ম

গুপ্তযুগের শেষ দিকে হূণ আক্রমণ ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্ত দুর্বল করে দিয়েছিল। কিন্তু **হূণ আক্রমণের সামাজিক প্রভাবও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।** এই সময় দেশের চারিদিকে যে অরাজকতা দেখা দেয় তার বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দু ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য জাতিভেদ প্রথার প্রয়োজন ও উপকারিতার কথা অনেকে অনুভব করে। কিন্তু এর ফলে সমাজে উচ্চজাতি বা বর্ণের প্রাধান্য আরও বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে নিম্ন-জাতিভুক্ত মানুষের মর্যাদা আরও কমে যায়। দেশ শাসন, রাজনীতি ও সংস্কৃতি-চর্চা ইত্যাদি কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্বদেশ এমনকি স্বাধীনতা সম্বন্ধেও অনীহা দেখা দেয়। এই ক্রমবর্ধমান বিভেদ ও বৈষম্য ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়েছিল।

হূণ আক্রমণের সামাজিক কুফল

ভারতীয় সমাজের পুনর্বিন্যাসে বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট হয়ে ওঠে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর থেকে সুরু করে মুসলমান অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত। এই প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছরের ইতিহাসকে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ 'রাজপুত জাতির ইতিহাস' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এর কারণ এই যুগে আর্যাবর্তের ইতিহাসে রাজপুত রাজ্যগুলির ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। গুর্জর-প্রতিহার, চন্দেল্ল, চৌহান, পরমার, চৌলুক্য, গাহড়বাল, কলচুরি প্রভৃতি রাজ্যের শাসকরা জাতিতে রাজপুত ছিলেন। রাজপুতদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবল মতভেদ আছে। একটি

সামাজিক পুনর্বিন্যাসে বৈদেশিক আক্রমণের গুরুত্ব

রাজপুত জাতির উৎপত্তি

মত হল, তাঁরা বৈদিক যুগের প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের বংশধর। কিন্তু বহু ঐতিহাসিকের মতে রাজপুতরা শক, হূণ গুর্জর প্রভৃতি বিদেশী জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হয়েছিল। এইসব জাতি ভারতীয় জনসমুদ্রে মিশে গিয়ে হিন্দু-ধর্ম ও ঐতিহ্য গ্রহণ করে এবং কালক্রমে এক নতুন ক্ষত্রিয় সমাজের সৃষ্টি হয়। এই নব ক্ষত্রিয়রাই ইতিহাসে রাজপুত জাতি নামে খ্যাতি লাভ করে। রাজপুতদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য মতও আছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ-বিবর্তনের ফলেই যে রাজপুত জাতির সৃষ্টি হয় এই মত আধুনিক ঐতিহাসিকেরা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। তাঁরা বলেন যে 'রাজপুত' বলতে একটি জাতি বোঝায় না, এমন একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বোঝায় যাদের প্রধান বৃত্তি ছিল যুদ্ধ ও দেশশাসন। এই বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তারা ক্ষত্রিয় বলে স্বীকৃতি পায়। রাজপুতদের উৎপত্তি ভারতীয় সমাজের পুনর্বিন্যাসে বৈদেশিক প্রভাবের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাষ্ট্রিক ঐক্যসাধনার প্রয়াস

মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়

অন্যান্য রাজ্য জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও নিজেকে 'সম্রাট' বা 'রাজচক্রবর্তী' রূপে ঘোষণা করা ছিল প্রাচীন যুগের রাজাদের এক প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য। ঐক্যবদ্ধ সুসংহত সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কালের নিয়মে এক সাম্রাজ্যের উত্থান ও অপর একের পতন ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক চিরন্তন বৈশিষ্ট্য।

ভূমিকা

সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রায় অজানা রয়ে গেছে। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীর ও বুদ্ধের সমসাময়িক যুগে আর্যাবর্তে কোন রাষ্ট্রীয় ঐক্য ছিল না। ঐ যুগের ছোট ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে ষোলটি 'মহাজনপদ' বা রাজ্যের নাম সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই রাজ্যগুলির কয়েকটি ছিল প্রজাতন্ত্র ও অন্য কয়েকটি ছিল রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্র-শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে বৃহত্তর ও শক্তিশালী ছিল **কাশী** (বারাণসী),

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ষোলটি মহাজনপদ

কোশল (অযোধ্যা), **অবন্তী** (মধ্য ভারতের মালব অঞ্চল), **বৎস** (এলাহাবাদ অঞ্চল) এবং **মগধ** (বিহারের দক্ষিণ অঞ্চল)। কালক্রমে এই রাজ্যগুলির মধ্যে ক্রমাগত বিরোধের ফলে কোশল ও মগধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

হর্যঙ্ক বংশের অধীনে মগধের প্রাধান্য বিস্তার

হর্যঙ্ক বংশের রাজা **বিম্বিসার** মগধ সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপন করেন। তাঁর রাজধানী ছিল রাজগৃহ। বিম্বিসারের পুত্র **অজাতশত্রু** প্রতিদ্বন্দ্বী কোশলরাজকে পরাজিত করে মগধ সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অজাতশত্রুর পুত্র **উদয়ী**র সময় গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত **পাটলিপুত্র** (পাটনা) মগধরাজ্যের নতুন রাজধানী হয়।

উদয়ীর পরবর্তী রাজাদের কুশাসন ও উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে রাজ্যের প্রজারা শিশুনাগকে সিংহাসনে বসান। তিনি হর্যঙ্ক বংশের শেষ রাজার মন্ত্রী ছিলেন। কছুকাল পর শিশুনাগের পুত্রকে হত্যা করে **মহাপদ্মনন্দ** মগধের সিংহাসন অধিকার করে নন্দবংশের শাসনের সূচনা করেন।

শিশুনাগ বংশ

নিম্ন বংশজাত হলেও মহাপদ্মনন্দ যোগ্যতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে এতবড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর আর কেউ হননি। মহাপদ্মনন্দের মৃত্যুর পর তাঁর আট পুত্র পরপর রাজত্ব করেন। নন্দবংশের শেষ সম্রাট ছিলেন **ধননন্দ**। তাঁরই রাজত্বকালে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। নন্দ সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি ও বিশালতার কথা চিন্তা করে ও সৈন্যদের অনিচ্ছার জন্য আলেকজাণ্ডার আর অগ্রসর হননি।

নন্দবংশের শাসন

ধননন্দ অত্যাচারী শাসক ছিলেন বলে প্রজাদের কাছে খুব অপ্রিয় ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের অল্পকালের মধ্যেই **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য** নন্দবংশ উচ্ছেদ করে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন (আঃ ৩২১ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ)। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশপরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিনি শূদ্র না ক্ষত্রিয় ছিলেন তা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। কথিত আছে যে নন্দবংশের উচ্ছেদ ও মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার কাজে চন্দ্রগুপ্ত তক্ষশীলার এক অসাধারণ কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পরামর্শ ও সাহায্য পেয়েছিলেন। এঁর নাম ছিল **চাণক্য** বা **কৌটিল্য**। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধান কৃতিত্ব তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক রাজ্যগুলি জয়

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাস তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় **মেগাস্থিনিস** নামে এক দূত পাঠিয়েছিলেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণ, কৌটিল্যের লেখা 'অর্থশাস্ত্র' নামে একটি গ্রন্থ ও অন্যান্য সূত্রে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সুশাসক ছিলেন। মৌর্য-শাসন ব্যবস্থা সুসংগঠিত ছিল। অবশ্য 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটি ঠিক কোন শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল এবং এটি কৌটিল্যেরই লেখা কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে।

চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **বিন্দুসার** পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গ্রীসের রাজাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য ছিল। মিশরের রাজা তাঁর রাজসভায় এক দূত পাঠিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতে মৌর্য অধিকার বিস্তার করেছিলেন।

বিন্দুসার

বিন্দুসারের পর তাঁর পুত্র **অশোক** মগধের রাজা হন (আঃ ২৭৩ খ্রীঃ পূঃ)। কথিত আছে যে সিংহাসন লাভের জন্য অশোক প্রচুর রক্তপাত, এমনকি ভ্রাতৃহত্যা করতে পর্যন্ত দ্বিধা করেননি। এই কারণে তিনি 'চণ্ডাশোক' নামে পরিচিত হন। কিন্তু 'চণ্ডাশোক'ই একদিন জগতে 'ধর্মাশোক' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। কলিঙ্গ যুদ্ধের রক্তবন্যা ও মর্মান্তিক দৃশ্য অশোকের হৃদয়ের এই পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। রাজ্যবিস্তারের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কলিঙ্গ দেশ জয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে জয় হলেও যুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও নিষ্ঠুরতা দেখে অশোক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। বিম্বিসার মগধ সাম্রাজ্যের যে বিস্তার সুরু করেছিলেন অশোক কলিঙ্গ বিজয়ে তার সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন।

অশোক

কলিঙ্গ জয়

এরপর বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত অশোক দিগ্বিজয়ের বদলে ধর্মবিজয়ের নীতি গ্রহণ করেন। প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে সামরিক বলে জয় করার থেকে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করা তিনি শ্রেয়ঃ মনে করেছিলেন। বৈদেশিক রাজ্যগুলি সম্পর্কেও তিনি একই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন রাজ্যে সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে অশোক 'প্রেম ও অহিংসার' বাণী প্রচার করতে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন।

অশোকের মহত্ব

অশোকের সাম্রাজ্য
ম্যাসিডন
(অংতিকিনি)
কৃষ্ণ সাগর
এসিয়া মাইনর
রোম
কার্থেজ
আসীরিয়া
সিরিয়া
ব্যাবিলন
সুসা
সাইরিনি
(মগ)
আরব
পশ্চিম সাগর
পূর্ব্ব সাগর
তিব্বত
চীন দেশ
কাশ্মীর
দিল্লী
কপিলাবস্তু
মথুরা
পাটলিপুত্র
কামরূপ
সাঁচী
সারনাথ
উজ্জয়িনী
বুদ্ধগয়া
সৌরাষ্ট্র
সুরাট
কলিঙ্গ
ধৌলি
সিদ্ধপুর
তাম্রপর্ণি
সুবর্ণভূমি
অশোকের ধর্ম্মলিপি
ধর্ম প্রচার
স্বকীয় রাজ্য
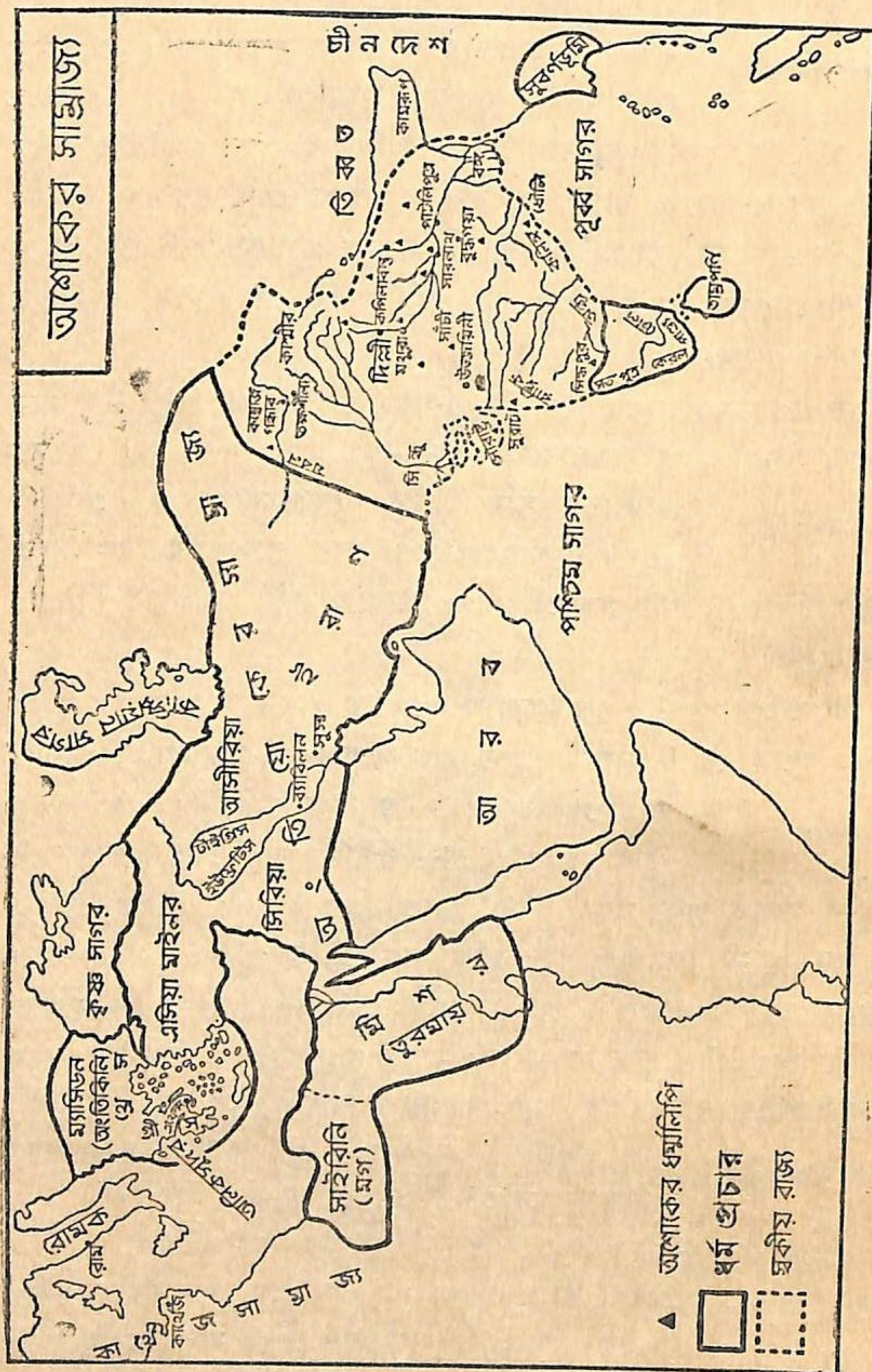
রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রেও তিনি প্রজাকল্যাণের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। প্রজাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও উন্নতি ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তাঁর মহান্ আদর্শ ও কৃতিত্বের জন্য অশোক পৃথিবীর ইতিহাসে এক উজ্জ্বল তারকার মত বিরাজ করছেন।

অশোকের রাজত্বকালে মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমানা উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তানের কিছু অংশ, হিন্দুকুশ ও কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে মহীশূর এবং পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র থেকে পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এত বড় সাম্রাজ্য আর কখনও গড়ে ওঠেনি।

সাম্রাজ্যের সীমানা

অশোকের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয়। অনেকে মনে করেন যে অশোকের পরবর্তী মৌর্য সম্রাটের অযোগ্যতা, কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা, প্রাদেশিক কুশাসন, বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি কারণে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। আর একটি মত হল যে বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে ও প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করে অশোক ব্রাহ্মণদের ক্ষুব্ধ করেছিলেন। তাদের বিরোধিতা মৌর্য শাসনকে দুর্বল করেছিল। কেউ কেউ মনে করেন যে দিগ্বিজয়ের আদর্শ বর্জন এবং শান্তি ও মৈত্রীর নীতি অনুসরণ করে অশোক রাজ্যের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে ফেলেছিলেন। এর ফলে অশোকের মৃত্যুর পর যখন বৈদেশিক আক্রমণ সুরু হয় তখন সাম্রাজ্য রক্ষা করার মত শক্তি বা মনোবল মৌর্য শাসক ও সৈন্যদের ছিল না। এতগুলি মতের মধ্যে কোন একটিকেই গ্রহণযোগ্য মনে করা বোধহয় যুক্তিযুক্ত নয়। বিভিন্ন কারণের সমাবেশেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল বলে অনুমান করাই সমীচীন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

মৌর্য বংশের দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে মগধের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক অরাজকতা ও অনিশ্চয়তার সুযোগে যে সব বিভিন্ন রাজ্য ও রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কণিষ্কের সময় এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠলেও তার রাজধানী ছিল পুরুষপুর (অধুনা পাকিস্তান-অন্তর্গত পেশোয়ার)। দীর্ঘকাল পর গুপ্তযুগে মগধের পুনরভ্যুদয় হয় ও মগধ তার প্রাচীন গৌরব ও মর্যাদা ফিরে পায়।

সাময়িকভাবে মগধের প্রাধান্য লোপ

গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **শ্রীগুপ্ত**। প্রথমে তিনি ও পরে তাঁর পুত্র

গুপ্ত সাম্রাজ্য
গন্ধার
কাবুল
কাশ্মীর
তক্ষশীলা
কুষাণ রাজ্য
কর্তৃপুর
মদ্রক
যৌধেয়
দিল্লী
মিরাট
হি মা ল য় প র্ব ত
শ্রাবস্তী
নেপাল
ললিতাপুর
কপিলবস্তু
কামরূপ
সিন্ধু
আশ্রিত রাজ্য
মথুরা
বৈরাট
গঙ্গা
অযোধ্যা
কোশল
বৈশালী
পাটলিপুত্র
ব্রহ্মপুত্র
যমুনা
চম্বল
প্রয়াগ
কাশী
শকরাজ্য
সাঁচী
শোণ
বুদ্ধগয়া
বঙ্গ
সমতট
মালব
উজ্জয়িনী
নর্মদা
মহাকোশল
তাম্রলিপ্তি
সৌরাষ্ট্র
গিরনার
তাপ্তী
মহানদী
ওড্র
সুরাট
নাসিক
ধৌলি
কলিঙ্গ
গোদাবরী
অন্ধ্র
অমরাবতী
বেঙ্গী
সিদ্ধপুর
কৃষ্ণা
পেনার
কাঞ্চী
পল্লব
কাবেরী
চোল
সিংহল
▲ অশোকের শিলালিপি
মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমানা
গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমানা
→→→→ সমুদ্রগুপ্তের অভিযানপথ
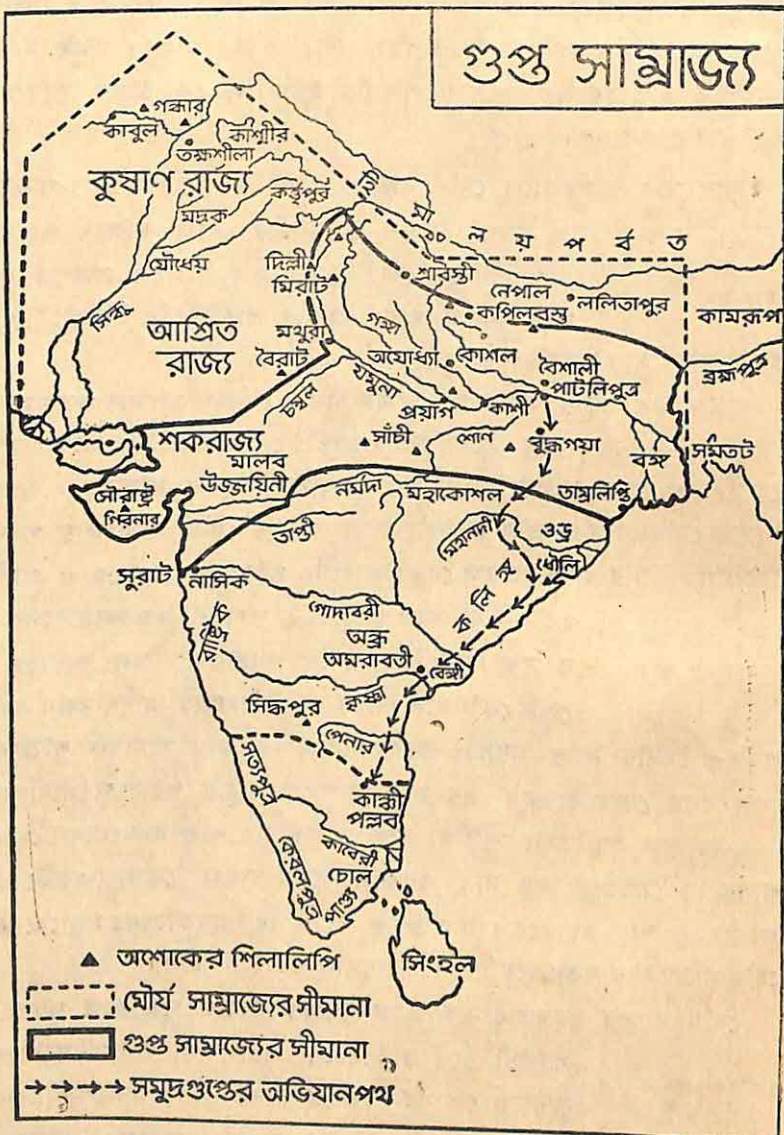
মগধের মধ্যে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক ছিলেন। পরবর্তী রাজা **প্রথম চন্দ্রগুপ্ত** (৩২০-৩৩০ খ্রীঃ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি বৈশালীর লিচ্ছবি বংশের রাজকুমারীকে বিবাহ করে গুপ্তরাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর রাজ্যসীমা মগধ থেকে প্রয়াগ ও অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সিংহাসন লাভের সময় থেকে গুপ্ত সম্বতের প্রচলন হয়।

গুপ্তযুগে মগধের পুনরভ্যুদয়: প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর গুপ্ত সিংহাসনে বসেন তাঁর যোগ্যতম পুত্র **সমুদ্রগুপ্ত**। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন (৩৩০-৩৮০ বা মতান্তরে ৩৭৬ খ্রীঃ)। নিজের বাহুবলে সমুদ্রগুপ্ত গুপ্ত রাজ্যকে একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। তাঁর সভাকবি হরিষেণ-রচিত প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা আছে। এলাহাবাদের একটি স্তম্ভের গায়ে এই শিলালিপিটি আছে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য জয় করে তিনি গঙ্গা, যমুনা ও চম্বল নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে নিজের অধিকার স্থাপন করেন। দক্ষিণ ভারতেরও বহু রাজাকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেন। কিন্তু রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে তিনি এই সব রাজ্য প্রত্যক্ষভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত না করে আনুগত্যের শপথের বিনিময়ে বিজিত রাজাদের প্রত্যর্পণ করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে পাটলিপুত্র থেকে সুদূর দাক্ষিণাত্যে সুশাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে কামরূপ (আসাম), সমতট (পূর্ব-দক্ষিণ বাংলা), উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে নেপাল, পাঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কুষাণ ও শক রাজারা সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। দিগ্বিজয় শেষ করে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ সামরিক শক্তি ও

সমুদ্রগুপ্ত

রাজ্যবিস্তার ও সামরিক কৃতিত্ব

সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

সাফল্যের জন্য ঐতিহাসিক স্মিথ সমুদ্রগুপ্তকে 'ভারতের নেপলিয়ন' আখ্যা দিয়েছেন।

সমুদ্রগুপ্তের বহুমুখী প্রতিভা ছিল। তিনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতবিদ্যা-পারদর্শী। গুপ্ত যুগের কিছু মুদ্রায় সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত মূর্তি অঙ্কিত আছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও তিনি অন্য ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাননি।

সমুদ্রগুপ্তের বহুমুখী প্রতিভা

সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত** (৩৭৬।৩৮০—৪১৫ খ্রীঃ) ছিলেন পিতার উপযুক্ত পুত্র। তাঁর কাছে মালব ও সৌরাষ্ট্রের শক রাজাদের পরাজয়ের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। শকদের পরাভূত করে তিনি তাঁর রাজ্যসীমা পশ্চিমে আরব সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। এর ফলে বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের নীতি অনুসরণ করে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে তিনি তাঁর শক্তি ও সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি নিজে নাগবংশীয় রাজকন্যা কুবেরনাগকে বিবাহ করেন। কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে বিদর্ভ অঞ্চলের শক্তিশালী বাকাটক বংশীয় রাজার বিবাহ দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

দিল্লীর কাছে মেহেরৌলি নামে এক জায়গায় একটি লৌহস্তম্ভে চন্দ্ররাজ নামে এক রাজার দিগ্বিজয়ের উল্লেখ আছে। এই চন্দ্ররাজ ও গুপ্তবংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে অভিন্ন মনে করে কোন কোন ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে তিনি বঙ্গদেশ ও উত্তর-পশ্চিমের বহ্লীক জাতির অধিকৃত অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শকদের পরাজিত করে 'শকারি' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। পাটলিপুত্র তার রাজধানী হলেও তাঁকে উজ্জয়িনীরাজ রূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। এই সব কারণে **অনেকে মনে করেন যে কিংবদন্তীর রাজা 'বিক্রমাদিত্য'**

ও গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত একই ব্যক্তি। তাঁরই রাজসভায় কালিদাস, মিহির, বররুচি, ধন্বন্তরী, বেতালভট্ট প্রমুখ নবরত্নের সমাবেশ হয়েছিল। কিন্তু এই অনুমান ঠিক কিনা সন্দেহ আছে, কেননা নবরত্ন সভার নয়জন রত্নই একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু মহাকবি কালিদাস খুব সম্ভব দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিদ্যা ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কবি বীরসেন ছিলেন তাঁর মন্ত্রী ও সভাসদ্‌। তাঁরই রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক **ফা-হিয়েন** ভারত পর্যটনে এসেছিলেন। তাঁর লেখা বিবরণ থেকে গুপ্তযুগে মগধ সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা, গৌরব ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় (পৃষ্ঠা ৬৭)।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই কি কিংবদন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্য ?

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র **প্রথম কুমারগুপ্ত** (৪১৫-৪৫৫ খ্রীঃ) ও পৌত্র **স্কন্দগুপ্ত** (৪৫৫-৪৬৭ খ্রীঃ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব ও সীমানা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের শেষ দিকে দাক্ষিণাত্যের নর্মদা অঞ্চলের পুষ্যমিত্র জাতির বিদ্রোহের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যে বিপদ দেখা দেয়। স্কন্দগুপ্ত এই সংকট থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন।

স্কন্দগুপ্তের পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন সুরু হয়। তাঁর রাজত্বকালেই হূণ আক্রমণ সুরু হয়েছিল। পরবর্তী দুর্বল গুপ্তরাজাদের পক্ষে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। বৈদেশিক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের মধ্যেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রাধান্য ও সীমানা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। মালব, বঙ্গদেশ, সৌরাষ্ট্র ও কনৌজ প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। এইভাবে ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে মগধেও গুপ্ত অধিকার লুপ্ত হয় ও মগধ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও গৌরবের অবসান হয়।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, বৈদেশিক আক্রমণ, কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও কর্মচারীদের শক্তিবৃদ্ধি, রাজপরিবারে আত্মকলহ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। পুষ্যমিত্র জাতির বিদ্রোহ এবং হূণদের আক্রমণ সাম্রাজ্যের ভিত দুর্বল করে দিয়েছিল। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর আর কোনও শক্তিশালী সুযোগ্য সম্রাট গুপ্ত সিংহাসনে বসেননি। এর ফলে একদিকে যেমন হূণ আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি অন্যদিকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি রোধ করা যায়নি। মান্দাসোরে যশোধর্মণ, উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকায় মৌখরী বংশ এবং পূর্ব ভারতে গৌড় রাজ্যের

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কারণ

উত্থান গুপ্ত সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। রাজবংশের দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে গুপ্তবংশে আত্মকলহ দেখা দেয়। সাম্রাজ্য আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। বুধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য প্রমুখ পরবর্তী গুপ্তরাজাদের বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগ রাজ্যের সামরিক শক্তি ও বীর্যের দৈন্য প্রকাশ ক'রে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কেন্দ্রীয় শক্তিকে উপেক্ষা করতে উৎসাহিত করেছিল।

কনৌজ সাম্রাজ্যের উত্থান

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে যে সব রাজবংশের উৎপত্তি হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল **মৌখরি ও পুষ্যভূতি বংশ**। মৌখরি বংশের প্রধান শাখাটি গাঙ্গেয় উপত্যকা ও অযোধ্যা থেকে মগধ পর্যন্ত অঞ্চলে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এদের রাজধানী ছিল **কনৌজ** বা **কান্যকুব্জ**। কনৌজের মৌখরি বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন **ঈশানবর্মণ**। এই বংশের

হর্ষবর্ধন

কনৌজের মৌখরি বংশ ও থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ

শেষ রাজা **গ্রহবর্মণ** পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে স্বাধীন **থানেশ্বর** রাজ্যের পুষ্যভূতি বংশের রাজা **প্রভাকর বর্ধনের** কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেছিলেন। প্রভাকর বর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধনের রাজ্যলাভের অল্পকালের মধ্যেই গৌড়রাজ **শশাঙ্ক** মালবের রাজা দেবগুপ্তের সহযোগিতায় মৌখরি রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গ্রহবর্মণ পরাজিত ও নিহত হন এবং রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। এই দারুণ দুঃসংবাদ পেয়ে রাজ্যশ্রীর ভ্রাতা থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন সসৈন্যে কনৌজ যাত্রা করেন। কিন্তু দেবগুপ্তকে পরাজিত করলেও রাজবর্ধন নিজেও শশাঙ্কের হাতে নিহত হন।

গৌড়রাজ শশাঙ্কের মৌখরি রাজ্য আক্রমণ

রাজ্যবর্ধনের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা **হর্ষবর্ধন** ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন। এই সময় থেকে হর্ষাব্দ গণনা করা হয়। ভগ্নী রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মণের মৃত্যুতে কনৌজের সিংহাসনও তখন শূন্য ছিল। হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে শাস্তিদান ও রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে কনৌজে উপস্থিত হন। বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে রাজ্যশ্রী যখন অগ্নিতে জীবন বিসর্জন দিতে উদ্যত, ঠিক সেই সময়ে হর্ষবর্ধন ভগ্নীর সন্ধান পান ও তাঁকে আত্মাহুতি থেকে নিবৃত্ত করেন। সকলের অনুরোধে হর্ষবর্ধন কনৌজের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এইভাবে কনৌজের মৌখরি রাজ্য ও থানেশ্বরের পুষ্যভূতি রাজ্য যুক্ত হয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই নতুন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনৌজ আর্যাবর্তের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুর মর্যাদা লাভ করে।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু ও হর্ষবর্ধনের সিংহাসন লাভ

কনৌজ ও থানেশ্বর রাজ্যের মিলন

অগ্রজ রাজ্যবর্ধন ও ভগ্নীপতি গ্রহবর্মণের হত্যাকারী গৌড়রাজ শশাঙ্ককে পরাজিত করে শাস্তিদান করা ছিল হর্ষবর্ধনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। কিন্তু শশাঙ্কের জীবিতকালে হর্ষ গৌড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের যুদ্ধ

হর্ষ দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাতাপির চালুক্য বংশের রাজা **দ্বিতীয় পুলকেশী**র কাছে পরাজিত হওয়ায় হর্ষের এই ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারেনি। বর্তমান গঞ্জাম জেলার অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন কোঙ্গোদ রাজ্য হর্ষ জয় করেছিলেন। পশ্চিম ভারতের বলভী রাজ্যের অধিপতি দ্বিতীয় ধ্রুবসেন বা ধ্রুবভট্ট হর্ষের প্রাধান্য স্বীকার করে তাঁর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। একটি শিলালিপিতে হর্ষকে 'উত্তরাপথনাথ' অর্থাৎ সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর বলে বর্ণনা করে হয়েছে। কিন্তু অনেকে এটি অত্যুক্তি মনে করেন।

হর্ষের রাজ্যবিস্তার

হর্ষের সামরিক সাফল্য ও তাঁর রাজ্যের সীমানা সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী তথ্য থাকায় কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। তবে নেপাল, সিন্ধু, কাশ্মীর, পাঞ্জাবের কিছু অংশ, রাজপুতানা ও কামরূপ ছাড়া উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে হর্ষবর্ধনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই বিষয়ে সাধারণভাবে মতৈক্য আছে।

রাজ্যসীমা
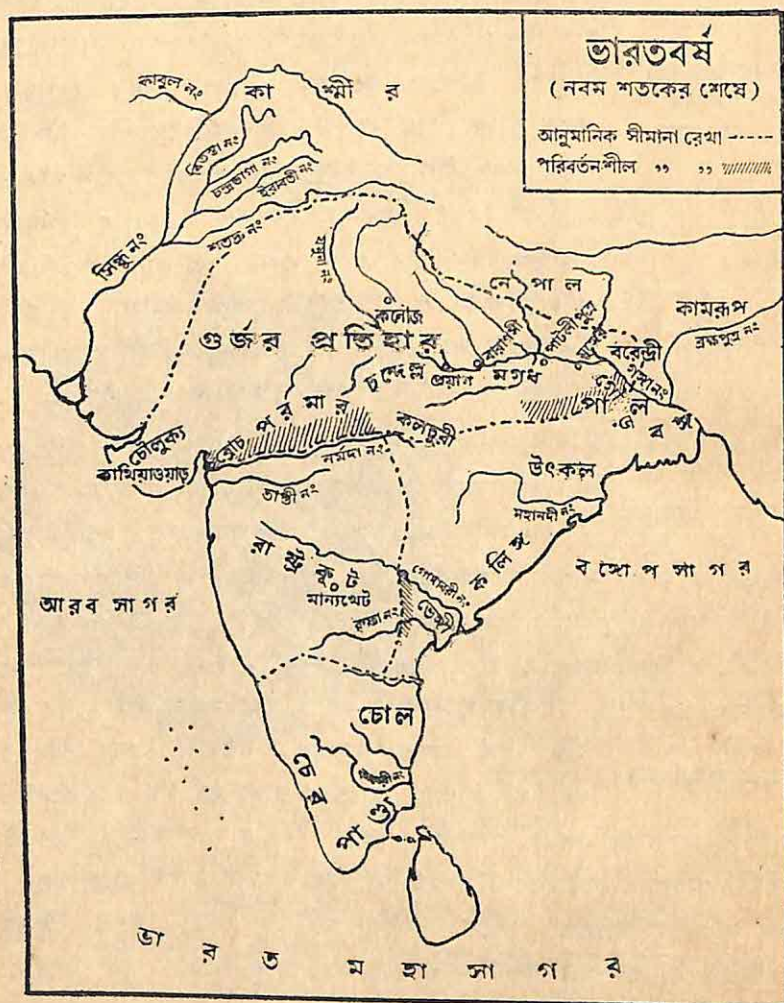
গুর্জর-প্রতিহার, পাল ও রাষ্ট্রকূট
সাম্রাজ্যের আনুমানিক সীমানা

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চীনদেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক **হিউয়েন-সাঙ** বা **য়ুয়ান-চেয়াঙ** হর্ষের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। হর্ষ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে হর্ষের রাজত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য আছে।

হর্ষের কৃতিত্ব

শৈব মতাবলম্বী হলেও সম্ভবতঃ হিউয়েন-সাঙের প্রভাবে হর্ষ বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হয়েছিলেন। তিনি কনৌজে একটি বিরাট ধর্মসভার আয়োজন করেছিলেন। তাঁর দান-ধ্যান, জনহিতকর কাজ ও উদারতার জন্য হর্ষবর্ধন সুবিখ্যাত ছিলেন। তিনি নিজে বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনের মর্যাদা লাভ করেছিল। সব দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে হর্ষবর্ধনের সময় কনৌজ সাম্রাজ্য শক্তিশালী ও উন্নত হয়েছিল।

হর্ষের পর যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে পুষ্যভূতি বংশের গৌরবময় অধ্যায়ের সমাপ্তি হয়। হর্ষের মৃত্যুর পরবর্তী পঁচাত্তর বছরের ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত রয়ে গেছে। আনুমানিক ৭২৫ থেকে ৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের

যশোবর্মণ

মধ্যে **যশোবর্মণ** নামে এক বীরনায়ক কনৌজের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। তিনি পূর্ব দিকে রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেছিলেন এবং চীনদেশে একজন দূত পাঠিয়েছিলেন। যশোবর্মণকে কাশ্মীর রাজ্যের কর্কোটবংশীয় রাজা **ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়**

কাশ্মীর রাজ্যের রাজাদের কনৌজ আক্রমণ

(৭২৪—৭৬০ খ্রীঃ) যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। ললিতাদিত্যের পৌত্র **জয়াপীড় বিনয়াদিত্যও** (৭৭৯—৮১০ খ্রীঃ) কনৌজের এক ক্ষুদ্র রাজবংশের রাজাকে পরাজিত করেন। এই বংশের রাজাদের নামের শেষে 'আয়ুধ' শব্দটি যুক্ত থাকত। জয়াপীড়ের পর কাশ্মীর রাজ্য দুর্বল ও মর্যাদাহীন হয়ে পড়ে।

হর্ষের পরবর্তী যুগে কনৌজ সাম্রাজ্যের গৌরব ম্লান হলেও কনৌজের

কনৌজ অধিকারের জন্য প্রতিহার-পাল-রাষ্ট্রকূট প্রতিদ্বন্দ্বিতা

রাজনৈতিক গুরুত্ব কমেনি। আর্যাবর্তের রাজনৈতিক জীবনে কনৌজ তখনও ছিল কেন্দ্রবিন্দু। অষ্টম শতকে কনৌজ অধিকার ছিল রাজনৈতিক প্রাধান্যের প্রমাণ-স্বরূপ। কনৌজ-অধিকার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে এক সময় গুর্জর-প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট এবং পাল রাজাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। কনৌজের

জন্য এই **ত্রি-শক্তির সংগ্রাম** (Tripartite struggle) ঐ যুগের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। রাজপুতদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে **প্রতিহার** বা **গুর্জর-প্রতিহার** বংশ বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। প্রতিহার **বৎসরাজ**-এর রাজত্বকাল (৭৩৮—৭৮৭ খ্রীঃ) থেকেই প্রতিহার-পাল-রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। বৎসরাজের পুত্র **দ্বিতীয় নাগভট** (৮১৫—৮৩৩ খ্রীঃ) কনৌজ অধিকার করেন ও তাঁর সময়েই প্রতিহার রাজ্যের সীমানা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তিনি পালবংশের রাজা ধর্মপালকে পরাজিত করলেও রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। পরবর্তী রাজাদের মধ্যে **মিহিরভোজ** (৮৩৬—৮৮৫ খ্রীঃ) ও **প্রথম মহেন্দ্রপাল** (৮৮৫—৯১০ খ্রীঃ) প্রতিহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন।

কনৌজের গুর্জর-প্রতিহার বংশ

এর পর প্রতিহার রাজ্যের পতন সুরু হয়। রাষ্ট্রকূটরাজদের আক্রমণে কনৌজ সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়। এই সুযোগে ক্রমে ক্রমে জেজাকভুক্তিতে (মধ্য ভারতের বুন্দেলখণ্ড) **চন্দেল্ল,** মালবে **পরমার,** জব্বলপুর অঞ্চলে **কলচুরি**, গুজরাটে **চৌলুক্য**, আজমীরে **চৌহান** এবং উত্তর প্রদেশে **গাহড়বাল** প্রভৃতি স্বাধীন রাজপুত রাজ্যের উদ্ভব হয়। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়।

প্রতিহার বংশের পতন ও বিভিন্ন রাজপুত রাজ্যের জন্ম

প্রতিহার বংশের সাম্রাজ্য ছিল প্রাচীন ভারতের শেষ বৃহৎ হিন্দু সাম্রাজ্য। সুশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন ও ধর্ম এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও প্রতিহাররা খ্যাতিলাভ করেছিলেন। যতদিন প্রতিহার সাম্রাজ্য শক্তিশালী ও অটুট ছিল ততদিন সিন্ধুদেশের আরবরা ভারত ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি।

প্রতিহারদের কৃতিত্ব

গৌড় রাজ্যের উত্থান

গৌড় বলতে যে কোন্ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল বোঝায় তা নিয়ে মতভেদ আছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাজত্বে গৌড়ের সীমানার পরিবর্তন হয়েছিল। পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের ভূখণ্ড মিলে বর্তমান যা আয়তন

প্রাচীন বাংলার আয়তন তার থেকেও কিছু বেশী ছিল। এই অঞ্চলে পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, গৌড় প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদ ছিল। সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও জনপদগুলির ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের কিছু অংশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন সাহিত্যে গৌড়ের উল্লেখ আছে। প্রাচীন বঙ্গ বা বাংলাদেশের* বিভিন্ন অংশ মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

গৌড়ের অবস্থান

প্রাচীন জনপদ

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলাদেশ নানা ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যের জন্ম হয়। ষষ্ঠ শতকের শেষ ও সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে এই সব রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে শক্তি ও খ্যাতি অর্জন করে গৌড় রাজ্য। গৌড়ের উত্থানের মূলে ছিলেন **শশাঙ্ক**। শশাঙ্কের প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। একটি অনুমান হল, তিনি পরবর্তী গুপ্তবংশের (Later Guptas) মগধরাজ মহাসেনগুপ্তের সামন্ত বা সেনাপতি ছিলেন। পরে নিজের বুদ্ধি ও বাহুবলে তিনি স্বাধীন গৌড় রাজ্য স্থাপন করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। পশ্চিমে বারাণসী থেকে পূর্ব উপকূলের গঞ্জাম (উড়িষ্যা) পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। উত্তর ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কনৌজের মৌখরি বংশের রাজা গ্রহবর্মণকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। শশাঙ্কের সহযোগী মিত্র ছিলেন মালবরাজ দেবগুপ্ত। মৌখরিদের সঙ্গে যুদ্ধের পরিণতিরূপে তিনি কিভাবে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের ক্ষমতা হ্রাস করতে বা তাঁকে শাস্তি দিতে পারেননি। অবশ্য কনৌজের মৌখরি বংশের রাজাকে পরাজিত করলেও শশাঙ্ক কনৌজে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। হর্ষ থানেশ্বর ও কনৌজ দুটি রাজ্যেরই অধীশ্বর হয়েছিলেন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে এবং হিউয়েন-সাঙের বিবরণে শশাঙ্ক সম্বন্ধে অনেক বিরূপ মন্তব্য আছে এবং তাঁর শক্তিকে অনেক লঘুরূপে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাণভট্ট ও হিউয়েন-সাঙ দুজনেই

গৌড় রাজ্যের উত্থান ও শশাঙ্ক

কনৌজ আক্রমণ

হর্ষ ও শশাঙ্কের বিরোধ

* বাংলাদেশ বলতে ইতিহাসে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ বোঝায়।

হর্ষবর্ধনের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের বিবরণ কিছুটা পক্ষপাতদুষ্ট ও অতিরঞ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। শশাঙ্ক শৈব-ধর্মাবলম্বী এবং ঐ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে হিউয়েন-সাঙ যে বৌদ্ধ উৎপীড়নের অভিযোগ করেছিলেন তা সকলে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন না।

শশাঙ্কের কালনির্ণয়

শশাঙ্কের রাজত্বের সঠিক কাল নির্ণয় করা যায় না। অনুমান করা হয় যে হর্ষের রাজত্বকালের সূচনা থেকে অন্ততঃ ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শশাঙ্কের ক্ষমতা হ্রাস পায়নি। ৬১৯ থেকে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

কৃতিত্ব

গৌড়রাজ্যের উত্থানে শশাঙ্কের বিশেষ অবদান ছিল। তাঁর রাজত্বকালেই গৌড় ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব পেয়েছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার শশাঙ্ককে বাংলাদেশের রাজাদের মধ্যে প্রথম সার্বভৌম নরপতিরূপে বর্ণনা করেছেন।

গোপালকে রাজা নির্বাচন ও পাল রাজাদের সূচনা

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য লুপ্ত হয় এবং বাংলাদেশে ভীষণ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন এবং হর্ষবর্ধনও মগধ অধিকার করে মগধরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু আনুমানিক ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। প্রায় একশো বছর ধরে সবলের অত্যাচার, অনাচার ও উৎপীড়নে বাংলাদেশের মানুষের জীবন অসহ্য হয়ে উঠলে দেশের নেতারা ও সাধারণ মানুষ 'মাৎস্যন্যায়' বা অরাজকতা, হানাহানির অবসানের উদ্দেশ্যে গোপাল নামে এক বীর, গুণবান, যোগ্য ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচন করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই-ভাবে রাজা নির্বাচনের দৃষ্টান্ত বিরল।

গোপাল (৭৫০-৭৭০ খ্রীঃ)

গোপাল (আঃ ৭৫০-৭৭০ খ্রীঃ) রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তিনি যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম হয় **পালবংশ**। গোপালের রাজত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং নালন্দাতে একটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও তিনি স্থাপন করেছিলেন।

গোপালের পর তাঁর পুত্র **ধর্মপাল** (আঃ ৭৭০-৮১০ খ্রীঃ) রাজা হন। তাঁর সময় থেকেই পাল রাজারা উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রাধান্য স্থাপন ও কনৌজ অধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়েন। ধর্মপাল কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করে নিজের মনোনীত চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসান। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক রাজসম্মেলনে ভোজ, মৎস্য, কুরু, যবন, অবন্তী, গান্ধার, কীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা ধর্মপালের প্রাধান্য স্বীকার করেন। কিন্তু আর্যাবর্তে তাঁর আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। প্রতিহাররাজ **দ্বিতীয় নাগভট** চক্রায়ুধকে কনৌজ থেকে বিতাড়িত করে সেখানে প্রতিহার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। মুঙ্গেরের কাছে এক যুদ্ধে তিনি ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু এই সময় রাষ্ট্রকূটরাজ **তৃতীয় গোবিন্দ** উত্তর ভারত আক্রমণ করে প্রতিহাররাজকে পরাজিত করলে ধর্মপালের পরোক্ষভাবে লাভ হয়। তিনি তৃতীয় গোবিন্দের প্রাধান্য স্বীকার করে নেন। গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপালের হৃত প্রাধান্য ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ধর্মপাল
(৭৭০-৮১০ খ্রীঃ)

উত্তর ভারতে
অধিকার বিস্তার

ধর্মপাল পালবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পূর্ব ভারত এবং পাটলিপুত্র নগর অতীতের কিছু গৌরব ও খ্যাতি ফিরে পেয়েছিল। তিনি বিখ্যাত বিক্রমশিলা বিহার ও সোমপুরী বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিজে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী হলেও ধর্মপাল পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর মন্ত্রী গর্গ ছিলেন ব্রাহ্মণ। ধর্মপাল সুশাসকরূপেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

ধর্মপালের কৃতিত্ব

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (আঃ ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ) গৌড় রাজ্যের সীমানা আরও বিস্তৃত করেছিলেন। এই সময়ের শিলালিপিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে দেবপালের রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য এবং পশ্চিমে আরব সমুদ্র থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি গুর্জর, দ্রাবিড় ও হূণদের পরাজিত করেছিলেন। উৎকল ও কামরূপ অধিকার করেছিলেন। কিছুটা অত্যুক্তি হলেও দেবপালের সামরিক সাফল্য ও রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। হূণদের বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্যের উল্লেখ থেকে অনুমান করা হয় তিনি হিমালয়ের নিকটবর্তী কোন হূণরাজ্যের বিরুদ্ধে সফল অভিযান করেছিলেন।

দেবপাল
(৮১০-৮৫০ খ্রীঃ)

রাজ্যবিস্তার

গুর্জর ও দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্যের দাবী থেকে অনুমান করা যায় যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট-পাল এই ত্রিশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পুনরায় সুরু হয়েছিল। দেবপাল সম্ভবতঃ কনৌজের প্রতিহাররাজ মিহিরভোজকে পরাজিত করে তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করেছিলেন। দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে জয়লাভের উল্লেখ থেকে মনে হয় দেবপাল রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষকেও পরাজিত করেছিলেন। অন্য সূত্রে জানা যায় যে এই সময় আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে রাষ্ট্রকূটরা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে দেবপাল-বিজিত এই দ্রাবিড়রাজ্যটি ছিল সুদূর দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যরাজ্য।

ত্রি-শক্তির সংগ্রামে সাফল্য

দেবপালের রাজত্বকালে গৌড়রাজ্যের খ্যাতি বহির্ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের সম্মতি নিয়ে নালন্দায় একটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে এই মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবপাল পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন।

দেবপালের খ্যাতি ও কৃতিত্ব

দেবপাল মুঙ্গেরে তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন। তিনি নালন্দার পৃষ্ঠপোষক এবং শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত ও কবি ব্রজদত্ত তাঁর সভাকবি ছিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি মন্ত্রী ছিলেন দর্ভপাণি ও কেদারমিশ্র। আরব পর্যটক সুলেমান তাঁর ভারত বিবরণে দেবপালের সামরিক শক্তির উল্লেখ করে লিখেছেন যে পাল সৈন্যবাহিনী প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট বাহিনীর চেয়ে শক্তিশালী ছিল। দেবপাল সগৌরবে প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। ইতিপূর্বে এবং এর পরে বাংলাদেশের কোনও সম্রাট এত বড় সাম্রাজ্যের অধিকারী হতে বা এত খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। আনুমানিক ৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দেবপালের মৃত্যু হয়।

দেবপালের মৃত্যুর পর পালবংশের পতন সুরু হয়। পরবর্তী পাল রাজাদের মধ্যে প্রথম বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল বা অন্যান্যরা কোন সামরিক কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। তাঁদের দুর্বলতার সুযোগে প্রতিহার রাজবংশ উত্তর ভারতে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটদের কাছেও পালরাজারা পরাজিত হয়েছিলেন। **প্রথম মহীপাল** (আঃ ৯৮৮-১০৩৮ খ্রীঃ) সাময়িকভাবে পাল বংশের গৌরব কিছুটা উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে কলচুরি, চন্দেল্ল

পাল বংশের পতন

এবং দাক্ষিণাত্যের চোল রাজবংশের রাজাদের আক্রমণে এবং দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের নেতা **দিব্য** বা **দিব্বোকের** নেতৃত্বে প্রজা-বিদ্রোহের ফলে পালবংশ আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। দিব্বোকের নেতৃত্বে উত্তর-বঙ্গ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়।

এইভাবে দেবপালের মৃত্যুর পর আরও প্রায় তিনশো বছর বঙ্গদেশ ও মগধে রাজত্ব করার পর পাল শাসনের অবসান ঘটে ও **সেন বংশের** রাজত্বের সূচনা হয়। সেন বংশের রাজাদের মধ্যে বিজয় সেন (১০৯৫-১১৫৮ খ্রীঃ), বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯ খ্রীঃ) ও লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৫ খ্রীঃ) সুপরিচিত।

সেন বংশ

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ

প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে মগধ, কনৌজ এবং গৌড় সাম্রাজ্যের উত্থান ও আধিপত্যের কাহিনী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাস অজানা থাকলে ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। বিশেষ করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি রাজ্যের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কনৌজের অধিকার নিয়ে উত্তরাপথের রাজনীতিতে যে আবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল তাতে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দাক্ষিণাত্যের অমূল্য অবদান আছে। সুতরাং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন।

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের গুরুত্ব

দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম রাজ্যগুলির মধ্যে পাণ্ড্য, চোল, চের, সাতবাহন, পল্লব প্রভৃতি রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যগুলির মধ্যে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ হত। অন্ধ্রের সাতবাহন বংশ ও কলিঙ্গের চেতবংশের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের পর দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির মধ্যে বর্তমান বেরার ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের **বাকাটক বংশের** রাজ্য খ্যাতিলাভ করে।

প্রাচীনতম দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যসমূহ

গুপ্তোত্তর যুগের দক্ষিণ ভারতীয় রাজশক্তিগুলির মধ্যে বর্তমান বিজাপুর জেলার অন্তর্গত **বাতাপি** বা **বাদামীর চালুক্য বংশ** ছিল শক্তিশালী। চালুক্যবংশীয় রাজা **দ্বিতীয় পুলকেশী** (৬০৯-৬৪২ খ্রীঃ) হর্ষবর্ধনকে

বাতাপির চালুক্য বংশ

পরাজিত করে তাঁর অগ্রগতি রোধ করেন। পুলকেশীর রাজত্বকালে চালুক্য বংশ দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজ্যকে পরাভূত করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশী শেষ জীবনে কাঞ্চীর পল্লব বংশের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

কাঞ্চীর পল্লব বংশ

পল্লব বংশ তৃতীয় শতকেই একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠন করেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে পল্লবরা আরও পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্য স্থাপনকে কেন্দ্র করে চালুক্য ও পল্লব রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চলে। এই বিরোধের ফলে দুটি রাজ্যই ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে **রাষ্ট্রকূট বংশ** দাক্ষিণাত্যে নিজেদের অধিকার বিস্তার করে।

রাষ্ট্রকূট বংশ

রাষ্ট্রকূট রাজ্যের (মহারাষ্ট্র অঞ্চল) প্রতিষ্ঠা করেন **দান্তিদুর্গ**। পরবর্তী রাজাদের মধ্যে **ধ্রুব, তৃতীয় গোবিন্দ, তৃতীয় ইন্দ্র** ও **তৃতীয় কৃষ্ণ** রাষ্ট্রকূট রাজ্য ও ক্ষমতা বিস্তার করেন এবং কনৌজে অধিকার বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দেন। দশম শতকের শেষের দিকে রাষ্ট্রকূট বংশের ক্ষমতা লোপ পায়। দক্ষিণ ভারতের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল তাঞ্জোরের **চোল রাজ্য**।

চোল রাজ্য

অতি প্রাচীন এই রাজ্যের পুনরুত্থান হয় নবম শতকে। চোল রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **রাজরাজ** ও **রাজেন্দ্র চোলদেব**। চোলদের পতনের পর **পাণ্ড্য বংশের** প্রাধান্য আবার স্থাপিত হয়।

অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য

অন্যান্য যে সব রাজবংশ এই যুগে ও পরবর্তী কালে খ্যাতিলাভ করেছিল তাদের মধ্যে কল্যাণীর **চালুক্য বংশ**, মহারাষ্ট্রের **যাদব বংশ**, মহীশূরের **হোয়সল বংশ** ও অন্ধ্রদেশের **কাকতীয় বংশের** নাম উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে এই রাজ্যগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

সপ্তম অধ্যায়

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রম-বিবর্তন

আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আলোচনার সুবিধার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে দুভাগে ভাগ করা যায়।

উত্তর ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন

প্রাচীন সিন্ধু, দ্রাবিড় ও আর্য সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের গৌরবময় যুগ। **বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়কে মহাকাব্যের যুগ বলা হয়।** মহাভারত ও রামায়ণ বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই দুই মহাকাব্যে সেই যুগের রাজনীতি, ধর্ম ও সমাজের মূল আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতিফলন হয়েছিল। রাজধর্ম, সামাজিক ন্যায় ও আদর্শ, শিক্ষা-দীক্ষা, গুরুজনের সম্মান, শৌর্য-বীর্যের গৌরব, বর্ণাশ্রমের পবিত্রতা, সত্যবাদিতা, দান, মহানুভবতা প্রভৃতি গুণ ও আদর্শকে হিন্দু জীবন ও চিন্তার মূল ভিত্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে পার্থক্যের কথা স্মরণ করেও বলা হয় যে এই দুই মহাকাব্য ভারতীয় জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে হলে মহাভারত ও রামায়ণ পাঠ অপরিহার্য।

মহাকাব্যের যুগের জীবনযাত্রার আদর্শ

মহাকাব্যের যুগের কালনির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু মৌর্য যুগ থেকে ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিবর্তন অনুসরণ ও বিশ্লেষণ করতে অসুবিধা হয় না। মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ **'ইণ্ডিকা'** থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা এবং সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের বর্ণনার সব কিছু নির্ভুল নয়। তবু তাঁর রচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে মগধ সাম্রাজ্য বিশেষ শক্তিশালী ছিল। রাজধানী পাটলিপুত্র নগরী ও রাজপ্রাসাদ ছিল সুবিন্যস্ত, সুসজ্জিত ও অপূর্ব সুন্দর। নগরের শাসনব্যবস্থা ছিল সুপরিকল্পিত ও সুষ্ঠু। মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের সরলতা, সাধুতা ও

মৌর্য যুগ সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের বিবরণ

সত্যবাদিতার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতীয়েরা মামলা-মকদ্দমা, বিরোধ পছন্দ করে না। চুরি বা অন্য অপরাধ খুব কম হয়। ভারতীয়েরা মিতাহারী ও মিতাচারী। বেশভূষার আড়ম্বর ও অলঙ্কার তাদের প্রিয়। ভারতীয়েরা বৃত্তি অনুসারে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা—দার্শনিক, কৃষক, শিকারী ও পশুপালক, শিল্পী ও বণিক, সৈনিক, পরিদর্শক এবং অমাত্য। কৃষকের সংখ্যা ছিল বেশী এবং যুদ্ধের সময় পর্যন্ত তারা নির্বিঘ্নে চাষ করতো, কেন না সকলেই জানতো কৃষকরা জনহিতকর কাজে ব্যস্ত থাকে। মেগাস্থিনিস বলেছেন, শস্যশ্যামল উর্বর ভারতে কখনও দুর্ভিক্ষ হয় না। প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং জলসেচের সুব্যবস্থা আছে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। ভারতে দুর্ভিক্ষ হয় না, মেগাস্থিনিসের এই ধারণা ঠিক না হলেও তাঁর বর্ণনা থেকে মৌর্য যুগের কৃষিকর্মের উন্নতি ও আর্থিক সঙ্গতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মৌর্য যুগে রাজা বিশেষ ক্ষমতাশালী হলেও প্রজাকল্যাণ ও লোকহিতকর কর্ম ছিল তাঁর আদর্শ ও লক্ষ্য। প্রজাকল্যাণের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য অশোক বহু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। প্রজারা যাতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে ও তাদের অভাব-অভিযোগ যাতে রাজা জানতে পারেন তার জন্য তিনি অনেক রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন।

ভারতীয়দের চরিত্র

বৃত্তি

রাজাদর্শ ও সুশাসন ব্যবস্থা

মৌর্য যুগে শিল্পকলার উন্নতি হয়েছিল। প্রস্তরশিল্পের প্রচলন এই সময় সুরু হয়। পাটলিপুত্র শহর ও রাজপ্রাসাদের পরিকল্পনা ও নির্মাণকৌশল মেগাস্থিনিসকে অভিভূত করেছিল। বহু শতাব্দী পরে গুপ্ত যুগে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনও পাটলিপুত্র শহর দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। অশোক ও পরবর্তী মৌর্য রাজাদের নির্মিত গুহা, স্তূপ ও চৈত্যগুলির উৎকর্ষ মৌর্য শিল্পের উন্নতির সাক্ষ্য দেয়। অশোকের ধর্মচক্র, সিংহস্তম্ভ ইত্যাদির মসৃণতা ও সজীবতা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। মৌর্যোত্তর যুগে ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের উন্নতি অব্যাহত থাকে। বেসনগরের গরুড়-স্তম্ভ, ভারুতের স্তূপ, সাঞ্চী তোরণ এবং বুদ্ধের জীবনী সংক্রান্ত প্রতিমূর্তিগুলির সূক্ষ্ম কাজ শিল্পচর্চার উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে।

শিল্পের উন্নতি

কুষাণ যুগে ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিশেষ উন্নতি ও পরিবর্তন হয়। বিদেশী হলেও কুষাণরা কালক্রমে ভারতীয় ধর্ম ও

চিন্তাধারা গ্রহণ করে এদেশের মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কণিষ্কের রাজত্বকালে বহু মনীষীর সমাবেশের কথা এবং বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে হীনযান ও মহাযান এই দুই মতবাদের জন্মের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির অপূর্ব বিকাশ হয়েছিল এই যুগে। চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গ্রন্থ, পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য', জ্যোতিষশাস্ত্র-গ্রন্থ, 'গর্গ-সংহিতা', ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ এই সময় রচিত হয়েছিল। গান্ধার শিল্পের উৎকর্ষের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে (পৃষ্ঠা ৪১)।

কুষাণ যুগের সংস্কৃতি

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হল গুপ্ত যুগ। রাষ্ট্রশাসন, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে এই যুগে অভূত-পূর্ব উন্নতি ও উৎকর্ষ দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি প্রায় পনের বছর ভারতবর্ষে ছিলেন। রাজধানী পাটলিপুত্রের সমৃদ্ধি এবং নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখে ফা-হিয়েন মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি গুপ্ত-শাসনপদ্ধতির বিশেষ প্রশংসা করেছেন। রাজকর্মচারীরা যথাযথভাবে তাঁদের কর্তব্য পালন করতেন। দেশে চুরি-ডাকাতির উপদ্রব ছিল না। লোকে নির্ভয়ে ও শান্তিতে জীবন যাপন করতো। গুপ্ত রাজারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অনেক কমে গিয়েছিল। শিব, কার্তিক, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, পার্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। যাগযজ্ঞের পরিবর্তে পূজায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। খাজনার হার ও জিনিসপত্রের দামও ছিল কম। তাম্রলিপ্ত (তমলুক) সে যুগের একটি বিখ্যাত বন্দর ও শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সামাজিক জীবনে চণ্ডালেরা অস্পৃশ্য ছিল। তারা শহরের বাইরে থাকতো। চণ্ডাল ও নিম্নজাতির লোকেরা ছাড়া অন্যেরা জীবহত্যা করতো না।

গুপ্ত যুগের জীবনযাত্রা

রাজতন্ত্র ও রাজাদর্শের লক্ষ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। রাজা বিশেষ শক্তিশালী ও দেবতার মত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনিই ছিলেন রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মের ধারক ও বাহক। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। শাস্ত্রীয় নির্দেশ, দেশাচার ও সামাজিক রীতিনীতির দ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রিত হতেন। জনকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা ছিল রাষ্ট্রের কর্তব্য।

রাষ্ট্রীয় আদর্শ

রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অমাত্য বা মন্ত্রী, রাজপুরুষবর্গ ও সামন্তদের অনেক ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছিল। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক জীবনেও তাঁদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল। বহু বৈদেশিক জাতির আগমনের ফলে সমাজের চরিত্র ও শ্রেণীবিন্যাসের পরিবর্তন হয়। জীবিকানির্ভর উপবর্ণের সৃষ্টি হয়। জাতিভেদপ্রথা ও সামাজিক বিধিনিষেধ কঠোর হয়। সামাজিক ভিত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী রক্ষণশীল হয়ে পড়ে। নারীর সম্মান ও অধিকার কমে যায়। তখন পণপ্রথা ও বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। উচ্চ শ্রেণীজাত মেয়েরা বিদ্যার্জনের সুযোগ পেলেও অন্যান্য মেয়েরা এই সুযোগে বঞ্চিত ছিল।

সামাজিক অবস্থা

গুপ্ত যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল। এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। দেশ-বিদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তাম্রলিপ্ত ছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর ছিল ভৃগুকচ্ছ (ব্রোচ)। ভারতীয়েরা সেই সময় জাহাজে করে সমুদ্র-পারে অনেক জায়গায় যেত।

ব্যবসা-বাণিজ্য

শিল্প-বাণিজ্যের এত উন্নতি ও প্রসারের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতি ছিল। এই কারণে গুপ্তবংশের পক্ষে শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করা সহজ হয়েছিল। সামুদ্রিক ও স্থলপথের বাণিজ্যের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এর ফলে কেবলমাত্র যে আর্থিক সমৃদ্ধি হয়েছিল তা নয়, ভারতীয়দের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের সমাজ, ধর্ম ও চিন্তাধারার বিকাশ দেশের রাজশক্তির ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। কুষাণ যুগের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মূলে ছিল কণিষ্কের বিরাট অবদান। তেমনি গুপ্ত যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের প্রধান কারণ ছিল সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মত গুপ্ত সম্রাটদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি উৎসাহ ও অনুরাগ। অন্য দিকে সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। **গুপ্ত যুগের সুশাসন-ব্যবস্থা ও আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা সৃজনশীল কর্ম ও চিন্তাধারার পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছিল।** এই সব বিভিন্ন কারণের সমাবেশের ফলেই গুপ্ত যুগে ভারতীয় জীবন ও মননের সর্বক্ষেত্রে অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দিয়েছিল।

সাংস্কৃতিক উন্নতির অনুকূল পরিবেশ

গুপ্ত যুগকে সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যায়। মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। কালিদাসের 'মেঘদূত,' 'বিক্রমোর্বশী,' 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্,' 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্,' 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'ঋতুসংহার' প্রভৃতি মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য শুধু ভারতীয় সাহিত্যের নয়, বিশ্বের যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যের সম্পদ। গুপ্ত যুগের অন্যান্য সাহিত্যকীর্তির মধ্যে শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' ও 'দেবী চন্দ্রগুপ্ত', বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র', কবি ভট্টির 'ভট্টিকাব্য' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ধর্ম ও স্মৃতিশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ এই যুগে রচিত হয়েছিল। পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের সর্বশেষ সঙ্কলন ও সম্পাদন গুপ্ত যুগেই সম্পূর্ণ হয়েছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের ইতিহাসেও গুপ্ত যুগ এক গৌরবময় অধ্যায়। বিশ্ববিখ্যাত অজন্তার গুহা ও গুহাচিত্রাবলীর (হায়দ্রাবাদ রাজ্যে) অনেকগুলি গুপ্ত রাজাদের আমলে নির্মিত ও অঙ্কিত হয়েছিল। বেশীর ভাগ চিত্রই বোধিসত্ত্ব ও গৌতম বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে অঙ্কিত। ছবিগুলির লাবণ্য, বর্ণসজ্জা ও সজীবতা দর্শকদের অভিভূত করে। দেওগড়ের (ঝাঁসি) মন্দির ও বুদ্ধমূর্তি, ভিতরগাঁও (কানপুর জেলা) এবং সারনাথের কয়েকটি মন্দির গুপ্ত যুগের স্থাপত্য ও কীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ ও মথুরায় বুদ্ধের ব্রোঞ্জ মূর্তি ঐ যুগের ধাতুশিল্পের উৎকর্ষের প্রমাণ।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা

গুপ্ত যুগে ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, রসায়ন প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। এই সব বিষয়ে গর্গ, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ধন্বন্তরীর মত পণ্ডিতদের গ্রন্থ এই সময়েই রচিত হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা

গুপ্ত সম্রাটদের প্রায় আড়াইশো বছরব্যাপী রাজত্বকালে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মনীষার যেরূপ বিকাশ হয়েছিল প্রাচীন ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। প্রাচীন গ্রীসে পেরিক্লিসের সময় এবং প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে সম্রাট অগস্টাসের শাসনকালে অনুরূপ সার্বিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। এই কারণে ঐতিহাসিকেরা গ্রীস ও রোমের ঐ গৌরবময় যুগের সঙ্গে গুপ্ত শাসনের স্বর্ণযুগের তুলনা করে থাকেন।

গ্রীস ও রোমের শ্রেষ্ঠ যুগের সঙ্গে তুলনা

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী যুগে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিদ্যাচর্চার

প্রসার বন্ধ হয়ে যায়নি। হর্ষের রাজত্ব সুশাসিত ছিল বটে, কিন্তু মৌর্য ও গুপ্ত যুগের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে মনে হয় তখন রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলার কিছুটা অবনতি হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ নিজেই দুবার ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। দণ্ডবিধিও তখন ছিল খুব কঠোর। নতুন রাজধানী কনৌজ তখন জনবহুল ও সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয়েছিল। অন্যান্য বড় শহরের মধ্যে প্রয়াগ, নালন্দা, মথুরা, বারাণসী, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। দেশের জনসাধারণের নৈতিক মান উন্নত ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের সুদিন আর ছিল না। বৌদ্ধ যুগের কয়েকটি শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয়েরা তাদের পরধর্ম-সহিষ্ণুতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। ধর্মীয় উৎপীড়ন সমাজে ছিল না। দেশের রাজা প্রজারঞ্জনের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে রাজ্য শাসন করতেন ও দানধ্যান প্রভৃতি জনহিতকর কাজে ব্রতী হতেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগে অনুষ্ঠিত দান-মেলায় হর্ষবর্ধনের সর্বস্ব বিতরণের কাহিনী সত্যই চিত্তস্পর্শী।

হর্ষবর্ধনের রাজ্যের অবস্থা

ধর্মজীবন

হর্ষবর্ধন নিজে সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। 'নাগানন্দ', 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'রত্নাবলী'—এই তিনটি সংস্কৃত নাটক তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর সভাকবি বাণভট্ট লিখেছিলেন 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষ-চরিত'। হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে আছে যে রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদের পুরস্কৃত করার জন্য ব্যয় করা হত।

হর্ষের সাহিত্যানুরাগ

বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান ছিল ভারতবর্ষ। যে সব বিদ্যায়তন হর্ষ ও অন্যান্য ভারতীয় রাজাদের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল, তাদের মধ্যে প্রধান ছিল **নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়**। নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। মধ্য এশিয়া, চীন, কোরিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দূরদেশ থেকে ছাত্র আসতো নালন্দায় অধ্যয়ন করতে। পড়াশোনা ও থাকা-খাওয়ার জন্য কোন খরচ লাগত না। ছজন রাজা ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা সব ব্যয় বহন করতেন। কিন্তু ভর্তি হবার জন্য অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্রদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হত। হিউয়েন সাঙ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দুবছর বৌদ্ধ শাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন। ছাত্রেরা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষালাভ ও শিক্ষকেরা নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে শিক্ষাদান করতেন। হর্ষবর্ধনের সময় নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন মহাজ্ঞানী **শীলভদ্র**।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষকেরা প্রত্যেকেই ছিলেন মহাপণ্ডিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি গ্রন্থাগার ছিল। বৌদ্ধ মহাবিহার হলেও এই বিদ্যায়তনের পাঠ্যসূচী ছিল ব্যাপক
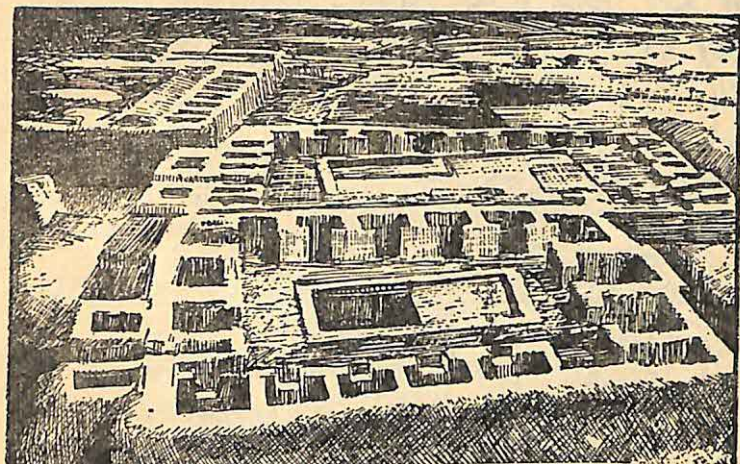
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

ও বহুবিধ। ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সারা বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়

হর্ষবর্ধন ও সমসাময়িক যুগের অন্য রাজারা তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল আরও হাজার বছরেরও আগে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা প্রাচ্য জগতে। দেশ-দেশান্তরের বহু ছাত্র আসতো এখানে বিদ্যালাভ করতে। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ছাড়া চিকিৎসাবিদ্যা, রাজনীতি, দর্শন, সাহিত্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও এখানে ছিল।

পরবর্তী যুগের শিক্ষাকেন্দ্র-সমূহ

প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ মান ও ঐতিহ্য পরবর্তী কালেও ক্ষুণ্ণ হয়নি। গৌড়ের পালবংশীয় রাজারা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেক সাহায্য দান করেছিলেন। তাছাড়া তাঁদের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিহারের **উদন্তপুরী** ও **বিক্রমশিলা** এবং উত্তর বঙ্গে **সোমপুরী মহাবিহার**

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মহাবিহারগুলি ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র-রূপে খ্যাতি লাভ করেছিল। বিক্রমশিলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন **দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ।** এই বৌদ্ধ মহাজ্ঞানীর খ্যাতি দেশে-বিদেশে প্রসারিত ছিল। তিব্বতের মহারাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন। ঐ দেশেই তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ

হর্ষোত্তর যুগ থেকে মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির মূল ধারাগুলির মৌলিক কোন পরিবর্তন হয়নি।

হর্ষোত্তর যুগে ধর্মজীবন ও চিন্তা

এই যুগে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মমতের প্রাধান্য দেখা দেয়। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের পূর্ব গৌরব ও প্রতিপত্তি হ্রাস পেলেও কোন ধর্মীয় বিদ্বেষ বা বিরোধ দেখা দেয়নি। পরধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ ছিল। **বিভিন্ন ধর্মমত ও বিশ্বাসের পারস্পরিক প্রভাবের ফলে এক বিশ্বজনীনতাবোধের উন্মেষ হতে থাকে।**

সাহিত্যকীর্তি

এই যুগে মাঘ, রাজশেখর, বামন, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত, ভবভূতি প্রভৃতি কবি, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক ভারতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। কহ্লণ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রচনা ঐতিহাসিক উপাদানের জন্য বিশেষ মূল্যবান। হর্ষবর্ধনের মত পরমাররাজ ভোজ (আঃ ১০১৩-১০৫৫ খ্রীঃ) ও সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন (১১৫৮-১৭১৯ খ্রীঃ) তাঁদের সাহিত্যকীর্তির জন্য প্রসিদ্ধ। সেন যুগের কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বাংলা কাব্যের এক অমূল্য সম্পদ। ধোয়ী, কবি শরণ, উমাপতিধর, গোবর্ধনাচার্য, হলায়ুধ প্রভৃতি মনীষী ও সাহিত্যিক সেন যুগে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। এই সময় নির্মিত উড়িষ্যার মন্দিরগুলির

মধ্যে কোনারকের সূর্যমন্দির এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। উত্তর ভারতের রাজপুত রাজ্যগুলির রাজারাও শিল্পানুরাগী ছিলেন। জেজাকভুক্তির চন্দেল্ল রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত খাজুরাহোর মন্দির ও ভাস্কর্যকলা ভারতীয় শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উদ্দন্তপুরী, সোমপুর ও বিক্রমশিলার ধ্বংসাবশেষ পাল যুগের শিল্পকলার

শিল্প ও সাহিত্য
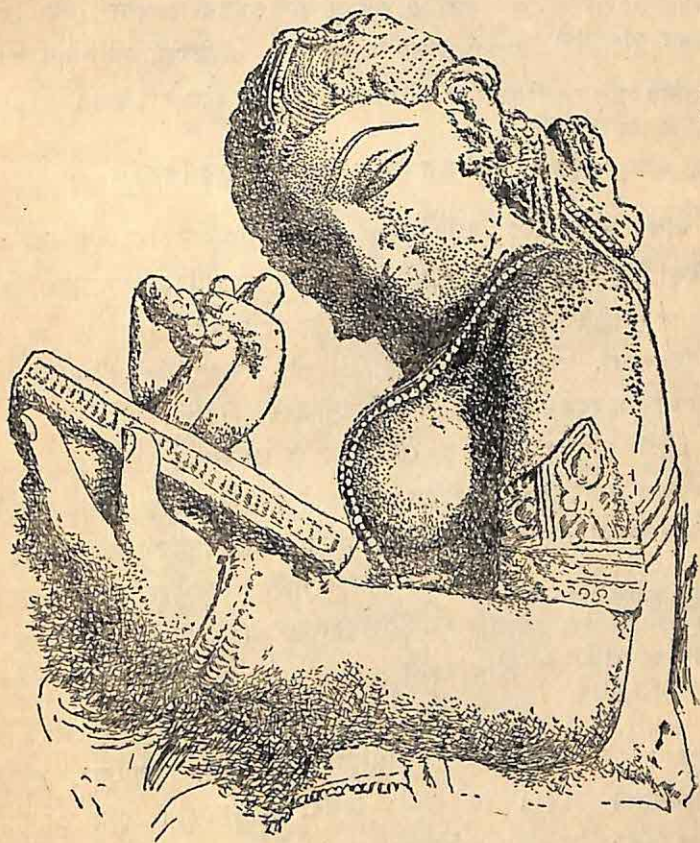
স্থাপত্যকলা (খাজুরাহো)

উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। এই যুগেই ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল পাথর ও ধাতুর মূর্তি গঠনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

দ্বাদশ শতকে বাংলাদেশে এক উল্লেখযোগ্য নতুন সামাজিক প্রথা প্রবর্তন করেন সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন। এই প্রথা অনুসারে আচার-ব্যবহার,

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে কয়েকটি বংশকে 'কুলীন' অ্যাখ্যা দিয়ে বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া হয়। বর্তমান বাঙালী হিন্দু সমাজেও এই প্রথার কিছুটা প্রচলন আছে। হিন্দু সমাজের ক্রমবর্ধমান রক্ষণশীলতা ও সঙ্কীর্ণতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য কয়েক শতাব্দীতে সমাজে নারীর মর্যাদা আরও হ্রাস পায়। নিম্নজাতির অধিকার সঙ্কুচিত হয়ে অস্পৃশ্যতা ও অন্যান্য কুসংস্কারের প্রাধান্য দেখা দেয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে হিন্দুসমাজ গতিহীন ও স্থিতিশীল হয়ে পড়েছিল।

বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন

মুসলমান যুগের প্রাক্কালে হিন্দু সমাজের গতিহীনতা

দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন

দক্ষিণ ভারত এক সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ও বিবর্তনে দ্রাবিড় সভ্যতার গুরুত্ব ও অবদান সুপরিচিত। আর্য-প্রাধান্য বিস্তারের ফলে আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার যে মিশ্রণ হয় তার থেকেই দক্ষিণ ভারতীয় সমাজ গড়ে ওঠে। দীর্ঘকাল ধরে মন্থর গতিতে দক্ষিণ ভারতে আর্য অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

প্রাচীন যুগের পাণ্ড্য, চের, চোল প্রভৃতি তামিল রাজ্যগুলিতে রাজতন্ত্র থাকলেও জনসাধারণ, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ, বৈদ্য ও মন্ত্রীদের **'পঞ্চমহাসভা'** রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করায় তিনি স্বেচ্ছাচারী হতে পারতেন না। গ্রামবাসীরাই গ্রামের শাসন পরিচালনা করতেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম। গ্রাম-শাসনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চোল রাজ্যের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। পঞ্চমহাসভার গঠনপ্রণালী থেকেই সমাজের শ্রেণীবিভাগ অনুমান করা যায়। সমাজে দাসপ্রথা ছিল না। লোকেরা শান্তিতে জীবনযাপন করতো। বেতনভোগী সৈন্যরা যুদ্ধ করতো। কৃষি ও বাণিজ্য উন্নত ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে তামিল দেশগুলির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে অনেক জিনিস রপ্তানী হত। ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য ছিল। প্রাচীন তামিল রাজ্যগুলির—বিশেষ করে চোল রাজ্যের—শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল। গ্রীস, রোম, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে সমুদ্রপথে যোগাযোগ ছিল। দক্ষিণী রাজ্যগুলির অধিবাসীরা প্রথমে অসুর-দানব পূজা করতো। পরে জৈন ও বৌদ্ধ

প্রাচীন তামিল রাজ্যগুলির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন

ধর্ম প্রসার লাভ করে। কয়েক শতাব্দী ধরে মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে জৈন ধর্মের প্রাধান্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের শ্রেণীবৈষম্য প্রথমে খুব প্রবল ছিল না। কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি সুকুমার কলার মান খুব উন্নত ছিল। নানাপ্রকার লৌকিক প্রথা, হস্তরেখা-বিচার ইত্যাদি বহুলপ্রচলিত ছিল।

তামিল সাহিত্য যেমনি প্রাচীন তেমনি সমৃদ্ধ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই সাহিত্য প্রায় দু'হাজার বছরের পুরানো। কিংবদন্তী অনুসারে মাদুরা শহরে তিনটি বৃহৎ সাহিত্যসভা বা **সঙ্গম** অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্যের **'অষ্টসঙ্কলন'** তৃতীয় সঙ্গমের কবিরা রচনা করেছিলেন। অনেকে এই কিংবদন্তীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে প্রাচীন যুগে তামিল ভূখণ্ডের চারণ কবিরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াতেন। দেশের রাজা থেকে সুরু করে সাধারণ গ্রামবাসীরা পর্যন্ত তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিছুকাল অন্তর এই সব কবি ও গায়কেরা মাদুরা শহরে মিলিত হয়ে এক মহোৎসবে নিজেদের কবিতা পাঠ করতেন। এইভাবেই প্রাচীন তামিল সাহিত্য সঙ্কলিত হয়। দাক্ষিণাত্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক মূল্যবান উপাদান তামিল সাহিত্য। প্রখ্যাত তামিল কবি **তিরুভল্লুভার**-রচিত **'কুরল'** সম্ভবতঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে রচিত হয়েছিল। **'তোল্‌কাপ্পিয়ম্' 'পত্তুপাট্টু'** প্রভৃতি বিখ্যাত তামিল গ্রন্থও 'সঙ্গম' যুগে রচিত বলে মনে করা হয়।

প্রাচীন তামিল সাহিত্য

গুপ্ত যুগের পরবর্তী কালে উত্তর ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছুটা অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দেয়। পক্ষান্তরে দক্ষিণ ভারতীয় সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সুস্পষ্ট হয়। আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার সমন্বয়জাত দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি সমগ্র ভারতীয় সভ্যতাকে প্রভাবিত ও পুষ্ট করেছিল। আলোচ্য যুগে ভারতের সার্বিক অগ্রগতির মূল কারণ ছিল শক্তিশালী ও সুশাসিত রাজ্যের উত্থান। চালুক্য, পল্লব, রাষ্ট্রকূট, চোল প্রভৃতি বংশের উত্থান দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে গৌরবময় যুগের সূচনা করে। দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা যায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে। শিল্পোন্নতির পুরোভাগে ছিলেন পল্লব রাজবংশ। পল্লব শিল্পীরা কুষাণ যুগের মথুরা ও অমরাবতীর শিল্পরীতির পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে এক নতুন শিল্পরীতি সৃষ্টি করেন। পল্লব শিল্পের

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রয়েছে **কাঞ্চী ও মহাবলীপুরমে**। মহবলীপুরমের যুধিষ্ঠির-রথ, ভীমরথ ইত্যাদি সপ্তরথ বা মন্দির, মুক্তেশ্বর ও কৈলাস মন্দির, কাঞ্চীর ত্রিপুরান্তকেশ্বর ও ঐরাবতেশ্বর মন্দির ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এক একটি বড় পাথর কেটে এক একটি কারুকার্য-শোভিত মন্দির সৃষ্টি করা হয়েছিল। গঙ্গাবতরণ, গিরি-গোবর্ধন ধারণ, অর্জুন-তপস্যা প্রভৃতি প্রস্তরচিত্র পল্লব শিল্পের আর এক উজ্জ্বল নিদর্শন। চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট বংশের রাজারাও শিল্প ও সংস্কৃতির অনুরাগী ও

পল্লব শিল্প
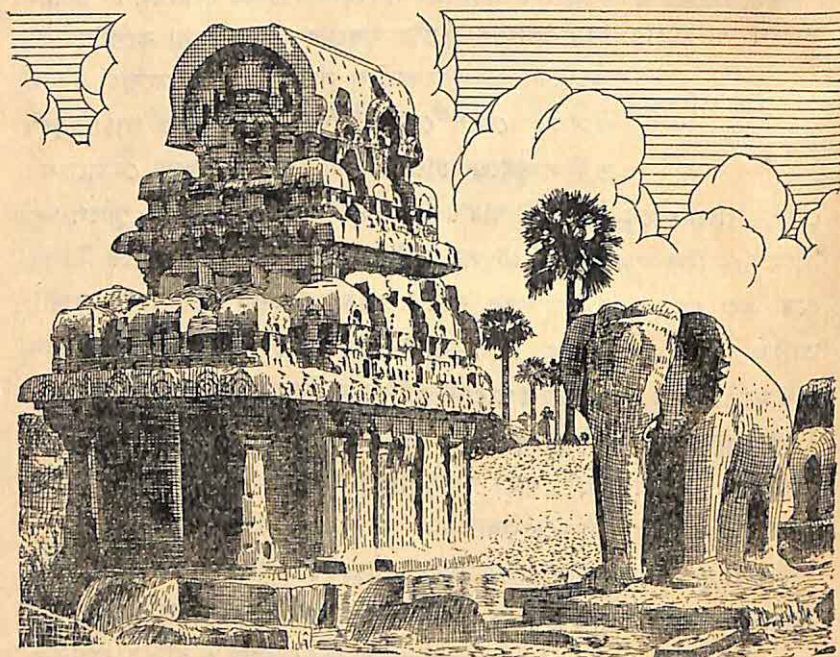
মহাবলীপুরমের রথ

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চালুক্যদের সময় বাতাপির বিখ্যাত গুহামন্দিরগুলি এবং আইহোলের দুর্গামন্দির নির্মিত হয়েছিল। অজন্তার কয়েকটি গুহাচিত্রও এই সময় অঙ্কিত হয়েছিল। রাষ্ট্রকূটদের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি আওরঙ্গাবাদের কাছে ইলোরার **কৈলাসনাথের মন্দির**। বিশাল পাহাড় কেটে তৈরী করা এই মন্দিরের ভাস্কর্য জগদ্বিখ্যাত। ইলোরার বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু এই তিন ধর্মেরই শিল্পনিদর্শন ঐ যুগের ধর্মীয় উদারতা ও সহাবস্থানের প্রমাণ।

চালুক্য শিল্প

রাষ্ট্রকূট শিল্প

অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে নির্মিত বোম্বাই-এর কাছে এলিফেণ্টা দ্বীপের শিব-মূর্তি ও গুহামন্দিরের সৌন্দর্য ও নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য।

দাক্ষিণাত্যের শিল্পরীতির চরম উৎকর্ষের আর এক প্রকাশ চোল শিল্প। চোল মন্দিরগুলির মধ্যে তাঞ্জোরের **রাজরাজেশ্বরের শিবমন্দির** প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের চূড়ায় চোদ্দটি স্তর আছে ও শীর্ষে একটি বিরাট গোলাকার পাথর বসানো আছে। চোল-শিল্পীরা ধাতুমূর্তি নির্মাণেও কুশল ছিলেন। তাঞ্জোরের মন্দিরে **ব্রোঞ্জের নটরাজ মূর্তি** ধাতুশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাজেন্দ্র চোলদেবের সময় নির্মিত **গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরমের** (ত্রিচিনাপল্লী) মন্দির এবং জলসেচব্যবস্থা শিল্প ও পূর্তবিদ্যার অগ্রগতির পরিচয় বহন করছে।

চোল শিল্প

পরবর্তী কালে হোয়সল বংশ ও পাণ্ড্য বংশের রাজারাও শিল্পের পৃষ্ঠ-পোষকতা করেছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালে মহীশূর, মাদুরা ও অন্যান্য স্থানে দর্শনীয় মন্দির ও গোপুরম্ নির্মিত হয়েছিল।

ভারতীয় ধর্মজীবন, চিন্তা ও সাধনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতের প্রচুর অবদান আছে। গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদের জন্ম হয়। কালক্রমে এই মতবাদ ভারতের হিন্দু জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনার প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়। সপ্তম শতাব্দী থেকে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে ভক্তিবাদের প্রভাব বিস্তৃত হতে সুরু হয়। কথিত আছে যে শৈব সাধক **'নায়নার'**দের দ্বারা সপ্তম শতকে শৈব ধর্মে ভক্তিবাদের প্রচার হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন শৈব সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। ভক্তিবাদী বৈষ্ণব সাধকরা **'আলবার'** নামে পরিচিত। এরকম বারো জন 'আলবার' জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব সাধকদের মধ্যে **আচার্য রামানুজ** ও তাঁর অনুগামী **নিম্বার্ক** ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক ছিলেন।

ভক্তিবাদের জন্ম ও প্রসার

সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে সারা ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মের এক নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল। এই জাগরণ দক্ষিণ ভারতে সুরু হয়ে উত্তর দিকে বিস্তৃত হয়েছিল। যুক্তি ও জ্ঞানের আলোকে বৈদিক ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা প্রচার করে যিনি ধর্মজীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর নাম **শঙ্করাচার্য** (আঃ ৭৮৮-৮২০ খ্রীঃ)। তরুণ তামিল শৈব ব্রাহ্মণ এই যুগপুরুষ ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে 'ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা'

হিন্দুধর্মের জাগরণ ও শঙ্করাচার্য

এই **অদ্বৈতবাদ** প্রচার করেছিলেন। শঙ্করের ভাষ্য হিন্দুদর্শনের প্রামাণিক সংজ্ঞারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।
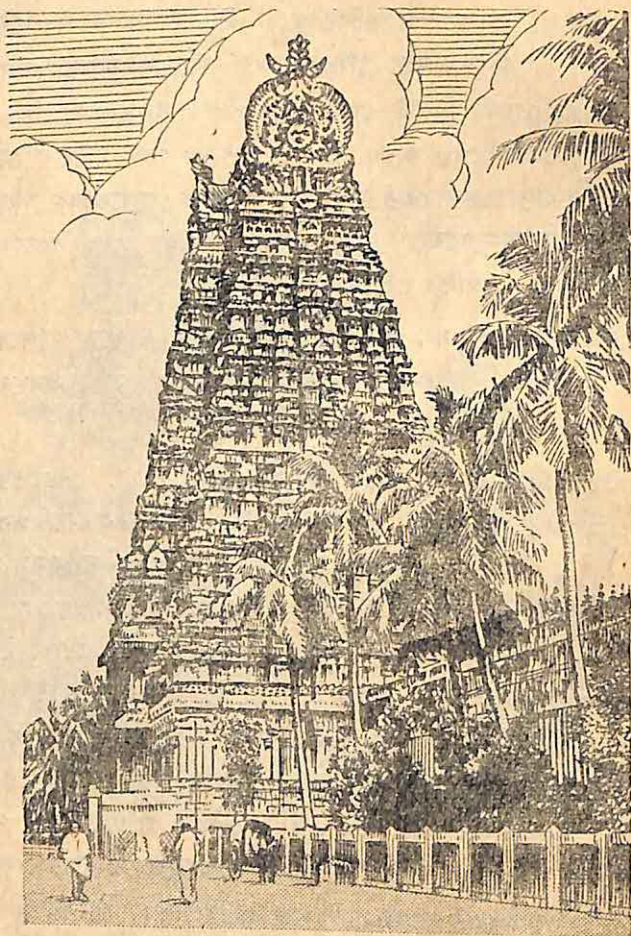
দক্ষিণ ভারতের একটি মন্দির

সমাজজীবন

আর্য সভ্যতার প্রভাবের ফলে দাক্ষিণাত্যে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। বৃত্তি বা জীবিকার সঙ্গে জাতির সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। জাতিভেদ প্রথা কালক্রমে কঠোর হয়ে পড়ে। অস্পৃশ্যতা ও অন্যান্য কুসংস্কারও সমাজজীবনে প্রবেশ করে। দক্ষিণ ভারতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রাধান্যের ফলে সমাজে নারীর

স্থান ছিল উচ্চে। সাতবাহন, বাকাটক প্রভৃতি রাজবংশের ইতিহাসে নারীদের রাজনীতি ও রাজ্যশাসনে অংশগ্রহণের উল্লেখ আছে। ধর্মচর্চায় নারীরা অংশ গ্রহণ করতে পারতেন। সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। বৈধব্য-জীবনের নিয়ম ও শাসন ছিল কঠোর।

বিদ্যাচর্চা

দক্ষিণ ভারতে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছিল। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছে ছাত্রেরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতো। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলি শাস্ত্রশিক্ষা ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা পরিচালনা করতো। মহাবিদ্যালয়গুলি **ব্রহ্মপুরী** ও **ঘট্টিকা** নামে পরিচিত ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় রাজারা ও সাধারণ লোক শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কাঞ্চী, বেলগাম, দেবগিরি প্রভৃতি স্থানের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির খ্যাতি ছিল।

সাহিত্যচর্চা

তামিল, তেলেগু, কানাড়ী ও মালয়ালম্ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যের বিকাশ হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু মূল্যবান গ্রন্থও দক্ষিণ ভারতে লিখিত হয়েছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে 'ভাগবত' দক্ষিণ ভারতে রচিত হয়েছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও এই দুই মহাকাব্যের গল্পের ভিত্তিতে লেখা নানান গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। **বিহ্লণ, ভারবি, মহেন্দ্র বর্মণ, দণ্ডিন, কুলশেখর, হাল** ও **গুণাঢ্য** প্রভৃতি লেখকদের নাম উল্লেখযোগ্য। শৈব ও বৈষ্ণব সাধকদের রচিত কাব্য, তামিল ভাষায় রচিত জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ ও কাব্যগুলি দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল।

শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, বহির্জগতের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, স্থানীয় শাসনব্যবস্থা এবং সর্বোপরি শিল্প ও ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতের দান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অষ্টম অধ্যায়

বহির্বিশ্বে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার

বিশ্বজগতে ভারতীয় সংস্কৃতির অবদানের ঐতিহ্য

অতি প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্জগতের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি একদিন দূর দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমগ্র এশিয়া তথা বিশ্বের ইতিহাসে ভারতীয় শিক্ষা, দর্শন, ধর্ম ও শিল্পের অসামান্য প্রভাব ও অবদানের কথা স্মরণ করে কবি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ভারতবর্ষকে 'এশিয়ার তীর্থক্ষেত্র' রূপে বন্দনা করে লিখেছেন ঃ

"দিয়াছ মানবে, জগজ্জননি,
দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প,
কর্মভক্তি, ধর্মশিক্ষা ।"

ভারত ও পশ্চিম এশিয়া ঃ সিন্ধু সভ্যতার যুগ থেকেই ভারতের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। আলেকজাণ্ডারের অভিযান, সেলুকাসের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের যুদ্ধ, শান্তি এবং দূত প্রেরণের কাহিনী সুপরিচিত। অশোক পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। বহ্লীক অঞ্চলের গ্রীকরা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। তারাই ভারতীয় ভেষজ-বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রের দশমিক পদ্ধতি পাশ্চাত্য দেশে নিয়ে গিয়েছিল।

ভারত ও মধ্য এশিয়া ঃ প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অরেলস্টাইন মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চলে ভারতীয় নগর ও কর্মকেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। আবিষ্কৃত নিদর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠের ভগ্নাবশেষ, বুদ্ধমূর্তি, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, ভারতীয় ভাষায় ও অক্ষরে লেখা পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি আছে। নিদর্শনগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল **গোমতী বিহার**। এখানে বহু ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য আসত। মধ্য এশিয়ার খাসগড়, ইয়ারকন্দ, খোটান ও চীনা তুর্কীস্তানের নানান অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এইসব অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ এইসব জায়গায় ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার, বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মের, প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন।

ভারত ও সিংহল ঃ সিংহল দ্বীপের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। অশোক তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য সিংহলে পাঠিয়েছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সিংহলরাজ মেঘবর্ণ বুদ্ধগয়ায় একটি সঙ্ঘারাম তৈরীর জন্য গুপ্ত সম্রাটের অনুমতি পেয়েছিলেন। এই সময়েই বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্ত মগধের দন্তপুর থেকে সিংহলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সিংহলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

ছিল। সিংহলের **অনুরাধাপুর** প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

ভারত ও তিব্বত, চীন এবং দূর প্রাচ্য

সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা স্রোং-সান তাঁর রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন করেন। তাঁরই সময়ে তিব্বতে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় অক্ষরমালার প্রচলন সুরু হয়। তিব্বতী শিক্ষার্থীরা নালন্দা ও বিক্রমশিলায় অধ্যয়ন করতে আসতেন। তিব্বতী পণ্ডিতেরা বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁদের ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এর ফলে কোন কোন লুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী ভাষা থেকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গৌড়ের পালরাজাদের সঙ্গে তিব্বতের সৌহার্দ্য ছিল। তিব্বত-রাজের অনুরোধে একাদশ শতাব্দীতে অতীশ দীপঙ্কর বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন। তিব্বতের অধিবাসীরা আজও তাঁকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে।

তিব্বত

বৌদ্ধ ধর্ম চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় দু'হাজার বছরের পুরানো সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সূচনা করেছিল। একটি চীনা লোক-কাহিনী অনুসারে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় অব্দে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের শুভ প্রবর্তন হয়েছিল। আর একটি কিংবদন্তী আছে যে প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মাচার্য **ধর্মরত্ন** ও **কাশ্যপমাতঙ্গ** চীন সম্রাটের আমন্ত্রণে চীনদেশে গিয়েছিলেন। পঞ্চম শতাব্দী থেকে চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্মের দ্রুত বিস্তার হতে থাকে। বহু চৈনিক পণ্ডিত, ধর্মোৎসাহী ও শিক্ষার্থী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের নাম সুবিখ্যাত। বহু ভারতীয় পণ্ডিত এবং ধর্মপ্রচারকও চীনদেশে গিয়েছিলেন। তাঁদের সহায়তায় অনেক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। **জ্ঞানভদ্র, যশোগুপ্ত** প্রভৃতি পণ্ডিত বাংলাদেশ থেকে চীনে গিয়েছিলেন। ভারতীয় চিকিৎসা-বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ও সঙ্গীতকলা চীনে সমাদৃত হয়েছিল। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল।

চীন

চৈনিক শিল্প, চিত্রাঙ্কন ও মূর্তিগঠনের ওপর ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ শিল্পরীতি চীনে প্রসার লাভ করেছিল। চীনে অনেক বৌদ্ধ গুহামন্দির আছে। তার মধ্যে তুন্‌-হোয়াঙের পাহাড়ের গায়ে **'সহস্র বুদ্ধগুহা'** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীনদেশীয় প্রাচীর-চিত্রে ভারতীয় চিত্রশিল্পের ছাপ সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

চীনদেশে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান ও ব্রহ্মদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। দক্ষিণ ভারত থেকে মহাপণ্ডিত **বোধিসেন** জাপানে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃত ভাষা প্রচার করেছিলেন। তিনি জাপানের বৌদ্ধ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন।

জাপান

ব্রহ্মদেশের উপকূলে ও অভ্যন্তরে অতি প্রাচীন যুগে হিন্দু উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। মোন্ বা 'তেলৈং'রা ব্রহ্মদেশের নিম্ন অঞ্চলে বাস করে। এরা অনেকে হিন্দুভাবাপন্ন। মোনদের ধর্ম ও বর্ণমালার উৎপত্তি হয়েছে ভারতীয় ধর্ম ও বর্ণমালা থেকে। এই এলাকার উত্তরে পিউ জাতি একটি রাজ্য স্থাপন করেছিল। এর রাজধানী ছিল **শ্রীক্ষেত্র** (বর্তমান প্রোমের কাছে হমওয়াজা শহর)। পিউরা হিন্দু ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আরাকান অঞ্চলে কয়েকটি ভারতীয় রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে যে সম্রাট অশোক চীন ও ব্রহ্মদেশে ধর্ম-প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। এর সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় থাকলেও মৌর্যোত্তর যুগে যে ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নবম শতকে প্রতিষ্ঠিত মধ্যব্রহ্মের 'পাগান' রাজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পাগানের রাজধানী ছিল **অরিমর্দনপুর**। পাগান রাজাদের সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ব্রহ্মদেশ থেকে লুপ্ত হয় এবং 'থেরবাদ' বৌদ্ধ ধর্মমত ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। পাগান রাজ্যের একটি মন্দির দেখে অনুমান করা যায় যে ভারতীয় শিল্পীরা এটি নির্মাণ করেছিলেন। ব্রহ্মদেশের সাহিত্য, শিল্প, আইন ও বিচারপদ্ধতিতে ভারতীয় আদর্শ ও রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

ব্রহ্মদেশ

এক সময় শ্যামদেশে (থাইল্যাণ্ড) কয়েকটি হিন্দু উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালে থাই জাতি শ্যামদেশ জয় করার পর ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। **সুখোদয়, অযোধ্যা** প্রভৃতি থাইরাজ্যের নামেই ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। শ্যামের শাস্ত্রগ্রন্থ পালি ভাষায় লেখা। মন্দিরগুলিতেও হিন্দু রীতি ও আঙ্গিকের প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

শ্যামদেশ

ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

জাতক ও কথাসরিৎসাগরের বহু গল্পে ভারতীয় সওদাগরদের সুদূর সাগরপারের সুবর্ণভূমি যাত্রার উল্লেখ আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়

উপদ্বীপ, কাম্বোডিয়া, আন্নাম প্রভৃতি রাজ্য ও সুমাত্রা, জাভা, বলি, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের সম্মিলিত অঞ্চলটির নাম ছিল **সুবর্ণভূমি**। সুমাত্রা দ্বীপের আর এক নাম ছিল সুবর্ণদ্বীপ। এই দেশগুলি ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও কৃষ্টি এমনভাবে গ্রহণ করেছিলেন যে সুবর্ণভূমি অঞ্চলটি **'বৃহত্তর ভারত'** নামে পরিচিতি লাভ করে। এই বৃহত্তর ভারতের গোড়াপত্তন হয়েছিল প্রায় দু'হাজার বছর আগে। গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষ এশিয়ার মুখ্য বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করেছিল। পরবর্তী কালেও দীর্ঘদিন ভারতের এই প্রভাব ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল।

সুবর্ণভূমি
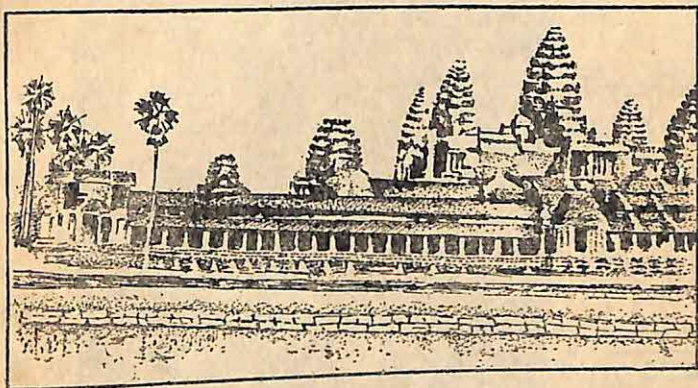
আঙ্কোরভাটের মন্দির

খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে কম্বুজে (বর্তমান কাম্বোডিয়া) একটি হিন্দু রাজ্য গড়ে উঠেছিল। কৌণ্ডিন্য নামে এক ব্রাহ্মণ **কম্বুজ** রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই রাজ্যের হিন্দু রাজারা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে রাজ্যের সীমানা বিস্তার করেছিলেন। চীনা ভাষায় এই রাজ্যের নাম ছিল ফু-নান। কম্বুজের শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে ছিলেন ইন্দ্রবর্মণ, সপ্তম জয়বর্মণ, যশোবর্মণ, দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ ইত্যাদি। কম্বুজের রাজধানীর নাম ছিল **যশোধরপুর**। এই নগরীর পরে নামকরণ হয় **আঙ্কোরথোম**। এই শহরের বিন্যাস, আড়ম্বরপূর্ণ বিশালতা ও সৌন্দর্য ছিল অপূর্ব। আঙ্কোরথোমের **আঙ্কোরভাট** বিষ্ণুমন্দিরটির স্থাপত্যশিল্প জগদ্বিখ্যাত। দ্বাদশ শতাব্দীতে কম্বুজের বৈষ্ণব রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরের পাথরের গায়ে রামায়ণ,

কম্বুজ রাজ্য

আঙ্কোরভাট বিষ্ণুমন্দির

মহাভারত ও পুরাণের নানান কাহিনীর চিত্র খোদাই করা আছে। আঙ্কোরথোমের মন্দির-শিল্পের আর এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন **বায়নের শিবমন্দির।** বৌদ্ধ ধর্ম মাঝে মাঝে কম্বুজরাজদের আনুকূল্য লাভ করলেও বৈষ্ণব ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল। এই রাজ্যের শিলালিপিগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। দেশের রাজাদের ও সাধারণ লোকের পৃষ্ঠপোষকতায় কম্বুজে অনেক **'আশ্রম'** নির্মিত হয়েছিল। এই আশ্রমগুলি ছিল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি।

ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
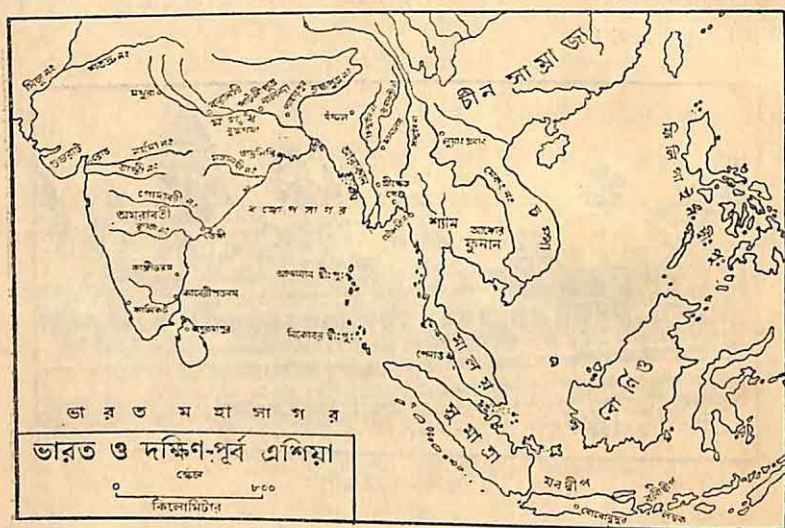
চম্পা রাজ্য

কম্বুজের পূর্ব দিকে **চম্পা** (আধুনিক ভিয়েৎনামের আন্নাম অঞ্চল) নামে আর একটি হিন্দু রাজ্য ছিল। কথিত আছে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে **শ্রীমার** নামে এক ভারতীয় হিন্দু এই রাজ্যটি স্থাপন করেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে এই রাজ্যটির অস্তিত্ব ছিল। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে চম্পারাজ্য পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। এই যুগের শক্তিশালী রাজাদের মধ্যে জয়পরমেশ্বরদেব ঈশ্বরমূর্তি, রুদ্রবর্মণ, হরিবর্মণ, জয়সিংহবর্মণ প্রভৃতির শৌর্যবীর্যের খ্যাতি ছিল। চম্পাতে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন চম্পায় বিস্তার লাভ করেছিল। চম্পার সামাজিক ব্যবস্থা হিন্দু সমাজ-রীতির দ্বারা প্রভাবিত
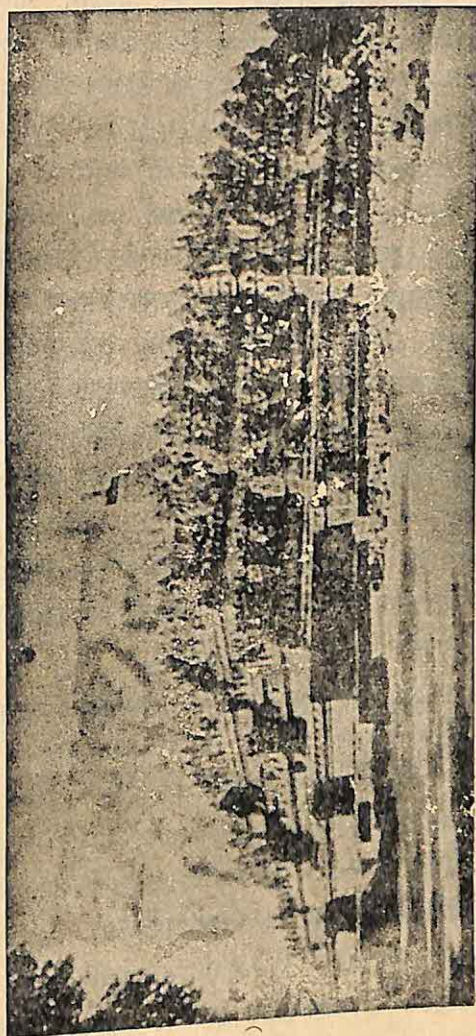
বরবুদুরের বৌদ্ধ স্তূপ
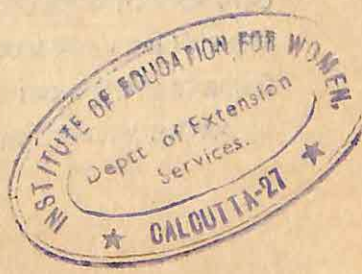
ছিল। সরকারী ভাষা ছিল সংস্কৃত। চম্পার ইটের তৈরী মন্দিরগুলির শিল্পরীতিতে পল্লব ও চালুক্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চম্পার এক প্রখ্যাত ধর্মকেন্দ্র ছিল **ভদ্রেশ্বর স্বামী শিবমন্দির**।

অষ্টম শতকে মালয় উপদ্বীপে এবং সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, বোর্নিও প্রভৃতি সমগ্র পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন **শৈলেন্দ্র বংশ**। আরব বণিকদের বিবরণী থেকে জানা যায় যে এই বংশের রাজারা যেমন শক্তিশালী তেমনি বিত্তশালী ছিলেন। তাঁদের বৃহৎ নৌবাহিনী ছিল ও দক্ষিণ ভারতের চোল রাজাদের সঙ্গে শৈলেন্দ্র রাজাদের দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চলেছিল। শৈলেন্দ্র রাজারা মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্র দেব নালন্দাতে একটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন। **কুমার ঘোষ** নামে এক বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্মগুরু ছিলেন। তাঁরই নির্দেশে তারাদেবীর একটি মন্দির ঐ রাজ্যে নির্মিত হয়েছিল। শৈলেন্দ্রবংশের স্থাপত্যকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন **বরবুদুরের বৌদ্ধ স্তূপ**। যবদ্বীপের একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এই মন্দিরটির পরিকল্পনা ও নির্মাণ-কৌশলের বৈচিত্র্য, অভিনবত্ব ও সৌন্দর্য দর্শকদের অভিভূত করে। মন্দিরের অসংখ্য বৌদ্ধ মূর্তি ও জাতকের গল্পের চিত্ররূপগুলিও অপূর্ব সুন্দর। বরবুদুরের মন্দিরকে অনেকে বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য

চতুর্থ শতকে যবদ্বীপে একটি হিন্দুরাজ্য গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছুকাল পর এই রাজ্যটি শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা জয় করে নিয়েছিলেন। একাদশ শতক পর্যন্ত শৈলেন্দ্র বংশ সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন। তারপর এই বংশের পতন সুরু হয় এবং সেই সুযোগে **শ্রীবিজয়** নামে এক ব্যক্তি যবদ্বীপে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল **তিক্তবিল্ব** বা **মাজাপহিত**। পঞ্চদশ শতকে এই রাজ্যের পতন হয় ও যবদ্বীপে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মাজাপহিতের শেষ হিন্দু রাজা ও রাজ্যের কিছু লোক বলিদ্বীপে আশ্রয় নেয়। সেখানে প্রায় হাজার বছরের পুরানো একটি হিন্দু রাজ্য ছিল। এই দ্বীপে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলনও ছিল। বলিদ্বীপে এখনও হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য আছে।

যবদ্বীপের হিন্দুরাজ্য

যবদ্বীপের হিন্দুরাজ্য

যবদ্বীপে ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ছিল। শত শত

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও বহু সংস্কৃত গ্রন্থের পুঁথি এখানে রয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারত বিশেষ জনপ্রিয় ছিল এবং আজও এই দুই মহাকাব্যের গল্প নিয়ে যবদ্বীপে নাটক, ছায়ানাট্য ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

যবদ্বীপে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব

প্রায় দেড় হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প ও রাষ্ট্রব্যবস্থা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জাতিসমূহের জীবন ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শ ও প্রভাবের ফলে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অনেক অনুন্নত জাতি উচ্চতর সভ্যতার মানে পৌঁছতে পেরেছিল। যতদিন ভারতবর্ষের হিন্দু রাজ্যগুলি শক্তিশালী ছিল ততদিন বহির্ভারতের হিন্দু রাজ্যগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন প্রাণবন্ত ছিল। ভারতে হিন্দুযুগের অবসান বৃহত্তর ভারতেও হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাধান্য লোপের সূচনা করেছিল। শুধুমাত্র দক্ষিণ-এশিয়ায় নয়, দূর প্রাচ্য এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি একদিন যেরূপ প্রসার লাভ করেছিল তা প্রাচীন ভারতের গৌরব ও মহত্ত্বের পরিচয় বহন করে।

উপসংহার

নবম অধ্যায়

ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন

ভারতে মুসলমান বিজয়ের সূচনা

হজরত মহম্মদের শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা আরব জাতির মধ্যে নতুন আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় ভাব সৃষ্টি করেছিল। তাঁর মৃত্যুর (৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ) একশো বছরের মধ্যে আরবরা পরাক্রান্ত সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম থেকেই আরবরা পশ্চিম ভারতে বিক্ষিপ্ত উপদ্রব করলেও ভারতে আরব বা মুসলমান বিজয়ের প্রকৃত সূচনা করেন ইরাকের শাসনকর্তার সেনাপতি **মহম্মদ-বিন কাশিম**। তিনি ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের রাজা দাহিরকে পরাজিত করেন। অবশ্য সিন্ধুদেশে আরব শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ভারতে মুসলমান বিজয়ের পরের অধ্যায়ের নায়ক আফগানিস্তানের

মহম্মদ-বিন কাশিম

গজনী রাজ্যের অধিপতি **সবুক্তগীন**। দশম শতাব্দীর শেষ দিকে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের শাহীবংশীয় রাজা জয়পালকে পরাজিত করে তিনি ভারতবর্ষে তুর্কী সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ দেখিয়েছিলেন।

সবুক্তগীন

সবুক্তগীনের পুত্র **সুলতান মামুদ** (৯৯৮-১০৩০ খ্রীঃ) ভারতের হিন্দু রাজাদের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন ও পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ এই দুটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে সতের বার ভারত অভিযান করেন। কিন্তু এদেশের কোন অংশ তিনি গজনীরাজ্যভুক্ত করেননি। প্রথমে জয়পাল ও পরে তাঁর পুত্র আনন্দপাল তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। আনন্দপালের পরাজয়ের পর শাহীবংশের বিলোপ ঘটে, কিন্তু তাঁদের শৌর্য ও বীর্যের কাহিনী ইতিহাসে উজ্জ্বল স্থান লাভ করে। সুলতান মামুদ থানেশ্বর, কনৌজ, মথুরা প্রভৃতি নগর লুণ্ঠন করেন ও তাঁর আক্রমণের ফলে বহু নর-নারী নিহত হয়। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতের কাথিয়াবাড়ের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির তিনি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন। ভারতের ইতিহাসে নির্মম, লোভী লুণ্ঠনকারীরূপেই সুলতান মামুদ পরিচিত হয়েছেন।

সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গজনী ও হিরাটের মাঝখানে অবস্থিত **ঘোর** নামে একটি ছোট পার্বত্য দেশের তুর্কী শাসকরা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত গজনী রাজ্য ঘোর রাজ্যভুক্ত হয়। এই ঘোর রাজ্যের এক শাসক **মহম্মদ ঘোরী** কিছুকাল পরে উত্তর ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু ভারতে রাজ্য জয় করা তাঁর পক্ষে খুব সহজসাধ্য হয়নি। গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় ভীমের কাছে তাঁকে পরাজিত হতে হয়েছিল। তারপর ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তাঁকে দিল্লী ও আজমীরের চৌহানবংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজের কাছেও হার স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু পরের বছর কনৌজের গাহড়বাল-বংশীয় রাজা জয়চ্চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে বিরোধের সুযোগ নিয়ে মহম্মদ ঘোরী তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। ভাগ্যের পরিহাসে দু'বছর পরে জয়চ্চন্দ্র নিজেও ঘোরীর কাছে পরাজিত ও নিহত হন। এইভাবে **রাজপুত রাজ্যগুলির অন্তর্বিরোধ ও রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব ভারতে তুর্কীবিজয় ও রাজ্যস্থাপনের পথ সহজ করে দিয়েছিল।**

মহম্মদ ঘোরী

মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি **কুতবউদ্দীন আইবক** কয়েক বছরের মধ্যেই চৌলুক্য, চন্দেল্ল প্রভৃতি অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলি জয় করে তুর্কী সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেন। দিল্লী, কনৌজ, গোয়ালিয়র, রণথম্ভোর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি মুসলমান শাসনাধীন হয়। মহম্মদ ঘোরীর আর এক অনুচর **ইক্তিয়ারউদ্দীন বক্তিয়ার খলজী** পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথমে বিহারের পালবংশের দুর্বল রাজাদের ও পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে বিতাড়িত করে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে 'ঘোর' শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘোরী সাম্রাজ্যের বিস্তার

তুর্ক-আফগান বা সুলতানী সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন

দাসবংশের শাসনঃ মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর (১২০৬) তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। দিল্লীকে কেন্দ্র করে ভারতে মুসলমান-বিজিত প্রদেশগুলির 'সুলতান' রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন কুতবউদ্দীন। তিনি ছিলেন মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস। তাঁর পরবর্তী দুই সুলতান ইলতুৎমিস এবং গিয়াসউদ্দীনও ক্রীতদাস ছিলেন। সেইজন্য কুতবউদ্দীন-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ভারতের ইতিহাসে **দাসবংশ** (Slave Dynasty) নামে পরিচিত হয়।

কুতবউদ্দীন আইবক কর্তৃক দাসবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা

কুতবউদ্দীন আইবক (১২০৬-১২১০) মাত্র চার বছর রাজত্ব করেছিলেন। বিহারের শাসনকর্তা ইলতুৎমিসের সঙ্গে তিনি তাঁর কন্যার বিবাহ দেন। কুতবউদ্দীন তাঁর উদারতা ও দানশীলতার জন্য খ্যাত ছিলেন। দিল্লী ও আজমীরের দুই মসজিদ এবং বিখ্যাত মুসলিম সাধক খাজা কুতবউদ্দীনের নামে নির্মিত দিল্লীর বিখ্যাত কুতব মিনারের নির্মাণকার্য তাঁর সময়েই সুরু হয়েছিল।

কুতবউদ্দীন (১২০৬-১২১০)

কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পর আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে রাজ্য-সঙ্কট দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত দিল্লীর ওমরাহদের আহ্বানে কুতবউদ্দীনের জামাতা ইলতুৎমিস সিংহাসনে বসেন। **ইলতুৎমিস** (১২১১-১২৩৬) বুদ্ধি ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ ও অরাজকতা দূর করতে সক্ষম হন। গজনীর অধিপতি তাজউদ্দীনের আক্রমণ ব্যর্থ করে তিনি তাঁকে পরাজিত করেন। তাঁর রাজত্বকালে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বা মুঘল জাতির নেতা **চিঙ্গীজ খাঁ**

ইলতুৎমিস (১২১১-১২৩৬)

মধ্য ও আধুনিক যুগ

১ গজনী
২ ঘোর
৩ তরাইন
৪ দিল্লী
৫ আজমীর
৬ চিতোর
৭ রণথম্ভোর
৮ দেবগিরি
৯ ফতেপুর সিক্রি
১০ সাসারাম
১১ কালঞ্জর
১২ পানিপথ
১৩ হলদিঘাট
১৪ বিজাপুর
১৫ গোলকুণ্ডা
১৬ নবদ্বীপ
১৭ সুরাট
১৮ রায়গড়
১৯ জিঞ্জি
২০ পুনা
২১ সাতারা
২২ অমৃতসর
২৩ কাশ্মীর
২৪ কালিকট
২৫ গোয়া
২৬ দমন
২৭ দিউ
২৮ বেসিন
২৯ মাদ্রাজ
৩০ হুগলী
৩১ চুচুঁড়া
৩২ মসুলিপত্তন
৩৩ চন্দননগর
৩৪ কাসিমবাজার
৩৫ পলাশী
৩৬ বক্সার
৩৭ অযোধ্যা
৩৮ রোহিলখণ্ড
৩৯ মহীশূর
৪০ হায়দ্রাবাদ
৪১ লাহোর
৪২ আলিগড়
৪৩ কানপুর
৪৪ মিরাট
৪৫ মুর্শিদাবাদ
৪৬ ঝান্সি
৪৭ লক্ষ্মৌ
৪৮ শ্রীরামপুর
৪৯ কলিকাতা
৫০ শ্রীরঙ্গপত্তনম্

ভারত
(মধ্য ও আধুনিক যুগ)
আ র ব
সা গ র
ব ঙ্গো প সা গ র

তাঁর বাহিনী নিয়ে সিন্ধুনদের তীরে উপস্থিত হন ও পাঞ্জাব লুঠ করেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে ফিরে যান। ইলতুৎমিস সিন্ধু, রণথম্ভোর, গোয়ালিয়র, মালব ও বাংলাদেশে মুসলমান শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান জগতের প্রধান বোগদাদের খলিফা তাঁকে আশীর্বাদ ও স্বীকৃতি জানালে ইলতুৎমিসের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়। ইলতুৎমিসের বুদ্ধি ও বাহুবলে সুলতানী সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তিনি কুতব মিনারের নির্মাণকার্য শেষ করেছিলেন। তাঁর আমল থেকেই সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় ও হরফে মুদ্রাঙ্কন সুরু হয়। ইলতুৎমিস দিল্লীর রাজদরবারকে মুসলমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সভ্যতাকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইলতুৎমিস তাঁর অযোগ্য পুত্রদের পরিবর্তে গুণবতী কন্যা রজিয়াকে নিজের উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, মনোবল ও যোগ্যতা সত্ত্বেও **রজিয়া** (১২৩৬-১২৪০) শান্তিতে রাজ্য শাসন করতে পারেননি। একজন মুসলমান রমণীর দরবারে উপস্থিতি, সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বদান ও রাজ্যশাসন এক শ্রেণীর ওমরাহদের পক্ষে অসহনীয় ছিল। এরই পরিণতিরূপে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অন্যতম বিদ্রোহী নেতা আলতুনিয়াকে বিবাহ করেও রজিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন। তিনি ও তাঁর স্বামী দুজনেই শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। এই একবারই মাত্র দিল্লীর সিংহাসনে কোন নারী বসেছিলেন।

সুলতানা রজিয়া (১২৩৬-১২৫০)

রজিয়ার মৃত্যুর পর রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয়। মুইজউদ্দীন বহরাম (১২৪০-১২৪২) ও আলাউদ্দীন মাসুদের (১২৪২-১২৪৬) অযোগ্য শাসনের পর ইলতুৎমিসের এক পুত্র **নাসিরউদ্দীন মামুদ** সুলতান হন। তাঁর শাসনকালে (১২৪৬-১২৬৬) সীমান্ত অঞ্চলে বারবার মোঙ্গল আক্রমণ ও রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিতে থাকে। ধর্মানুরাগী, শান্তিপ্রিয় নাসিরউদ্দীনের রাজ্যশাসনের কোন যোগ্যতা ছিল না।

নাসিরউদ্দীন (১২৪৬-১২৬৬)

অপুত্রক নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর শ্বশুর ও প্রধানমন্ত্রী উলুঘ খাঁ **গিয়াসউদ্দীন বলবন** (১২৬৬-১২৮৭) নাম নিয়ে দিল্লীর সুলতান হন। ওমরাহদের ক্ষমতা হ্রাস করে রাজশক্তির নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ

গিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)

করেন ও কঠোরভাবে ওমরাহদের ষড়যন্ত্র বন্ধ করেন। অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে প্রায়ই মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হত। বলবনের কঠোর নীতির ফলে রাজশক্তি সুদৃঢ় হয়েছিল।

ওমরাহদের ক্ষমতা হ্রাসের ব্যবস্থা

বলবন দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর মেওয়াটি ও কচ্ছী দস্যুদের এবং দোয়াব ও রোহিলা খণ্ডের বিদ্রোহী হিন্দুদের দমন করেছিলেন। রাজ্যে চোর-ডাকাতের উপদ্রবও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সৈন্যবাহিনীর সংস্কার করে তিনি তাঁর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করে বলবন দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে অকারণ রাজ্যজয়ের জন্য শক্তির অপচয় করার থেকেও সাম্রাজ্যের স্থিতি ও নিরাপত্তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া ঢের বেশী প্রয়োজন। কিন্তু এত ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও মোঙ্গল আক্রমণ সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি।

সামরিক সংস্কার ও রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

বলবনের রাজত্বকালের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাংলার শাসনকর্তা **তুঘ্রিল খাঁর** বিদ্রোহ (১২৭৯)। বলবন নিজে সসৈন্যে বাংলায় গিয়ে তুঘ্রিলকে পরাজিত ও নিহত করেন। বিদ্রোহীদের নির্মম শাস্তি দিয়ে তিনি বিদ্রোহের পরিণাম সম্বন্ধে সকলের মনে ভীতি সঞ্চার করেছিলেন।

বঙ্গদেশে তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ দমন

বলবন ছিলেন দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর শাসন অত্যন্ত কঠোর ও কোন কোন ক্ষেত্রে নৃশংস মনে হলেও সমসাময়িক যুগ ও পরিস্থিতির বিচারে বলবনের নীতি ও কার্যাবলীর যৌক্তিকতা ছিল। অন্য কোন সহজ উপায়ে ওমরাহদের ক্ষমতা খর্ব করে রাজশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না। সামরিক সংস্কার, সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা এবং রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মধ্যে তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে তিনি অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছিলেন। বলবন সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন। কবি আমীর খসরু ও ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দীন সিরাজ তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন।

বলবনের কৃতিত্ব

বলবনের মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য পৌত্র **কায়কোবাদ** তিন বছর (১২৮৭-১২৯০) রাজত্ব করেন। রাজ্যে আবার অরাজকতা, ষড়যন্ত্র ও ওমরাহদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এই সুযোগে কায়কোবাদের সেনাপতি জালালউদ্দীন

দাস বংশের পতন

খলজী কায়কোবাদ ও তাঁর শিশুপুত্রকে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এইভাবে দাসবংশের শাসনের অবসান হয়।

খলজী বংশের শাসন : জালালউদ্দীন খলজী (১২৯০-১২৯৬) খলজী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। খলজীরা তুর্কীজাতীয় ছিল। কিন্তু তারা দীর্ঘকাল আফগানিস্তানে বাস করেছিল বলে দিল্লীর তুর্কীরা তাদের খাঁটি তুর্কী বলে মানতো না। আফগান বা পাঠান বলে মনে করতো। জালালউদ্দীনের রাজত্বকালে মোঙ্গলরা আবার ভারত আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়। বিজিত মোঙ্গলদের জালালউদ্দীন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দিল্লীর কাছে বসবাস করার অনুমতি দেন। তারা 'নব মুসলমান' নামে পরিচিত হয়। জালালউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীন মালব ও ভিলসা আক্রমণ করে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। দাক্ষিণাত্য অভিযান করেও তিনি বিপুল সম্পদ লাভ করেন। এরপর কোমলপ্রাণ স্নেহান্ধ জালালউদ্দীনকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।

জালাউদ্দীন খলজী (১২৯০-১২৯৬)

আলাউদ্দীন খলজী (১২৯৬-১৩১৬) নির্মমভাবে শত্রুহত্যা ও অকাতরে অর্থব্যয় করে নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের মত দিগ্বিজয়ী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন। কিন্তু তিনি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ায় ভারতবর্ষের মধ্যেই তাঁর রাজ্যজয় ও সাম্রাজ্য-বিস্তার সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সৈন্যবাহিনী গুজরাটের রাজা কর্ণকে পরাজিত করে ঐ অঞ্চলে সমৃদ্ধ বন্দরগুলি লুট করে। খলজী-বাহিনীর হাতে বন্দীদের মধ্যে ছিলেন রাণী কমলাদেবী ও **মালিক কাফুর**। কমলাদেবী পরে আলাউদ্দীনের মহিষী এবং কাফুর সুলতানের প্রিয় সেনাপতি হয়েছিলেন। উত্তর ভারতে আলাউদ্দীনের অন্যান্য সাফল্যের মধ্যে ছিল রাজপুতানার রণথম্ভোর দুর্গ জয় (১৩০১) এবং চিতোর আক্রমণ ও অধিকার (১৩০৩)। টডের রাজস্থান সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনী অনুসারে চিতোরের রাণা ভীম সিংহের পত্নী **পদ্মিনী**র অসামান্য রূপে আকৃষ্ট হয়েই আলাউদ্দীন চিতোর জয় করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু চিতোর অধিকার করলেও পদ্মিনী ও অন্যান্য রাজপুত নারীরা জহরব্রত করে আত্মাহুতি দেওয়ায় আলাউদ্দীনের মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি। এই জনপ্রিয় কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি

আলাউদ্দীন খলজী (১২৯৬-১৩১৬)

উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার

ভারতবর্ষ
সুলতানী আমল
স্কেল
৬০০
কিলোমিটার
পামীর
হিন্দুকুশ পর্বত
কাবুল
পেশোয়ার
গজনী
কান্দাহার
কা শ্মী র
লাহোর
বিপাশা নং
শতদ্রু নং
সিন্ধু নদ
সুলেমান পং
তরাইন
দিল্লী
চান্দোয়ার
কনৌজ
অ যো ধ্যা
নে পা ল
শ্রে ণী
ত্রিহুত
গৌড়
আজমীর
আরাবল্লী পং
গোয়ালিয়র
রণথম্ভোর
চিতোর
কালিঞ্জর
জৌনপুর
বারাণসী
গঙ্গা নং
বি হা র
দামোদর নং
নদীয়া
সাতগাঁও
কচ্ছ
মা ল ব
উজ্জয়িনী
প র্ব ত
বি ন্ধ্য
নর্মদা নং
সাতপুরা পং
গ ণ্ডো য়া না
মহানদী নং
তাপ্তী নং
দেবগিরি
যা দ ব
গোদাবরী নং
কা ক তী য়
রায়চুর
কৃষ্ণা নং
পেনার নং
হ য়্‌ স ল
দারসমুদ্র
কাঞ্চি
চো ল
তাঞ্জোর
মাদুরা
সিংহল
মুসলমান বিজিত রাজ্য
স্বাধীন রাজ্য
মালিক কাফুরের অভিযান পথ

আছে কিনা সে বিষয়ে আধুনিক গবেষকরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। এরপর ক্রমে ক্রমে মালবের মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, ধার, চন্দেরী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি খলজী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

উত্তর ভারত জয় প্রায় সমাপ্ত হলে আলাউদ্দীন দক্ষিণ ভারত জয়ে উদ্যোগী হন। দাক্ষিণাত্য অভিযানের নায়ক ছিলেন মালিক কাফুর।

দক্ষিণ ভারত অভিযান

মোট চারবার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করে এবং সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে মালিক কাফুরের নেতৃত্বে খলজী-বাহিনী দেবগিরির **যাদব রাজ্য**, বরঙ্গলের **কাকতীয় রাজ্য**, দ্বারসমুদ্রের (মহীশূর অঞ্চল) **হোয়সল রাজ্য** এবং মাদুরার **পাণ্ড্য রাজ্য** জয় করে। আলাউদ্দীন খলজীর উত্তর ও দক্ষিণ ভারত জয়ের ফলে বহু শতাব্দীর পর ভারতবর্ষে আবার রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্য দিকে দাক্ষিণাত্যে খলজী সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের ফলে বহু রাজ্য, নগর ও মন্দির লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আলাউদ্দীন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। একবার 'নব মুসলমান'দের ষড়যন্ত্রে ক্রুদ্ধ হয়ে আলাউদ্দীন একদিনে তিরিশ হাজার লোককে হত্যা করেছিলেন।

রাজ্যশাসন

বারবার আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও গোলযোগে বিব্রত আলাউদ্দীন স্থায়ী প্রতিকারের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজে রাজকার্যে প্রখর নজর রাখতেন ও গুপ্তচরদের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করতেন। মদ্যপান এবং ওমরাহদের মধ্যে সামাজিক ও বৈবাহিক সম্বন্ধ তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন। জনসাধারণের হাতে যাতে বেশী অর্থ না থাকে তার জন্য তিনি করের বোঝা বৃদ্ধি করেন। প্রজাদের আর্থিক সচ্ছলতা দূর করার জন্য তিনি যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তার ফলে হিন্দুদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল।

খাদ্যদ্রব্য ও জিনিস-পত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

আলাউদ্দীনের বিশাল সামরিক বাহিনীর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হত। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্রের দাম যাতে কম থাকে তার জন্য তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব

রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন সুলতান নিজে এবং তিনি যা ভাল মনে করতেন তাই করতেন। অন্য কারোর প্রভাব বা পরামর্শ তিনি পছন্দ করতেন

না। এর ফলে তাঁর রাজত্বকালে মুসলমান ধর্মযাজক বা উলেমাদের ক্ষমতা অনেকখানি কমে গিয়েছিল।

সাহিত্য ও শিল্পানুরাগ

আলাউদ্দীন শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। আমীর খসরু তাঁর সভাসদ্ ছিলেন। মুসলিম সাধক শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়া ও ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। দিল্লীর কাছে 'সিরি' নামে এক নতুন শহর আলাউদ্দীন নির্মাণ করেছিলেন।

সমালোচনা

আলাউদ্দীনের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ তাঁকে 'শ্রেষ্ঠ' সম্রাট বলে বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকের মতে তাঁর কঠোর শাসন ও প্রজা উৎপীড়নের মধ্যে দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রজারঞ্জক জনপ্রিয় সুলতান না হলেও রাজ্যবিস্তার ও শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য আলাউদ্দীন দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন।

খলজীবংশের শাসনের অবসান

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর মালিক কাফুর রাজ্যের প্রকৃত শাসক হন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে আলাউদ্দীনের আর এক পুত্র কুতবউদ্দীন মোবারক (১৩১৬-১৩২০) মালিক কাফুরকে নিহত করে সিংহাসন দখল করেন। চার বছর পর তাঁকে হত্যা করে **খসরু** দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে পাঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুরের শাসনকর্তা গাজী মালিক খসরুকে নিহত করে গিয়াসউদ্দীন তুঘলক নাম গ্রহণ করে তুঘলক বংশের শাসনের সূচনা করেন।

গিয়াসউদ্দীন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫)

তুঘলক বংশের শাসন ঃ গিয়াসউদ্দীন তুঘলক তুর্কীজাতির করৌণ শাখাজাত ছিলেন বলে তুঘলকরা **করৌণ তুর্কীবংশীয়** বলেও পরিচিত হয়। **গিয়াসউদ্দীন তুঘলক** (১৩২০-১৩২৫) মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে বরঙ্গলের রাজা প্রতাপরুদ্রের বিদ্রোহ দমন এবং বাংলাদেশে গৃহবিবাদের মীমাংসা করা ছিল তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে এক দুর্ঘটনায় গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জুনা খাঁ মহম্মদ বিন্ তুঘলক নাম ধারণ করে দিল্লীর সুলতান হন। ঐতিহাসিক ইবন বতুতার মতে জুনা খাঁই ষড়যন্ত্র করে পিতার মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন।

মহম্মদ বিন্ তুঘলক-এর (১৩২৫-১৩৫১) মত অদ্ভুত চরিত্রের সম্রাট

ইতিহাসে বিরল। গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনি সুকবিও ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। শিল্প সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি ধার্মিক ছিলেন এবং কখনও মদ্যপান করতেন না। তাঁর কর্মক্ষমতা ও রণকুশলতা কিছু কম ছিল না। একটি মানুষের মধ্যে এতগুলি গুণের সমাবেশ হলেও শাসক-রূপে মহম্মদ বিন তুঘলক ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বে প্রজারা কখনও সুখে বাস করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ তাঁর রাষ্ট্রনীতিজ্ঞানের অভাব। তিনি ছিলেন অস্থিরমতি ও অসহিষ্ণু। কোন কিছু করা একবার মনস্থ করলে আর তিনি ধৈর্য ধরে ভালমন্দ সম্ভব অসম্ভব বিচার করতেন না। কোন সমালোচনা বা প্রতিবাদ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আদেশ অমান্য করলে বা কোন রকম প্রতিরোধের চেষ্টা করলেই শাস্তি ছিল মৃত্যু। অথচ এই সুলতান অন্য দিকে ছিলেন কোমলহৃদয় ও দয়ালু। তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইতে এসে কেউ শূন্য হাতে ফিরে যেত না। ইবন বতুতা লিখেছেন, 'মহম্মদ বিন্ তুঘলক দুটি জিনিস ভালবাসতেন—দান করতে ও রক্তপাত করতে।' জিয়াউদ্দীন বরনী মহম্মদ বিন্ তুঘলককে 'সৃষ্টির অন্যতম আশ্চর্য' বলে বর্ণনা করেছেন। ইতিহাসে তিনি 'খেয়ালী রাজা' এমন কি 'পাগলা রাজা' নামেও অভিহিত হয়েছেন।

মহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১)

চরিত্র : পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ

অস্থিরমতিত্ব ও অসহিষ্ণুতা

সুলতান হবার পরই তিনি গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চলে রাজকর বাড়িয়ে দেন। এই করভার প্রজারা বহন করতে না পারায় জোরজুলুম করে কর আদায় করা হতে থাকে। তখন কৃষকরা প্রাণভয়ে জমিজমা চাষবাস ছেড়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে থাকে। ফলে ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে সুলতান কৃষিঋণ দান, জলসেচ, রাজস্ব হ্রাস ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

দোয়াবে করবৃদ্ধি

যখন দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে সেই সময় তিনি সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী থেকে দেবগিরি বা দৌলতাবাদে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত করেন। শুধু সরকারী দপ্তর ও কর্মচারী নয়, তিনি প্রতিটি নাগরিককে পর্যন্ত নতুন রাজধানীতে যেতে বাধ্য করেন। কিন্তু আট বছর পর ব্যাপক অসন্তোষ ও অন্যান্য অসুবিধা দেখা দেওয়ায় সকলকে আবার দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করতে

বাধ্য করা হয়। অসহনীয় দুঃখকষ্ট, অত্যাচার ও অর্থব্যয় ছাড়া রাজধানী পরিবর্তনে আর কোন লাভ হয়নি। অথচ সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী কোন অঞ্চলে রাজধানী স্থানান্তরের পিছনে যুক্তি ছিল। কিন্তু তাড়াহুড়া ও অপরিণামদর্শিতার জন্য মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল।

দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর

দুর্ভিক্ষ ও রাজধানী পরিবর্তনের ফলে যখন আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে সেই সময় মোঙ্গলরা ভারত আক্রমণ করে দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হলে (১৩২৮-১৩২৯) মহম্মদ বিন্ তুঘলক প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাদের বিদায় করেন। সীমান্ত সুরক্ষিত করার পরিবর্তে এইভাবে অর্থের দ্বারা মোঙ্গলদের বশীভূত করার চেষ্টা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবই প্রমাণ করে।

মোঙ্গল আক্রমণ

আর্থিক সঙ্কট দূর করার জন্য মহম্মদ বিন্ তুঘলক তামার নোটের প্রচলন করেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক চিন্তা ও ভাল উদ্দেশ্যে থাকলেও নোট জালের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করায় সারা দেশ জাল নোটে ভরে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে পড়ে। বিদেশী বণিকরা এই নোট গ্রহণে অস্বীকার করে। তখন সুলতান রাজকোষ থেকে সমস্ত তামার নোটের বিনিময়ে মূল্যদানের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে যারা নোট জাল করেছিল তারাও প্রচুর অর্থ পেয়েছিল। সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠেছিল।

তামার নোট প্রচলন

এই রকম যখন অবস্থা সেই সময় মহম্মদ বিন্ তুঘলকের দিগ্বিজয়ের বাসনা হওয়ায় তিনি প্রায় চার লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করেন। লক্ষ্য ছিল ইরাক ও খোরসান জয় করা। কিন্তু এক বছর ধরে এই বিশালবাহিনী পোষণ করার পর তিনি তাঁর পরিকল্পনার অবাস্তবতা উপলব্ধি করে সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে যে বিপুল অপব্যয় হয়েছিল তা অনুমান করা শক্ত নয়। তা সত্ত্বেও তিনি হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত কারাচলের হিন্দুরাজ্য আক্রমণ ও জয় করেন। কিন্তু এই অভিযানের ফলে সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। তিনি নাকি চীন ও তিব্বত জয়েরও পরিকল্পনা করেছিলেন।

দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা

এত অত্যাচার, অর্থব্যয় ও অস্থিরমতি কার্যকলাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে তুঘলক সাম্রাজ্যের চারদিকে বিদ্রোহ ও অসন্তোষ দেখা দেয়।

দাক্ষিণাত্যে **বিজয়নগরে** হরিহর ও বুক এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। দেবগিরিতে **বাহ্মনী** নামে এক স্বাধীন মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছোটাছুটি করেও তিনি শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হন। অবশেষে ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে মন্তব্য করে ঐতিহাসিক বদায়ুনী লিখেছেন, 'এইভাবে রাজা তাঁর প্রজাদের কাছে ও প্রজারা রাজার কাছে মুক্তি পেলেন।'

সাম্রাজ্যের চারদিকে বিদ্রোহ ও অসন্তোষ

অপুত্রক মহম্মদ বিন্ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর পিতৃব্যপুত্র **ফিরোজ শাহ তুঘলক** (১৩৫১-১৩৮৮) সিংহাসন লাভ করেন। ফিরোজের প্রথম সমস্যা ছিল বাংলাদেশে **শামস্উদ্দীন ইলিয়াস শাহ**-এর বিদ্রোহ দমন। কিন্তু ফিরোজ বঙ্গদেশ আক্রমণ করে সফল হননি এবং শেষ পর্যন্ত ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইলিয়াসের পুত্র সিকন্দরকে বাংলার স্বাধীন অধিপতিরূপে স্বীকার করে নেন। উড়িষ্যার জাজনগর আক্রমণ করে করদানের প্রতিশ্রুতিলাভ, পাঞ্জাবের নগরকোট দুর্গ অধিকার এবং সিন্ধুপ্রদেশে বিদ্রোহ দমনে আংশিক সাফল্য লাভ ছাড়া ফিরোজ বিশেষ সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় দেননি।

ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮)

তুঘলক সাম্রাজ্যের পতনরোধে অক্ষমতা

ধর্মানুরাগী দুর্বলচিত্ত ফিরোজ সামরিক সাফল্য অর্জন না করলেও শাসন-সংস্কারে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যারা মহম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজত্বকালে অন্যায়ভাবে নির্যাতিত হয়েছিল, তাদের তিনি সাধ্যমত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন। তিনি দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস করেন। করভার লাঘব করে প্রজা-নির্যাতন বন্ধের আদেশ দেন ও কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য জলসেচের সুব্যবস্থা করেন। পান্থশালা, চিকিৎসাকেন্দ্র, শিক্ষালয় স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কাজও তিনি করেছিলেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য শাসন-সংস্কার ছিল জায়গীর প্রথার পুনঃ প্রবর্তন। আলাউদ্দীন এই প্রথা লোপ করেছিলেন। ফিরোজ তুঘলকের সময় ক্রীতদাস প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। ক্রীতদাসদের যথাযথ পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়।

নানাবিধ শাসন-সংস্কার

ফিরোজ শাহ তুঘলক শিল্পোন্নতির সহায়তা করেছিলেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে

ফিরোজাবাদ শহর ছাড়া জৌনপুর, ফতেহাবাদ প্রভৃতি শহরগুলি তাঁর সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শহরে জল-সরবরাহ এবং সেচব্যবস্থার জন্য তিনি যে খালগুলি খনন করেছিলেন তা আজও পাঞ্জাবের কিছু অংশে কার্যকর আছে।

নতুন নগর নির্মাণ

ফিরোজ শাহ শিক্ষানুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রের এক মস্ত বড় দোষ ছিল ধর্মান্ধতা। তিনিই প্রথম ব্রাহ্মণদের ওপর জিজিয়া কর বসিয়েছিলেন ও বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। এমন কি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মুসলমানরাও তাঁর রাজত্বকালে উৎপীড়িত হয়েছিল।

ধর্মান্ধতা

ফিরোজের মৃত্যুর (১৩৮৮) পর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অরাজকতা দেখা দেয়। তুঘলক বংশের শেষ সুলতান **মামুদ শাহ**-এর (১৩৯৪-১৪১৩) রাজত্বকালে তুর্কীজাতির চাঘতাই শাখার নায়ক **তৈমুরলঙ্গ** ভারত আক্রমণ করেন (১৩৯৮)। কিন্তু ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা না থাকায় তিনি প্রচুর অর্থ, সম্পদ, মণিমাণিক্য নিয়ে সমরখন্দে ফিরে যান। শ্মশানভূমি স্বরূপ দিল্লীতে দুর্বল সুলতান মামুদ শাহ ফিরে এলেও আর বেশীদিন তুঘলক বংশের শাসন টিকে থাকতে পারেনি।

তৈমুরলঙ্গের আক্রমণ

সৈয়দ বংশ : তুঘলক রাজত্বের পর স্বল্পকালের জন্য (১৪১৪-১৪৫১) দিল্লীতে যে রাজবংশের শাসন সুরু হয় তার নাম **সৈয়দ বংশ**। নিজেদের হজরত মহম্মদের দৌহিত্র বংশ বলে পরিচয় দিতেন বলে এঁদের 'সৈয়দ' নাম হয়। এই বংশের শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুলতানের শাসনকর্তা **খিজির খাঁ**। দুর্বল সৈয়দ শাসকরা সামাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারেননি।

সৈয়দ বংশের দুর্বল শাসন (১৪১৪-১৪৫১)

লোদী বংশ : ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ বংশের উচ্ছেদ করে দিল্লীতে নতুন রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন পাঞ্জাবের আফগান শাসনকর্তা **বহলুল লোদী** (১৪৫১-১৪৮৯) তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম আফগান বা পাঠান সুলতান। বহলুলের পুত্র **সিকন্দর লোদী** (১৪৮৯-১৫১৭) রাজ্যশাসনে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলা, বিহার ও মধ্য ভারতে তিনি সামরিক সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। বিদ্যোৎসাহী হলেও তিনি ধর্মান্ধতামুক্ত ছিলেন না।

লোদী বংশের শাসন (১৪৫১-১৫২৬)

সিকন্দর লোদীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **ইব্রাহিম লোদী** (১৫১৭-১৫২৬) সুলতান হন। উদ্ধত ও ক্ষমতাপ্রিয় ইব্রাহিমের শাসনকালে রাজ্যের মধ্যে বিরোধ ও চক্রান্ত দেখা দেয়। তারই চরম পরিণতিরূপে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা **দৌলত খাঁ লোদী** কাবুলের অধিপতি বাবরকে দিল্লী আক্রমণ করতে আহ্বান জানান। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে **পানিপথের প্রথম যুদ্ধে** ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করে বাবর ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

প্রথম পানিপথের যুদ্ধ (১৫২৬) মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন

সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

তিনশো বছরেরও বেশী পুরানো (১২০৬-১৫২৬) তুর্ক-আফগান বা সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের মূলে কতকগুলি কারণ ছিল। সুলতানরা প্রায় সকলেই সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। জনসাধারণের সমর্থন বা সহযোগিতা সাম্রাজ্যের ভিতকে শক্ত করেনি। আলাউদ্দীন বা মহম্মদ বিন্ তুঘলকের মত শাসকেরাও জনসাধারণের মন জয় করতে পারেননি। আমীর-ওমরাহরা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন এবং প্রায় সব সময়ই ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতাদখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত থাকতেন। রাষ্ট্রের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উচ্চাভিলাষ এঁদের কাছে বড় ছিল। সুলতানী যুগের শাসনব্যবস্থা একান্তভাবে সম্রাটের ওপর নির্ভরশীল ছিল। দুর্বল বা অযোগ্য কোন ব্যক্তি সিংহাসনে বসলেই সেই সুযোগে ওমরাহরা এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তারা শক্তিশালী হয়ে উঠতেন এবং রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিত। বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা দুরূহ ছিল। রাজধানী থেকে দূরাঞ্চলে অবস্থিত ক্ষমতালোভী ব্যক্তিরা সুযোগ-সুবিধা পেলেই নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হত। মহম্মদ বিন্ তুঘলকের অস্থিরমতিত্ব, অসহিষ্ণুতা ও অদূরদর্শিতা সুলতানী সাম্রাজ্যের ক্ষতি করেছিল। যদিও কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর দায়িত্ব

জনসাধারণের সহযোগিতার অভাব

ওমরাহদের শক্তি ও ষড়যন্ত্র

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ : অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা

লঘু করে দেখবার চেষ্টা করেছেন, তবুও তাঁর অপরিণামদর্শী কার্যকলাপ যে সাম্রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন, ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন এবং ধর্মান্ধ নীতি অনুসরণ করে ফিরোজ তুঘলকও সুলতানী সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের ক্ষতি করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাধারণ ভাবে দিল্লীর সুলতানরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের আনুগত্য লাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অনুদার ধর্মনীতি সুলতানী শাসন ব্যবস্থার এক বড় দুর্বলতা ছিল। বারবার মোঙ্গল আক্রমণ সুলতানী সাম্রাজ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল। কোন কোন সুলতান সীমান্ত রক্ষার সুব্যবস্থা করেও মোঙ্গল আক্রমণ রোধ করতে পারেননি। তৈমুরলঙ্গের ভয়াবহ আক্রমণের ফলে সুলতানী সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তিম লগ্ন যখন আসন্ন সেই সময়ে লোদী-বংশের অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে বাবর দিল্লী আক্রমণ করে এই সাম্রাজ্যের পতন সম্পূর্ণ করেন।

মহম্মদ বিন্ তুঘলকের অদূরদর্শী নীতি

ফিরোজ তুঘলকের দায়িত্ব

অনুদার ধর্মনীতি

মোঙ্গল আক্রমণ

মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন

বাবর (১৫২৬-১৫৩০): মুঘল সামাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দীন মহম্মদ বাবর জাতিতে চাঘতাই তুর্কী ছিলেন। তাঁর পিতৃকুল তৈমুরলঙ্গের এবং মাতৃকুল চিঙ্গীজ খাঁর বংশধর। বাবরের পিতা ওমর শেখ মির্জা ছিলেন মধ্য এশিয়ার ক্ষুদ্র ফরগনা রাজ্যের অধিপতি। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর শত্রুর চক্রান্তে কিশোর বাবর সিংহাসনচ্যুত ও রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। জীবনের পরবর্তী কয়েক বছর অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে প্রতিকূল পরিবেশ ও ভাগ্যের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাবুলের সিংহাসন অধিকার করেন।

বাবর

প্রথম পানিপথের যুদ্ধের পূর্বে তিনি তিনবার ভারত সীমান্ত আক্রমণ করলেও স্থায়ী সাফল্যলাভ করতে পারেননি। কিন্তু লোদী সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও অন্তর্বিরোধ, মুঘলবাহিনীর উন্নততর রণকৌশল, কামানবন্দুকের ব্যবহার ও নিজের সাহস ও সুযোগ্য নেতৃত্ব পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) বাবরকে বিজয়ী করেছিল।

ভারতে মুঘল অধিকার বিস্তারের প্রধান অন্তরায় ছিলেন মেবারের রাণা **সংগ্রাম সিংহ** বা **সঙ্গ**। তাঁর বাসনা ছিল সমগ্র উত্তর ভারতে এক রাজপুত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। আফগান নেতা মামুদ লোদী ও রাজপুতানার বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা তাঁর সঙ্গে বাবরের বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে ফতেপুর সিক্রীর কাছে **খানুয়ার যুদ্ধে** বাবর জয়লাভ করেন। সুনিপুণ রণকৌশল ও গোলাবারুদের কাছে সাহস ও বীরত্বের পরাভব হয়।

খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭)

এরপর বাবর মধ্যভারতের চন্দেরী দুর্গ জয় করেন এবং ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে পাটনার কাছে গোগরা নদীর তীরে বাংলা ও বিহারের আফগান নেতাদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। পরের বছর (১৫৩০) তাঁর মৃত্যু হয়।

গোগরার যুদ্ধ (১৫২৯)

বাবরের চরিত্রে বহু রাজকীয় ও মানবিক গুণের প্রকাশ হয়েছিল। তিনি এক দিকে যেমন অসীম সাহস, বীরত্ব, আত্মবিশ্বাস ও রণকৌশলের অধিকারী ছিলেন, অন্য দিকে তেমনি ছিলেন উদার, দানশীল, বন্ধু-বৎসল, শিল্পরসিক ও সাহিত্যানুরাগী। তিনি নিজে সুকবি ছিলেন ও তাঁর আত্মজীবনী 'বাবর-নামা' মধ্যযুগের ইতিহাস ও সাহিত্যের এক সম্পদ।

চরিত্র

হুমায়ুন (১৫৩০-৩৯ ; ১৫৫৫-৫৬) ঃ বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র **হুমায়ুন** দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। মুঘল সাম্রাজ্য তখনও সুদৃঢ় হয়নি। গুজরাটের **সুলতান বাহাদুর শাহ** ও আফগান নেতা **শের খাঁ** ছিলেন হুমায়ুনের প্রধান শত্রু। তিনি নিজেও পিতার মত দৃঢ়চিত্ত বা রণকুশল ছিলেন না। এর ফলে হুমায়ুনকে ভীষণ সঙ্কট ও দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছিল।

হুমায়ুনের সঙ্কট

প্রথমে হুমায়ুন মধ্যভারতের কালঞ্জর দুর্গের হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে সফল অভিযান করেন। এই রাজা আফগানদের মিত্র ছিলেন। তারপর আফগান নেতা শের খাঁর আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি আদায়

প্রাথমিক সাফল্য

করে হুমায়ুন বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন ও মালব এবং গুজরাট জয় করেন। কিন্তু গুজরাট অভিযান সম্পূর্ণ হবার আগেই পূর্ব ভারতে শের খাঁ আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠায় হুমায়ুন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই সুযোগে বাহাদুর শাহ তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

গুজরাট অভিযান

১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন আফগানবাহিনীর কাছে পরাজিত হন। বিজয়ী শের খাঁ 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। পরের বছর কনৌজের কাছে বিলগ্রামের যুদ্ধে শের শাহের কাছে আবার পরাজিত হয়ে হুমায়ুন বহু দুঃখকষ্ট ও বিড়ম্বনার পর পারস্য দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। শের শাহের মৃত্যুর পর আফগান শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেই সুযোগে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই (১৫৫৬) আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

হুমায়ুন ও শের খাঁর বিরোধ

চৌসার (১৫৩৯) ও বিলগ্রামের যুদ্ধে (১৫৪০) হুমায়ুনের পরাজয় ও পলায়ন

প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যু

শের শাহ (১৫৩৯—১৫৪৫)ঃ বিহারের অন্তর্গত সাসারামের শূরবংশীয় বা পাঠান জায়গীরদারের পুত্র ফরিদ খাঁ বা শের খাঁর অদ্ভুত জীবন-কাহিনী সুপরিচিত। দুঃখকষ্ট ও ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও বাহুবলে গৌড় অধিকার করে পূর্ব ভারতে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। প্রথমে যখন হুমায়ুন আফগানদের দমন করতে পূর্ব ভারতে আসেন তখন সুচতুর শের খাঁ আনুগত্য স্বীকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। পরে নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করে ও উপযুক্ত সময় বুঝে তিনি হুমায়ুনের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। চৌসা ও বিলগ্রামের যুদ্ধে জয়লাভ করে শের শাহ উত্তর ভারতে আফগান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আর মাত্র কয়েক বছর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি পাঞ্জাব, মালব এবং রাজপুতানার বিভিন্ন রাজ্য ও দুর্গ জয় করেছিলেন। সম্ভাব্য মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য পাঞ্জাবে রোটাস দুর্গ নির্মাণ ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাংলায় বিদ্রোহ দমন করে ভবিষ্যতে যাতে বিদ্রোহ না হয়

শের শাহ (১৫৩৯-১৫৪৫)

আফগান অধিকার প্রতিষ্ঠা

রাজ্যবিস্তার

তার জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ লোপ করে সমগ্র বাংলাকে উনিশটি সরকারে বিভক্ত করেছিলেন। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কালঞ্জর দুর্গ অবরোধের সময় এক বিস্ফোরণের ফলে শের শাহের মৃত্যু হয়।

শের শাহ

সামরিক সাফল্যের থেকেও **রাজ্য শাসন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে শের শাহের সাফল্য ছিল চমকপ্রদ।** মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে মৌলিক চিন্তাধারা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে তিনি তাঁর সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্যকে সাতচল্লিশটি সরকারে এবং প্রত্যেকটি সরকারকে কয়েকটি পরগনায় ভাগ করেছিলেন। কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি নিয়ে পরগনা গঠিত হয়েছিল। সরকারের শাসনভার ছিল, 'শিকদার-ই-শিকদারান' ও 'মুনসিফ-ই-মুনসিফান' নামে দু'জন রজকর্মচারীর ওপর। 'শিকদার' দেশরক্ষা ও প্রজাশাসনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। 'মুনসিফ' রাজস্বসংক্রান্ত বিষয় দেখা-শোনা করতেন। প্রত্যেক পরগনায় 'আমিন,' 'শিকদার', 'খাজাঞ্চী' ও দু'জন 'কারকুন' নামে রাজকর্মচারী নিযুক্ত হতেন।

শাসনতান্ত্রিক বিভাগ সরকার, পরগনা এবং গ্রাম

রাজকর্মচারীবৃন্দ

শের শাহ রাজ্যের সমস্ত **জমি জরিপ** করে জমির সীমা নির্দেশ এবং রাজস্বের হার স্থির করার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রজারা উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ বা সমপরিমাণ অর্থ খাজনা দিত। **পাট্টা** ও **কবুলিয়ত** প্রথার প্রবর্তন করে তিনি জমিদার ও প্রজার পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য নির্দেশের ব্যবস্থা করেছিলেন।

জমি জরিপ ও রাজস্ব ব্যবস্থা

মুদ্রানীতির সংস্কার ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন, বাণিজ্যশুল্ক হ্রাস, যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি ও গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ, ডাকব্যবস্থার উন্নতি, বিচার-বিভাগ ও সামরিক বিভাগের সংস্কার এবং জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন নীতি ও কার্যাবলীর জন্য শের শাহ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শের শাহের আর এক বৈশিষ্ট্য

জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী ও অন্যান্য সংস্কার

ছিল যে তিনিই মুসলমান শাসকদের মধ্যে প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দেশ ভারতবর্ষে ধর্মান্ধতার স্থান নেই ; উদার শাসনব্যবস্থা ও সকল শ্রেণীর প্রজার প্রতি সমদৃষ্টিই রাষ্ট্রকে সুসংহত করতে পারে। এই বিষয়ে শের শাহ আকবরের পূর্বগামী ছিলেন।

উদার ধর্মনীতি ও প্রজাদের প্রতি সমদৃষ্টি

শের শাহের পর তাঁর পুত্র **ইসলাম শাহ** (১৫৪৫-১৫৫৪) কোন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের মধ্যে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং এই সুযোগে হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা পুনরধিকার করেন (১৫৫৫)। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর নাবালক জ্যেষ্ঠ পুত্র আকবর দিল্লীর বাদশাহ হন (১৫৫৬)।

শের শাহের দুর্বল উত্তরাধিকারীরা এবং আফগান সাম্রাজ্যের পতন

আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)ঃ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশে অমরকোটে যখন আকবরের জন্ম হয় তখন তাঁর পিতা হুমায়ুন রাজ্যহীন ও আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তের বছর বয়সে তিনি যখন দিল্লীর বাদশাহ হন তখনও মুঘল সাম্রাজ্য কেবলমাত্র দিল্লী, আগ্রা ও পাঞ্জাব অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। হুমায়ুনের মৃত্যুর পরই শের শাহের অন্যতম উত্তরাধিকারী মহম্মদ আদিল শাহ শূরের হিন্দু সেনাপতি ও মন্ত্রী **হিমু** দিল্লী ও আগ্রা দখল করে নিজেকে দিল্লীর অধিপতিরূপে ঘোষণা করেন। এই চরম সঙ্কটকালে আকবরের অভিভাবক ছিলেন বিশ্বস্ত, অভিজ্ঞ ও রণকুশল **বৈরাম খাঁ**। তিনি আকবরকে সঙ্গে নিয়ে সসৈন্যে হিমুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং **পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে** (১৫৫৬) হিমুকে পরাজিত ও নিহত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত ও নিষ্কণ্টক করেন।

আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)

নাবালক আকবরের সঙ্কট ও সমস্যা

দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ (১৫৫৬)

পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে আজমীর, গোয়ালিয়র ও জৌনপুর জয়ের ফলে আকবরের শক্তি ও সাম্রাজ্য আরও সুদৃঢ় হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত আকবর বৈরামের অভিভাবকত্ব, তাঁর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও ঔদ্ধত্যে অসন্তুষ্ট হয়ে বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করেন। অপমানিত বৈরাম বিদ্রোহ ঘোষণা করে ব্যর্থ হন এবং মক্কাযাত্রার পথে আততায়ীর হাতে নিহত হন (১৫৬১)। কিছুকাল

বৈরাম খাঁর পদচ্যুতি, বিদ্রোহ ও মৃত্যু

ধাত্রীমাতার প্রভাবাধীন হয়ে রাজ্যশাসন করার পর ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর সম্পূর্ণ নিজের হাতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার

পরবর্তী প্রায় চল্লিশ বছর ধরে রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করে আকবর এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। সামরিক শক্তির সঙ্গে কূটনৈতিক বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে আকবর একের পর এক মালব, গণ্ডোয়ানা, রাজপুতানার বিভিন্ন রাজ্য, গুজরাট, বঙ্গদেশ, কাবুল, কাশ্মীর, সিন্ধু, উড়িষ্যা, বেলুচিস্তান ও কান্দাহার জয় করে সমগ্র উত্তর ভারত তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির মধ্যে আহম্মদনগর ও খান্দেশ তিনি জয় করেছিলেন। **আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে বীর রাজপুত জাতির মৈত্রী ও সহযোগিতা মুঘল সাম্রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।** তাই বলপ্রয়োগ করে রাজপুত রাজ্যগুলি জয় করার পরিবর্তে তিনি উদার সর্ত

রাজপুত নীতি

ও বৈবাহিক সম্পর্কের বিনিময়ে অম্বররাজ বিহারীমল ও অন্যান্য রাজপুত রাজাদের বশ্যতা অর্জন করেন। কিন্তু মেবারের **রাণা উদয়সিংহ** আকবরের অধীনতা মানতে অস্বীকার করলে

মেবারের সঙ্গে বিরোধ

মুঘলবাহিনী চিতোর আক্রমণ করে। নিরাপত্তার জন্য উদয়সিংহ পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন। বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেও রাজপুতরা চিতোর দুর্গ রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। উদয়সিংহের পুত্র **রাণা প্রতাপ** কোন ভয় বা প্রলোভনেই নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে চাইলেন না। **হলদিঘাট বা গোগুণ্ডার** যুদ্ধে (১৫৭৬) প্রতাপ আকবরের বাহিনীর কাছে পরাজিত হন। রাজ্যহীন, সম্বলহীন, সহায়হীন রাণা প্রতাপ যেভাবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা ও সম্মানের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন তার তুলনা নেই। মৃত্যুর পূর্বে (১৫৯৭) এই রাজপুত বীর মেবারের বহু দুর্গ পুনরুদ্ধার করলেও তাঁর সাধ ও স্বপ্নের চিতোর তিনি উদ্ধার করতে পারেননি।

রাণা প্রতাপ

রাণী দুর্গাবতী, চাঁদ সুলতানা ও বার ভুঁইয়াদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ

গণ্ডোয়ানার বীরাঙ্গনা **রাণী দুর্গাবতী** ও আহম্মদনগরের **চাঁদ সুলতানা** প্রবল বিক্রমে মুঘলবাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা দেশের **বার ভুঁইয়া** নামে খ্যাত হিন্দু ও মুসলমান সামন্তরাজারা মুঘলদের বিরুদ্ধে নিজেদের রাজ্য রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য ও বাকলার কন্দর্পনারায়ণ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের বিদ্রোহের মধ্যে উচ্চাশা, ও স্বাধীন চিত্তের পরিচয় সুস্পষ্ট। পরবর্তী কালে ঐ উচ্চাশা, দুর্জয় সাহস ও মনোবল বাঙালীর নবজাগ্রত দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

আকবরের উদার ধর্মনীতি ও শাসন-ব্যবস্থা

আকবর বুঝেছিলেন যে ধর্মমতনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া কোন সুষ্ঠু সুসংবদ্ধ ভারতীয় সাম্রাজ্য গঠন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি ধর্ম-সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। রাজপুতদের সম্বন্ধে তাঁর উদার ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত সুদৃঢ় করেছিল।

আকবরের সাম্রাজ্য ১৫টি 'সুবা' বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। তাঁর শাসন-ব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল জায়গীর প্রথা লোপ করে মনসবদারী প্রথার প্রচলন। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত মনসবদারদের বেতন দেওয়া হত এবং যুদ্ধকালে তাদের সসৈন্যে সম্রাটের স্থায়ী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে হত। জমি-জরিপ, উর্বরতা ও কৃষির অবস্থা অনুসারে কৃষিভূমির শ্রেণীবিভাগ ও রাজস্বের হার নির্ধারণ ইত্যাদি রাজস্ব-সংস্কার আকবরের শাসন-ব্যবস্থার আর এক বৈশিষ্ট্য। এই বিষয়ে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন তোডরমল। রাজ্যশাসনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আকবর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও সাফল্য

ধর্মমত

বিভিন্ন ধর্মমত ও তত্ত্ব সম্বন্ধে আকবরের অনুসন্ধিৎসা ছিল। তিনি ফতেপুর সিক্রিতে **'ইবাদৎখানা'** নামে এক ধর্মসভাগৃহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হত। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সকল ধর্মের মূলতত্ত্বের সমন্বয় করে আকবর **দীন ইলাহী** নামে এক নতুন ধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

আকবর শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক আবুল ফজল, কবি ফৈজী, গায়ক তানসেন, সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ বজবাহাদুর, কবি ও সুরসিক রাজা বীরবল প্রভৃতি জ্ঞানী-গুণীরা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। রাজ্যবিস্তার, রাজ্য গঠন, এবং শাসন সুসংহত করার ক্ষেত্রে আকবরের বিস্ময়কর প্রতিভার ছাপ ছিল সুস্পষ্ট। তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, ধর্মসহিষ্ণুতা এবং উদার ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য আকবরকে ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক বলে জওহরলাল নেহেরু অভিহিত করেছেন।

আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭)ঃ আকবরের মৃত্যুর পর যুবরাজ সেলিম 'জাহাঙ্গীর' নাম ধারণ করে মুঘল সিংহাসনে বসেন। জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু আকবরের বিশেষ স্নেহ-ভাজন ছিলেন বলে তিনি আশা করেছিলেন যে পিতামহ তাঁকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ না হওয়ায় খসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। জাহাঙ্গীর স্বয়ং এই বিদ্রোহ দমন করেন ও খসরুকে সাহায্য করার অপরাধে শিখগুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ড দেন। শিখদের সঙ্গে সংঘর্ষের সূচনা করে জাহাঙ্গীর অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭)

পুত্র খসরুর ব্যর্থ বিদ্রোহ

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের আসল কর্ত্রী ছিলেন রাজমহিষী **নূরজাহান**। তাঁর পূর্বনাম ছিল মেহেরুন্নিসা। প্রথমে তাঁর সঙ্গে বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানের বিবাহ হয়েছিল। বিদ্রোহের অপরাধে শের আফগানকে প্রাণদণ্ড (১৬০৭) দেবার কয়েক বছর পর জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসাকে বিবাহ করেন (১৬১১)। রাজমহিষীর নতুন উপাধি হয় নূরজাহান (জগতের আলো)।

রাজমহিষী নূর-জাহানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রাণা প্রতাপের পুত্র **অমরসিংহ** বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর সম্মানজনক সর্তে মুঘল আধিপত্য স্বীকার করেন। স্থির হয় যে মেবারের কোন রাজকন্যা মুঘল অন্তঃপুরে প্রবেশ করবে না এবং মেবারের রাণাকে ব্যক্তিগতভাবে মুঘল দরবারে উপস্থিত থাকতে হবে না। অন্য কোন রাজপুত

মেবারের রাণা অমর-সিংহের মুঘল আধি-পত্য স্বীকার
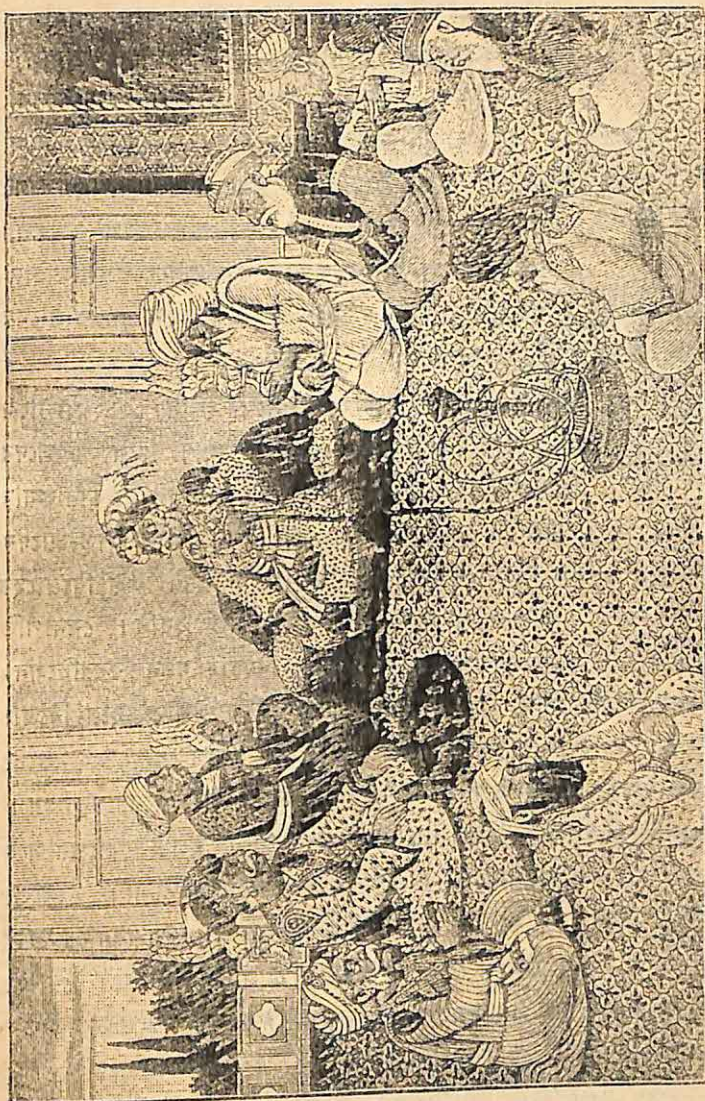
ইবাদৎখানা—ধর্মালোচনারত আকবর

রাজ্য মুঘলদের কাছে এই বিশেষ স্বীকৃতি ও মর্যাদা পায়নি। বাংলাদেশের সামন্ত নরপতিদের বিদ্রোহ দমন করে জাহাঙ্গীর ঐ অঞ্চলে মুঘল অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। জাহাঙ্গীর পিতার মত দাক্ষিণাত্য জয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

বাংলার বিদ্রোহ দমন

মালিক অম্বর নামে এক হাবসী মন্ত্রীর পরিচালনায় আহম্মদনগর রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। যুবরাজ খুরম আহম্মদনগর আক্রমণ করে সেখানে মুঘল অধিকার স্থাপন করেন। পুত্রের সাফল্যে খুশি হয়ে জাহাঙ্গীর তাঁকে 'শাহজাহান' (জগতের সম্রাট) উপাধি প্রদান করেন। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবের কাংড়া দুর্গ মুঘলবাহিনী জয় করে।

দাক্ষিণাত্যে আহম্মদনগর জয়

জাহাঙ্গীরের শেষ জীবন বিশেষ গৌরবের বা সুখের হয়নি। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের শাহ কান্দাহার আক্রমণ করে মুঘলদের বিতাড়িত করেন। জাহাঙ্গীর কান্দাহার পুনরুদ্ধার করার জন্য শাহজাহানকে নির্দেশ দেন। কিন্তু পিতৃ-আদেশ অমান্য করে শাহজাহান তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহের ফলে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সেনাপতি মহাবৎ খাঁ শাহজাহানের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেও নূরজাহানের কর্তৃত্বে উত্যক্ত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শাহজাহানের পক্ষে যোগ দেন। এই সঙ্কটের মীমাংসার পূর্বেই ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়।

শাহজাহানের বিদ্রোহ

মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ

জাহাঙ্গীরের মৃত্যু

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের সূচনা। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ (James I) মুঘল দরবারে **স্যার টমাস রো** নামে এক দূত পাঠিয়েছিলেন। রো-এর বিবরণ থেকে জাহাঙ্গীরের দরবার ও সমসাময়িক যুগ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

ইংরাজ দূত স্যার টমাস রো

শুভবুদ্ধি, ন্যায়বিচার, সাহিত্য ও চিত্রশিল্পে অনুরাগ ইত্যাদি গুণের জন্য জাহাঙ্গীর প্রসিদ্ধ। অন্য দিকে তিনি ছিলেন কিছুটা খামখেয়ালী, অদূরদর্শী এবং নিষ্ঠুর। অহিফেন সেবন, অতিরিক্ত মদ্যপান ও বিলাসপ্রিয়তা ছিল তাঁর দুর্বলতা। চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবে তাঁর রাজত্বকালে নূরজাহানই সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসন-

জাহাঙ্গীরের দুর্বলতা

ক্ষমতার অধিকারিণী হয়েছিলেন। রাজ্যের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার পক্ষে এই পরিবেশ ক্ষতিকর হয়েছিল।

শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮) ঃ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান মুঘল সিংহাসনে বসেন। সম্ভাব্য সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করে শাহজাহান তাঁর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বুন্দেলখণ্ডের রাজা এবং দাক্ষিণাত্যের সুবাদার খানজাহান লোদীর বিদ্রোহ তিনি দমন করেন। পোর্তুগীজ বণিকদের নানাবিধ অত্যাচারে বাংলাদেশের মানুষ জর্জরিত হচ্ছিল। শাহজাহানের আদেশে বাংলার শাসনকর্তা কাশিম আলি ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর পোর্তুগীজ কুঠি অধিকার করে তাদের দৌরাত্ম্য ও বাণিজ্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন।

শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮)

পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটদের মত শাহজাহানও দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি আহম্মদনগর জয় সম্পূর্ণ করেন (১৬৩৩)। তিন বছর পর দাক্ষিণাত্যের আর দুটি মুসলমান রাজ্য বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে। শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র **ঔরংজীব** দুবার দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রথমবার তিনি আট বছর এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হবার পর ঔরংজীব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দুটি সম্পূর্ণ জয় করতে উদ্যত হলে শাহজাহান বাধা দেওয়ায় তিনি নিবৃত্ত হতে বাধ্য হন। দাক্ষিণাত্যের শাসনকার্যে ঔরংজীব বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে রাজ্যজয়

শাহজাহান ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও মধ্য এশিয়ায় মুঘল অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। মুঘলবাহিনী মোট তিনবার কান্দাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেও সফল হয়নি। কিন্তু মধ্য এশিয়া অভিযান ও কান্দাহার পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়ে গিয়েছিল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও মধ্য এশিয়ায় মুঘলদের ব্যর্থতা

শাহজাহানের জীবিতকালেই তাঁর চার পুত্র দারা, সুজা, ঔরংজীব ও মুরাদের মধ্যে মুঘল সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ

সুরু হয়। শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক ভ্রাতৃযুদ্ধে জয়লাভ করে এবং ভ্রাতাদের হত্যা ও বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে ঔরংজীব ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন।

উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ঔরংজীবের সাফল্য

সাম্রাজ্যের বিশালতা, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, বিপুল ঐশ্বর্য ও অসাধারণ শিল্পকীর্তি শাহজাহানের রাজত্বকালকে গৌরবময় করেছিল। আড়ম্বরপ্রিয় ও শিল্পানুরাগী সম্রাট শাহজাহানের সময় বহু মর্মরপ্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ, মসজিদ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল। মুঘল চিত্রশিল্পের চরম বিকাশও তাঁর সময় হয়েছিল। ময়ূর সিংহাসন, কোহিনূর হীরা ইত্যাদি শাহজাহানের ঐশ্বর্যের পরিচয় ছিল। কিন্তু **এত বৈভব ও আড়ম্বর সত্ত্বেও শাহজাহানের রাজত্ব কাল থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।**

মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি

ঔরংজীব (১৬৫৮-১৭০৭): ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে ঔরংজীবের রাজ্যাভিষেক হয় এবং তিনি 'আলমগীর' (বিশ্বজয়ী) উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালকে দুভাগে ভাগ করা হয়: (ক) ১৬৫৮-১৬৮১ (খ) ১৬৮২-১৭০৭। রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি প্রধানতঃ উত্তর ভারত এবং দ্বিতীয় ভাগে দক্ষিণ ভারত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

রাজ্যবিস্তার ও বিদ্রোহ দমন: সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ঔরংজীব মীর জুমলাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেছিলেন। মীর জুমলা উত্তর-পূর্ব সীমান্তে শক্তিশালী আহোমদের পরাজিত করে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কিন্তু এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মীর জুমলার মৃত্যুর পর শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার হন। তিনি আরাকান-রাজের কাছ থেকে চট্টগ্রাম দখল করেন এবং পোর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন করে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে শান্তি স্থাপন করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুর্দান্ত আফগান উপজাতিগুলির বিদ্রোহ দমন করতে ঔরংজীবকে প্রচুর ব্যয় ও সৈন্য নিয়োগ করতে হয়েছিল।

ঔরংজীব (১৬৫৮-১৭০৭)

মুঘল সাম্রাজ্য
আকবরের সাম্রাজ্য
আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য
কাবুল
কাবুল নদী
কা শ্মী র
পঞ্জাব
লাহোর
মুলতান
পাণিপথ
দিল্লী
হি মা ল য়
সিন্ধু নদ
রাজপুতানা
সিক্রি
আগ্রা
অযোধ্যা
সি ন্ধু
আজমীর
কনৌজ
লক্ষ্ণৌ
বক্সার
পাটনা
বি হা র
ব্রহ্মপুত্র
চিতোর
এলাহাবাদ
বারাণসী
চুনার
গৌড়
পদ্মা
মালব
শোন
আমেদাবাদ
বিন্ধ্য পর্বত
গণ্ডোয়ানা
বঙ্গদেশ
গুজরাট
নর্মদা
তাপ্তী
খান্দেশ
মহানদী
উড়িষ্যা
বে রা র
গোদাবরী
আহম্মদনগর
গোলকুণ্ডা
মারাঠারাজ্য
কৃষ্ণা
বিজাপুর
কাবেরী
তাঞ্জোর
মাদুরা
রামেশ্বর
ভা র ত ম হা সা গ র

ঔরংজীব ছিলেন স্বধর্মনিষ্ঠ সুন্নী মুসলমান। কিন্তু তাঁর ধর্মান্ধতা ও পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের ধর্মীয় উদারতার কথা সুবিদিত। মধ্যযুগেও শের শাহ এবং আকবর উদার ধর্মনীতি অনুসরণ করেছিলেন। জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের এই ঔদার্য ও দূরদৃষ্টি না থাকলেও তাঁদের রাজত্বকালে এই নীতি সুপরিকল্পিতভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু ঔরংজীব সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি ইসলামীয় ধর্মরাষ্ট্রে পরিণত করার সংকল্প করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে অ-মুসলমানদের ওপর নানাপ্রকার বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। জিজিয়া ও তীর্থকর কঠোরভাবে প্রবর্তন করা ছাড়া তিনি বহু হিন্দু মঠ, মন্দির, শিক্ষালয় ধ্বংস করেছিলেন। হিন্দু ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল। হিন্দুদের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস, রাজকার্যে হিন্দুদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের অস্ত্র ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ঔরংজীব হিন্দুদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি খর্ব করেছিলেন। ঔরংজীবের ধর্মনীতির প্রতিক্রিয়ারূপে তাঁর রাজত্বকালেই মথুরা অঞ্চলের জাঠরা, মধ্য ভারতের বুন্দেলারা, পাতিয়ালা অঞ্চলের সৎনামী সম্প্রদায় এবং শিখরা বিদ্রোহ করে।

ঔরংজীবের ধর্মনীতি

ঔরংজীবের অদূরদর্শী সাম্রাজ্যলিপ্সা ও ধর্মনীতির আর এক পরিণাম ছিল রাজপুত ও মারাঠাদের অনমনীয় শত্রুতা। ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মারবাড়ের (যোধপুর) রাজা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর ঔরংজীব যোধপুর অধিকার করেন। এরপর তিনি যশোবন্তের স্ত্রী ও তাঁর শিশুপুত্র অজিতসিংহকে দিল্লীতে আটক রেখে ধর্মান্তরিত করার পরিকল্পনা করলে **দুর্গাদাসের** নেতৃত্বে রাঠোররা মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করে। দুর্গাদাস রাণী ও শিশু-রাজপুত্রকে নিয়ে রাজপুতানায় পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুঘলবাহিনী যোধপুর ও অন্যান্য শহর দখল করে। এই সময় মেবারের রাণা **রাজসিংহ** বিদ্রোহী রাঠোরদের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি ইতিপূর্বেই জিজিয়া কর প্রবর্তনের জন্য ঔরংজীবের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। মুঘলরা চিতোর অধিকার করলেও রাজসিংহকে দমন করতে ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে বাদশাহের পুত্র আকবর বিদ্রোহী হয়ে রাজপুতদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় ঔরংজীবের সমস্যা ও বিপদ বৃদ্ধি পায়। কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেলেও দীর্ঘকাল ধরে রাজপুতদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

রাঠোর-মুঘল সংঘর্ষ

মেবারের সঙ্গে বিরোধ

করেও ঔরংজীব চূড়ান্ত জয়লাভে ব্যর্থ হন। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহ মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি করলেও রাঠোররা ঔরংজীবের মৃত্যুকাল (১৭০৭) পর্যন্ত কোন আপস করেনি। ঔরংজীবের পুত্র বাহাদুর শাহ শেষ পর্যন্ত রাঠোরদের সঙ্গে সন্ধি করে অজিত-সিংহকে পিতৃরাজ্যের অধিপতি বলে স্বীকার করেন। রাজপুতদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামে লিপ্ত থেকে ঔরংজীবের কোন লাভ হয়নি। বরং বীর রাজপুত জাতির সহযোগিতার পরিবর্তে শত্রুতা মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছিল।

রাজপুতদের সঙ্গে বিরোধের কুফল

দক্ষিণ ভারতে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থানের মূলেও ছিল ঔরংজীবের অপরিণামদর্শী সঙ্কীর্ণ নীতি। জীবনের শেষ পঁচিশ বছর ধরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও বাদশাহ আলমগীরের পক্ষে 'পার্বত্য মূষিক,' শিবাজী বা তাঁর পরবর্তী মারাঠা নায়কদের দমন করা সম্ভব হয়নি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে 'দাক্ষিণাত্যের ক্ষত' (Deccan ulcer) ঔরংজীবের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছিল। (একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তারূপে থাকার সময় থেকেই বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শিয়া রাজ্য দুটি জয় করার মনোবাসনা ঔরংজীবের ছিল। প্রথমে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর ও পরের বছর গোলকুণ্ডা রাজ্যটি জয় করে ঔরংজীব তাঁর দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণ করেন। এরপর তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপল্লী পর্যন্ত তিনি মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করে ঔরংজীব দূরদৃষ্টির পরিচয় দেননি, কেননা মারাঠাদের দমন করার ব্যাপারে এই রাজ্য দুটির স্বাধীন অস্তিত্ব ও সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই যুক্তি সকলে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাঁদের মতে, এই দুই রাজ্য ইতিমধ্যেই এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে তাদের পক্ষে মুঘল সম্রাটকে বিশেষ কিছু সাহায্য করা সম্ভব ছিল না।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়

সমালোচনা

ঔরংজীবের দাক্ষিণাত্য-নীতি চরম ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছিল। মারাঠা শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে তিনি সক্ষম হননি। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সঙ্গে সংঘর্ষে মুঘলশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। উত্তর ভারতেও রাজপুতদের বিরোধিতা এবং অন্যান্য জাতির অসন্তোষ ও বিদ্রোহ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন করে তুলেছিল। রাজপুত্র আকবর প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছিলেন। অন্য দুই পুত্রকেও ঔরংজীব

ঔরংজীবের রাজত্ব-কালে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত

বিশ্বাস করতে পারেননি। দীর্ঘকালব্যাপী লোকক্ষয়ী এবং অর্থক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। এই সব কিছুর সমাবেশে ঔরংজীবের মৃত্যুর (১৭০৭) পূর্বেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

ঔরংজীব অসাধারণ প্রতিভা, বীরত্ব ও চারিত্রিক গুণের অধিকারী ছিলেন। সমসাময়িক যুগের শাসকশ্রেণীর শ্রমবিমুখতা এবং বিলাস-ব্যসন ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নৈতিক আদর্শ, কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা এবং সহজ সরল জীবনযাত্রা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। সুদীর্ঘকাল বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ ও সুশাসিত রেখে তিনি নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে ঔরংজীবের ধর্মান্ধতা, অদূরদর্শিতা ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে নির্মম আচরণের কাহিনীগুলি ইতিহাসে অতিরঞ্জিতভাবে স্থান পেয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তিনি নিজে গোঁড়া সুন্নী মুসলমান হলেও অন্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর খুব বেশী কিছু উৎপীড়ন করেননি। অন্য অনেক ঐতিহাসিকের মতে ঔরংজীবের ভূমিকার এই নব মূল্যায়ন গ্রহণযোগ্য নয়। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মূলে ঔরংজীবের দায়িত্ব কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

ঔরংজীবের চরিত্র

ঔরংজীবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনের অবসান হয়। তাঁর উত্তরাধিকারী বৃদ্ধ **বাহাদুর শাহ** (১৭০৭-১৭১২) রাজকার্যে অমনোযোগী ছিলেন বলে তাঁকে বিদ্রূপ করে 'শাহ্-ই বেখবর' বলা হত। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একের পর এক অযোগ্য সম্রাট স্বল্প কালের জন্য রাজত্ব করেছিলেন। **দ্বিতীয় শাহ আলম** (১৭৬১-১৮০৬) দীর্ঘকাল রাজত্ব করলেও তিনিও ছিলেন দুর্বল, অকর্মণ্য, অপদার্থ ও অস্থিরচিত্ত। তাঁর রাজত্বকালের মধ্যে ভারতবর্ষে বৃটিশ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পরবর্তী মুঘল সম্রাটের দুর্বলতা ও অযোগ্যতা

মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের সম্রাট **নাদির শাহ** ভারত আক্রমণ করে দিল্লীতে উপস্থিত হন। বহু মানুষকে হত্যা করে ও আশি কোটি টাকা, ময়ূর সিংহাসন, কোহিনূর হীরা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুঠ করে নিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে যান। নাদির শাহের আক্রমণের জের শেষ হতে না হতেই আর এক বৈদেশিক আক্রমণকারীর দৃষ্টি ভারতের ওপর

নাদির শাহের ভারত আক্রমণ

পড়ে। ইনি ছিলেন আফগান অধিপতি **আহম্মদ শাহ দুরানী**। ১৭৪৮ থেকে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ন'বার ভারত আক্রমণ করে তিনি দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সাম্রাজ্যকে প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ভারতে বৃটিশ অধিকার স্থাপনের পথ সুগম করে।

আহমদ শাহ দুরানীর ভারত আক্রমণ

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

কালের নিয়মে সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ইতিহাসের স্বাভাবিক ঘটনা। সুতরাং একদা বিশাল ও মহাশক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্য যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল তার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। ঔরংজীবের ধর্মান্ধতা এবং তাঁর অদূরদর্শী দাক্ষিণাত্য-নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল। রাজপুত, মারাঠা, শিখ এবং অন্যান্য বহু ধর্ম ও জাতির মানুষের শত্রুতা সাম্রাজ্যের ভিত দুর্বল করে দিয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মূলে অন্যান্য কারণও ছিল। সুলতানী যুগের মত মুঘল আমলেও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে রাজ্যের জনসাধারণের কোন সহযোগিতা ছিল না। একমাত্র আকবর ছাড়া অন্য কোন সম্রাট সকল প্রজাকে একসূত্রে বাঁধবার প্রচেষ্টা করেননি। মুঘল সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তন রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। আমীর-ওমরাহ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ক্ষমতালিপ্সা, চক্রান্ত এবং বিদ্রোহ কেন্দ্রীয় শক্তি ও সাম্রাজ্যের সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। ঔরংজীবের পরবর্তী অযোগ্য শাসকদের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলি সুস্পষ্টরূপে দেখা দিয়েছিল। মন্ত্রীদের অযোগ্যতা, কর্তব্যে অবহেলা, নৈতিক অধঃপতন, কর্মচারীদের অত্যাচার ইত্যাদি জনসাধারণের জীবন আরও দুর্বিষহ করে তুলেছিল। নানাপ্রকার বিলাস-ব্যসন, উচ্ছৃঙ্খলতা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব মুঘল সৈন্যদের মধ্যেও প্রবেশ করে। নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ দুরানীর আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতা উদঘাটিত করেছিল।

ঔরংজীবের দায়িত্ব

স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

আমীর ওমরাহদের ক্ষমতালিপ্সা

পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের দুর্বলতা

সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা

বৈদেশিক আক্রমণ

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অভিজাত সম্প্রদায়ের অবক্ষয়, দলীয় বা গোষ্ঠীগত রাজনীতি এবং সর্বোপরি আর্থিক সঙ্কটের লক্ষণগুলি ঔরংজীবের রাজত্বকালেরও আগে থেকে দেখা দিয়েছিল। ভূমি ও রাজস্বব্যবস্থার ত্রুটি, কৃষক-উৎপীড়ন, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ইত্যাদি বহু পূর্বেই সুরু হয়েছিল। শাহজাহানের সাম্রাজ্য বিস্তার, বাহ্যিক আড়ম্বর এবং ব্যয়বহুল মর্মরসৌধ, প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য অকাতরে ব্যয়ের ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল। ঔরংজীব নিজে মিতব্যয়ী হলেও দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে এবং বিদ্রোহ দমনে প্রচুর অর্থব্যয় করায় সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। অর্থনৈতিক দুর্দশা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল।

অর্থনৈতিক কারণ

দশম অধ্যায়

ভারতে মুসলমান শাসনের প্রভাব

সুলতানী যুগ ঃ মুসলমান বিজয়ের বহু পূর্বেই একের পর এক বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা অন্যান্য বিদেশী জাতির মত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে হিন্দুসমাজে মিশে যায়নি। এর এক প্রধান কারণ ছিল ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। প্রচণ্ড একেশ্বরবাদী ইসলামধর্মাবলম্বী মুসলমান এবং প্রতীক ও প্রতিমাপূজায় বিশ্বাসী হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ উভয়ের মিলনের পথে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের বর্ণাশ্রমের আদর্শের বিরাট পার্থক্য ছিল। অন্য দিকে শাসকশ্রেণীভুক্ত মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা লাভ করায় দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়।

সুলতানী যুগ

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মিলনের অন্তরায়

সামাজিক বৈষম্য ও অত্যাচারে জর্জরিত নিম্নবর্ণের অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্মের সাম্যনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে এই সঙ্কটকালে রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে হিন্দুশাস্ত্রকাররা আরও কঠোর ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধ প্রবর্তনে সচেষ্ট হন। মধ্যযুগের রক্ষণশীল শাস্ত্রকারদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের **মাধবাচার্য** ও বাংলার **রঘুনন্দন** বিশেষ প্রসিদ্ধ।

হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা ও বিধিনিষেধের কঠোরতা বৃদ্ধি

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক পার্থক্য থাকলেও দুই ধর্মের কিছু কিছু মানুষ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগসূত্র এবং সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদ এই মিলন প্রচেষ্টাকে আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী করে তোলে। এর ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধের তীব্রতা হ্রাস পায় এবং এক মিলনপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা হয়। যে মহাপুরুষেরা মিলন ও সাম্যের বাণী প্রচার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামানন্দ, কবীর, নামদেব, শ্রীচৈতন্য, একনাথ, নানক প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। এঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এক ও অভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎ-প্রেম এবং সর্বজীবে প্রেমই হল প্রকৃত ধর্ম।

মধ্যযুগের ধর্ম-সংস্কারকগণের ভূমিকা

মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন **রামানন্দ**। তাঁকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ভক্তি-আন্দোলনের সেতুরূপে অভিহিত করা হয়। তিনি ছিলেন রাম ও সীতার উপাসক। তিনি জাতিভেদ প্রথা মানতেন না ও বিভেদসৃষ্টিকারী সামাজিক অনুশাসনের বিরোধী ছিলেন। রামানন্দ উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে একেশ্বরের আরাধনা এবং মানব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করেছিলেন।

রামানন্দ

রামানন্দের বিখ্যাত শিষ্য **কবীর** পঞ্চদশ শতকে জন্মেছিলেন। মধ্যযুগের ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে তিনিই প্রথম জ্ঞাতসারে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন। এই দুই ধর্মের কোনটিরই বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান তিনি মানতেন না। তিনি প্রচার করেছিলেন যে সব ধর্মই এক। হিন্দুদের রামই মুসলমানদের রহিম। মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। কবীরের দোঁহাগুলি হিন্দী সাহিত্যের সম্পদ। এই দোঁহাগুলির মাধ্যমে তিনি ধর্মের বহু জটিল তত্ত্ব অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

কবীর

মধ্যযুগের সন্ন্যাসী ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন **শ্রীচৈতন্যদেব**। ১৪৮৫ (?) খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের মধ্যে তিনি কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন। বৈরাগ্য, ঈশ্বর-প্রেম ও জীবে দয়া—এই ছিল তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা। তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন একজন মুসলমান—'যবন হরিদাস'। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম অগণিত মানুষের মধ্যে এক নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। শুধুমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, পূর্ব ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এক নব যুগের সূচনা করেছিল।

শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক আর এক বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক ছিলেন দক্ষিণ ভারতের **বল্লভাচার্য**। শ্রীকৃষ্ণের উপাসক এই পরম বৈষ্ণব জাতিভেদ মানতেন না। তিনি প্রচার করেছিলেন যে জীবসেবা ও ঈশ্বরভক্তিই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া ভক্তি অর্জন করা সম্ভব নয়।

নানক

এই যুগে মহারাষ্ট্রে যে সব ভক্তিবাদী ধর্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন নামদেব এবং একনাথ। জাতিভেদপ্রথা এবং বাহ্যিক অনুষ্ঠান-বহুল উপাসনার বিরোধী **নামদেব** হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। **একনাথ** সর্বপ্রকার অস্পৃশ্যতার বিরোধী ছিলেন। তিনি গার্হস্থ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মধ্য-যুগের আর এক মহাপুরুষ ছিলেন শিখধর্মের প্রবর্তক **গুরু নানক** (১৪৬৯-১৫৩৮)। তিনি ঘোষণা করেন, 'হিন্দু বলে কেউ নেই, মুসলমান বলে কেউ নেই।' 'রাম ও রহিম এক ও অভিন্ন—এই পরম সত্য।' 'প্রেম ও মৈত্রী সবার উধ্বে'। মানুষের একমাত্র আশ্রয় ঈশ্বর। জাতিভেদ মিথ্যা।' ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ও তীর্থভ্রমণের বাহুল্যের বদলে তিনি সমদৃষ্টি, পবিত্র মন ও বিশুদ্ধ

বল্লভাচার্য, নামদেব, একনাথ, গুরু নানক

ভক্তিকে প্রকৃত ধর্মের উপাদান বলে মনে করতেন। শিখধর্মের প্রবর্তক ও সংগঠকরূপে পরিচিতি লাভ করলেও নানক নিজেকে কোন নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে যুক্ত করেননি। তিনি ছিলেন হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই পথ-প্রদর্শক। তাই বলা হয়ঃ

'গুরু নানক শাহ ফকির
হিন্দুকা গুরু মুসলমানকা পীর।'

ভক্তিবাদী হিন্দুধর্ম-প্রচারকদের মত মুসলমান সুফী ও ফকিররাও দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন। হিন্দু ভক্তিবাদীরা যেমন ইসলামের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন সুফী সাধকেরাও তেমনি ভারতীয় চিন্তাধারা, বিশেষ করে হিন্দু বেদান্ত দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে **খাজা মুইনউদ্দীন চিশ্‌তি, নিজামউদ্দীন আউলিয়া, শাহ জালাল** প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। এই সব মুসলমান সাধু-ফকির, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আজও ফকিরদের দরগায় হিন্দু ও মুসলমানেরা 'সিন্নী' দেয় ও মানত করে। সত্যপীর পূজা এবং পীরের গান, গ্রাম্য গীতি, ছড়া প্রভৃতি লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলিম ভাবধারার মিলনের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

সুফী সাধকবৃন্দ

লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সমন্বয়ের পরিচয়

মধ্যযুগের ধর্মপ্রচারকরা লৌকিক ভাষায় সর্বসাধারণের মধ্যে উপদেশ দিতেন। এর ফলে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হয়েছিল। রামানন্দ ও কবীর হিন্দীতে তাঁদের বাণী প্রচার করায় হিন্দী ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছিল। অনুরূপভাবে একনাথ মারাঠী ভাষা, নানক ও তাঁর শিষ্যেরা পাঞ্জাবী ও গুরুমুখী ভাষা এবং শ্রীচৈতন্যদেব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও মর্যাদাবৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। এই যুগের বাংলার গীতিসাহিত্যের অপূর্ব উৎকর্ষসাধন করেছিলেন বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। এই সময়ই রাজস্থানে ভক্তিপ্রাণা মীরাবাঈ-এর ভজনাবলী রচিত হয়েছিল।

আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি

সুলতানী যুগের মুসলমান শাসকদের অনেকেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। বাংলার সুলতানদের মধ্যে ইউসুফ শাহ, হুসেন শাহ এবং নসরৎ শাহ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের

রচয়িতা বিজয় গুপ্ত, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের রচয়িতা মালাধর বসু (গুনরাজ খাঁ), কবি বিদ্যাপতি, মহাভারতের অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর, কবি শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকরা মুসলমান শাসকদের উৎসাহ ও আনুকূল্য লাভ করে-ছিলেন। সুলতানী যুগে রচিত হিন্দী সাহিত্যকীর্তির মধ্যে চাঁদ কবির 'পৃথ্বীরাজরাসো', শরঙ্গধরের 'হামীররাসো' এবং 'হামীর কাব্য', জয়নাকের 'পৃথ্বীরাজ বিজয় মহাকাব্য' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলার মুসলমান শাসকদের সাহিত্যানুরাগ

তুর্ক-আফগান আমলে উর্দু ভাষার উদ্ভব হয়েছিল। হিন্দুস্থানীরই বিভাষা উর্দু। আরবী ও ফার্সী শব্দবহুল এই ভাষা লেখা হয় ফার্সী অক্ষরে। কবি আমীর খসরুকে এই ভাষার অন্যতম আদি লেখক মনে করা হয়। উর্দু উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভাষাগত মিলনের সূত্রপাত করেছিল।

উর্দু ভাষার উদ্ভব

দিল্লীর সুলতানরা ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এই ভাষায় বহু সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থ সুলতানী যুগে রচিত হয়েছিল। আমীর খসরু, হাসান, দেহলবী প্রমুখ কবিরা ফার্সী কাব্য-সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। কিছু কিছু সংস্কৃত গ্রন্থও পারসীক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ফার্সী সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদানরূপে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলির মূল্য অসীম।

ফার্সী সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ

সুলতানী আমলের শাসকেরা শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। এই যুগের শিল্পরীতি হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয় থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই জন্য এই শিল্পরীতিকে ইন্দো-ইসলামী (Indo-Islamic) শিল্প বা স্থাপত্য রীতিরূপে বর্ণনা করা হয়। মুসলমানরা প্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ, মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণকার্যে বহু হিন্দু-শিল্পী নিয়োগ করতেন। অনেক সময় হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপকরণ ব্যবহার করে কিংবা কোন প্রাচীন মন্দিরের পরিবর্তন করে মসজিদ নির্মাণ করা হত। এর ফলেও হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যরীতির মিশ্রণ ঘটেছিল।

শিল্পের উন্নতি ও ইন্দো-ইসলামী শিল্প-রীতির জন্ম

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমান শাসকেরাও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁদের উৎসাহ ও আনুকূল্যে জৌনপুর, গুজরাট, মালব, বাংলাদেশ, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পরীতির সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাদেশিক স্থাপত্যরীতির প্রয়োগকৌশলের

প্রাদেশিক শিল্পরীতি

শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মধ্যে জৌনপুরের 'অতালা মসজিদ', আহম্মদাবাদের 'জাম-ই-মসজিদ' ও 'সিদি-সৈয়দ মসজিদ', মালবের মাণ্ডুদুর্গ, 'কামালমৌলা মসজিদ', বাংলাদেশে পাণ্ডুয়ার 'আদিনা মসজিদ' ও একলাখী সমাধিমন্দির, গৌড়ের 'বড় সোনা' ও 'ছোট সোনা' মসজিদ, 'লোটন মসজিদ', 'কদম রসুল', দাক্ষিণাত্যের দৌলতাবাদের 'চাঁদমিনার.' গুলবর্গার 'জাম-ই-মসজিদ', বিজাপুরের গোলগম্বুজ, বিদরের
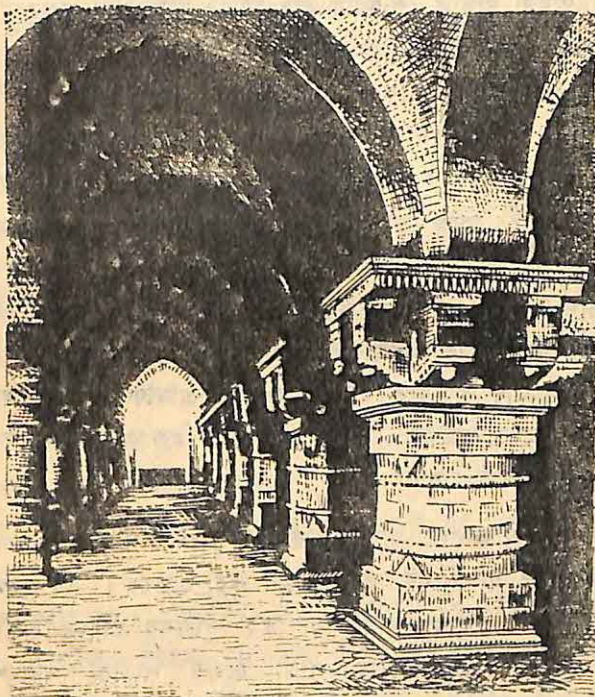
উল্লেখযোগ্য নিদর্শন

আদিনা মসজিদ

মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগের হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শনগুলির বেশীর ভাগই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মেবারের রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ ও কুম্ভলগড় দুর্গ, দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের বিঠ্‌ঠল স্বামীর মন্দির ইত্যাদি হিন্দুরাজাদের শিল্পপ্রীতির স্বাক্ষর বহন করছে।

হিন্দুরাজাদের শিল্পপ্রীতি

সুলতানী যুগের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক তথ্যের অভাব থাকলেও

সাম্রাজ্য যে অতুল সম্পদশালী ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি বা ধনসম্পত্তির সুষম বণ্টন সম্বন্ধে কোন সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা করা হয়নি। আমীর-ওমরাহদের হাতে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত ছিল। সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। অবশ্য জিনিসপত্রের দাম খুব সস্তা থাকায় সাধারণভাবে তাদের অভাব-অনটন কম ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোন কারণে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব দেখা দিলে প্রজাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠত। স্বৈরাচারী সুলতানী শাসন-ব্যবস্থায় জনকল্যাণমূলক নীতি গ্রহণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্দশার সীমা থাকত না। কৃষিকার্য ছিল অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা। শহরে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের প্রচলন ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হিন্দু বণিকদের প্রাধান্য ছিল। বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, তিব্বত, ভুটান প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে স্থলপথেও ব্যবসা-বাণিজ্য হত। সামগ্রিকভাবে প্রাচুর্য ও অভাব, ধনী ও দরিদ্রের পাশাপাশি অবস্থান ছিল সুলতানী যুগের অর্থনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য। গ্রামীণ অর্থনীতি স্বনির্ভর হওয়ায় গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনে নাগরিক জীবনের জটিলতা ছিল না। রাজনৈতিক আবর্তের সঙ্গেও তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না।

অর্থনৈতিক জীবন

বৈদেশিক বাণিজ্য

মুসলমান আক্রমণের প্রতিক্রিয়ারূপে হিন্দু ধর্ম ও সমাজে যে রক্ষণশীলতা দেখা দিয়েছিল ইতিপূর্বেই তার উল্লেখ করা হয়েছে। এই যুগে হিন্দু ও মুসলমান দুই সমাজেই পুরুষের প্রাধান্য ছিল। সম্মান ও মর্যাদার পাত্রী হলেও নারীরা পর্দানশীন হয়ে উঠেছিল। অবরোধপ্রথা কঠোরতর হওয়ার মূলে ছিল বৈদেশিক, বিশেষ করে মোঙ্গল আক্রমণের ফলে সৃষ্ট আশঙ্কার মনোভাব। ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সতীদাহ প্রথা এবং বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের রীতিনীতি এবং আচার-ব্যবহার কিছুটা পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

সামাজিক অবস্থা

মুঘল যুগ ঃ মুঘল যুগে ভারতীয় সমাজবিন্যাসের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। সমাজের শীর্ষে ছিল আমীর-ওমরাহ এবং উচ্চপদমর্যাদার রাজপুরুষেরা। তারপর ছিল প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত মধ্যবিত্ত

শ্রেণী। সর্বনিম্নে ছিল বিত্তহীন সাধারণ মানুষ। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ব্যয়বহুল আড়ম্বর, বিলাসিতা, স্বেচ্ছাচার ও দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেও সাধারণতঃ তাদের জীবনযাত্রা ছিল সংযত। নিম্ন-শ্রেণীভুক্ত জনসাধারণের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না।

সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস

মুসলমান শাসনের সূচনাকাল থেকে হিন্দু ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতা দেখা দিয়েছিল তার ফলে কালক্রমে সামাজিক অনুশাসন আরও কঠোর হয় ও পণপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি কুপ্রথার ব্যাপক প্রচলন হয়।

হিন্দু সমাজের অবস্থা

হিন্দুজীবন ও সমাজ, বিশেষ করে জাতিভেদ প্রথা, মুসলমান সমাজকেও প্রভাবিত করেছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মুঘল যুগের মুসলমান সমাজ প্রকৃতপক্ষে দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। উচ্চ শ্রেণী-ভুক্ত লোকেরা 'সরিফ' এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা 'অজলাফ' নামে পরিচিত ছিল। সৈয়দ (শিক্ষাক্ষেত্রে নিযুক্ত), মুঘল-পাঠান (যোদ্ধা), শেখ (সম্মানজনক বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত) ইত্যাদিরা ছিল 'সরিফ' বা ওপর তলার মানুষ। কৃষিজীবী, ক্ষুদ্র কারিগর, কশাই, ঝাড়ুদার প্রভৃতি নিম্ন কাজে নিযুক্ত লোকেরা ছিল 'অজলাফ' বা নীচের তলার মানুষ। সামগ্রিকভাবে মুসলমান সমাজের শিক্ষা, আচার-ব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গীতে এই শ্রেণীবিভাগের ছাপ সুস্পষ্ট ছিল।

মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রভাব

মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ছিল কৃষিপ্রধান ও গ্রামভিত্তিক। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামাজিক উৎসব, প্রাথমিক শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি সব কিছুর কেন্দ্র ছিল গ্রাম। কৃষিপদ্ধতি ছিল সহজ ও সরল। জমি ছিল উর্বর ও প্রচুর। সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল বিশাল, কিন্তু জনসংখ্যা ছিল কম। চাষবাসের উপযোগী জমির তুলনায় কৃষকের অভাব ছিল। অরণ্যাঞ্চল ও জলের কোন অভাব না থাকায় গবাদি পশুপালনের খুব সুবিধা ছিল। জমির মূল্য কম হওয়ায় জমির মালিকানা লাভের জন্য তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। বেকার সমস্যা ছিল না। কিন্তু আপাতপ্রাচুর্য সত্ত্বেও কৃষকদের অবস্থা ভাল ছিল না। প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং অনেক সময় রাজপুরুষদের উৎপীড়নের

কৃষিকর্ম ও গ্রাম্য জীবন

ফলে কৃষকদের দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হত। গ্রাম্য শাসন বহুলাংশে স্বনির্ভর ছিল। গ্রামের জীবনে পুরোহিত, দৈবজ্ঞ এবং শিক্ষকের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

মুঘল যুগের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিনির্ভর হলেও শিল্প-বাণিজ্যও উন্নত ছিল। ভারতীয় সুতী ও রেশমের বস্ত্র, সোনারূপার সৌখিন ও সূক্ষ্ম সামগ্রী, অলঙ্কার ইত্যাদি দেশে-বিদেশে সমাদৃত হত। ভারতে নির্মিত জাহাজ ও নৌকার মান ছিল খুব উন্নত। রপ্তানি-বাণিজ্য উন্নত হওয়ায় ভারতে প্রচুর বিদেশী সোনা ও রূপা আমদানি হত। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের গোয়া, কালিকট, কোচিন, সুরাট, ব্রোচ, দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের মসুলিপত্তম এবং পূর্ব ভারতের চট্টগ্রাম, শ্রীপুর, সোনার গাঁও, সপ্তগ্রাম ইত্যাদি ছিল প্রসিদ্ধ বন্দর। ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা, লাহোর, আহম্মদাবাদ, বারাণসী, পাটনা, ঢাকা, রাজমহল, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, হুগলী ইত্যাদি ছিল সমৃদ্ধিশালী শহর। খাবার-দাবার ও জিনিসপত্রের দাম ছিল খুবই কম। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে এক টাকায় ৫০ সের চাল এবং প্রায় ২০ সের চিনি পাওয়া যেত। ঘিয়ের দাম ছিল টাকায় ১০ সের, নুন ছিল টাকায় ৬৭ সের। কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে লোকের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা ছিল খুবই কম।

শিল্প-বাণিজ্য

জিনিসপত্রের সুলভ মূল্য

সুলতানী শাসনব্যবস্থার মত মুঘল শাসনব্যবস্থাও ছিল সামরিক শক্তিনির্ভর ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র। রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন বাদশাহ। শাসনতন্ত্রের সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। মুঘল শাসনব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আকবর। তিনি এবং তাঁর পরবর্তী মুঘল সম্রাটরা মুসলমান জগতের প্রধান 'খলিফার' আনুগত্য স্বীকার করেননি এবং মুঘল সাম্রাজ্যকে বৃহত্তর ঐশ্লামিক সাম্রাজ্যের অংশ বলে মনে করেননি। আকবর ভারতে সকল জাতি ও ধর্মের মানুষকে সমানাধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ ও উদারনীতি দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সংস্পর্শ ও মিলনের ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত করেছিল। জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান আকবরের মহান্ নীতি ঠিকমত অনুসরণ না করলেও সম্পূর্ণ বর্জন করেননি। ধর্মান্ধ ঔরংজীব এই নীতি স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করে নিজের এবং মুঘল সাম্রাজ্যের বিপর্যয় ডেকে এনেছিলেন। কিন্তু তিনিও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নিজের ভুল বুঝতে

মুঘল শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

পেরে বলেছিলেন, 'ধর্মের সঙ্গে জাগতিক ব্যাপারের কি সম্পর্ক আছে? গোঁড়ামিই বা কেন ধর্মীয় ব্যাপারে প্রবেশ করবে? তোমার জন্য তোমার, আমার জন্য আমার ধর্ম রয়েছে।'

সুলতানী আমল থেকে যে হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও সমন্বয় সুরু হয়েছিল মুঘল যুগে তার আরও অগ্রগতি হয়। খাদ্য, বেশভূষা, শিষ্টাচার প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে দুই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য গড়ে ওঠে। দুই ধর্মাবলম্বী লোকেরা পরস্পরের উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে থাকে। গ্রামীণ জীবনে এই মেলামেশা আরও ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ ছিল। সরকারী কাজকর্মে সর্বত্র পারসীক ভাষার ব্যবহার, উর্দু ভাষার প্রচলন ও একই মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তন রাষ্ট্রীয় সংহতি স্থাপনে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল।

পারস্পরিক সম্পর্ক ও রাষ্ট্রীয় সংহতি

মুঘল যুগে হিন্দুরা যেমন অনেকে ফার্সী ভাষা চর্চা করতে থাকে তেমনি মুসলমানরাও সংস্কৃত চর্চায় আগ্রহী হয়। ভারমল, ভীমসেন, সুজন রায়, ঈশ্বরদাস নাগর প্রমুখ হিন্দু লেখকরা ফার্সী বা পারসীক ভাষায় সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মালিক মহম্মদ জয়সী, 'রসখান', 'খানখানান', আবদুর রহিম প্রভৃতি মুসলমান লেখকরা হিন্দী সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন করেছিলেন। তাছাড়া উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভগবদ্গীতা ইত্যাদি ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। হিন্দু জ্যোতিষবিদ্যা সম্বন্ধেও মুসলমানরা বিশেষ আগ্রহী ছিল। মুঘল বাদশাহরা সকলেই সাহিত্য ও সুকুমার শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। বাবর তুর্কী ভাষায় আত্মজীবনী ও কবিতা লিখেছিলেন। তিনি ফার্সী ভাষাও ভাল জানতেন। হুমায়ুন ছিলেন সাহিত্যরসিক, ভাববিলাসী, জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যানুসন্ধানী। শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে আকবরের গভীর আগ্রহের কথা সুবিদিত। জাহাঙ্গীর সাহিত্য, শিল্প এবং বিশেষ করে চিত্রকলার অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শাহজাহানের সময়ও ফার্সী ভাষায় কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। অবশ্য তাঁর স্থাপত্যকীর্তির জন্যই শাহজাহান অধিকতর প্রসিদ্ধ। দারা সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। ঔরংজীবও ছিলেন সুপণ্ডিত ও উত্তম গদ্যলেখক, যদিও তাঁর সাহিত্য বা সুকুমারশিল্পের প্রতি অনুরাগ ছিল না। সম্রাট বাহাদুর শাহ উর্দু ও ব্রজভাষার সুকবি ছিলেন। এছাড়া বাবরের কন্যা

পরস্পরের ভাষা ও সাহিত্যচর্চা

মুঘলদের সাহিত্য ও সুকুমার শিল্পপ্রীতি

গুলবদন, শাহজাহানের কন্যা জাহানারা, ঔরংজীবের কন্যা জেবউন্নিসার সাহিত্য-প্রতিভা ছিল।

রাজপরিবার এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাহিত্যানুরাগ মুঘল যুগে সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ঐতিহাসিক আবুল ফজল, আবদুল হামিদ লাহোরী, বদায়ুনী, ফিরিস্তা, খাফি খাঁ (মুহম্মদ হাসিম) প্রভৃতির মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ এই যুগে লেখা হয়েছিল। কবি ফৈজী ছিলেন আকবরের সভাসদ্‌। হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ কবি তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' ও আগ্রার অন্ধ কবি সুরদাসের কবিতাবলী মুঘল আমলে রচিত হয়েছিল। এই যুগেই কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। সপ্তদশ শতকে মুসলমান কবি আলাওল বাংলায় 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। মুঘল যুগে মারাঠী ভাষার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। রামদাস, তুকারাম, বামন, মহীপতি, ময়ূর পণ্ডিত, সেখ মহম্মদ প্রভৃতির রচনা মারাঠী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করে। প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে প্রতিটি প্রাদেশিক ভাষা ছিল ঐ অঞ্চলের জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের জীবন ও মননের ধারক ও বাহক।

ফার্সীসাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ

হিন্দী সাহিত্য

বাংলা সাহিত্য

মারাঠী সাহিত্য

মুঘল সম্রাটরা এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলার অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় সুকুমার শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি শিল্পোন্নতির সহায়ক হয়েছিল। ভারতীয় ও পারসীক শিল্পরীতির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছিল বলে মুঘল স্থাপত্যরীতি ইন্দো-পারসীক (Indo-Persian) শিল্প নামে পরিচিতি লাভ করেছে। হুমায়ুনের সমাধি, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি ও দিল্লীর প্রাসাদ দুর্গ, সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি, ইতমদ্দৌলার সমাধি, আগ্রা দুর্গাভ্যন্তরে দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, শীসমহল, মোতি মসজিদ, জাম-ই-মসজিদ, অন্যান্য স্থানের মুঘল প্রাসাদ, সৌধ, মসজিদ এবং সর্বোপরি তাজমহল মুঘল শিল্পোৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ইন্দো-পারসীক শিল্প

মুঘল আমলে চিত্রশিল্পেরও অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্পের মত মুঘল চিত্রকলাতেও ভারতীয় ও পারসীক রীতির সমন্বয়

ঘটেছিল। আকবর চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আমলের খ্যাতিমান চিত্রশিল্পীর মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে চিত্রশিল্পের সমঝদার ও গভীর অনুরাগীরূপে জাহাঙ্গীর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। রাজপুতানার রাজারাও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং এর ফলে রাজপুত চিত্রকলা-রীতির উদ্ভব হয়। পাঞ্জাবের পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলে আর একটি পাহাড়ী চিত্রকলার সৃষ্টি হয়েছিল। এই রীতিটি কাংড়া চিত্ররীতি নামে খ্যাত হয়। মুঘল যুগের বিভিন্ন চিত্রশিল্পরীতিতে হিন্দু ও মুসলমান অঙ্কনরীতি ও পরিকল্পনার সমন্বয় ঘটেছিল।

চিত্রশিল্প

রাজপুত চিত্রকলা

কাংড়া চিত্রকলা
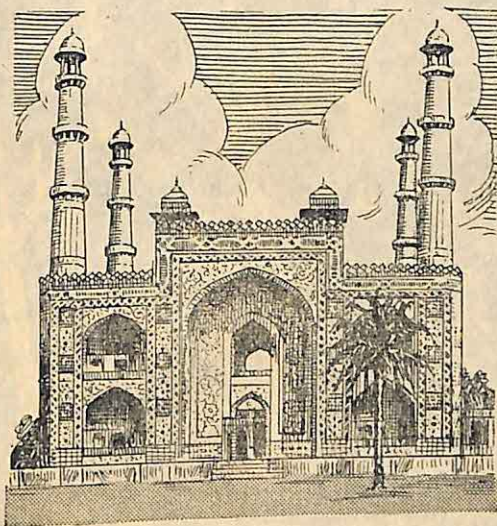
সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি

মুঘল সম্রাটরা সঙ্গীতরসিক ছিলেন। আকবরের রাজসভায় বহু সঙ্গীত-শিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তানসেন এবং বজবাহাদুর। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান দুজনেই সঙ্গীতচর্চা করতেন এবং সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঔরংজীব সঙ্গীতকে ইসলাম-বিরোধী মনে করতেন বলে সঙ্গীতচর্চা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

সঙ্গীত

রাজপুত চিত্রকলা

ধর্মচিন্তার সমন্বয়

পূর্ববর্তী যুগ থেকে ধর্মচিন্তা ও সাধনার ক্ষেত্রে যে সমন্বয়-প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছিল মুঘল যুগেও তা অব্যাহত ছিল। আকবরের 'দীন ইলাহী' ছিল ধর্মীয় ঐক্য ও সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি। ষোড়শ শতকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের আর এক ধর্মগুরু **দাদু দয়াল** গভীরভাবে সুফীবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দাদু বলেছিলেন, 'হে আল্লা রাম, আমার মনের ভ্রম দূর হয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমানে কোনও পার্থক্য নেই। তুমি রাম, তুমিই রহিম, তুমি কেশব, তুমিই করিম।' এইরূপে সমন্বয়ধর্মী চিন্তাধারা ও সুফীবাদ মুঘল যুগে শাসক-শাসিত, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে নিকটতর করে তুলতে সাহায্য করেছিল। সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই এই সমন্বয়ের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এক বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্যের স্রষ্টা এবং উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও বিরোধী মনোভাব সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হয়নি।

বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে মুঘল ভারত

বিভিন্ন মুঘল সম্রাটদের শাসনকালে যে সব বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তাঁদের বিবরণ থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। এঁদের মধ্যে আকবরের রাজত্বকালে ইংরাজ ভ্রমণকারী রলফ্ ফিচ্, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ক্যাপ্টেন হকিন্স ও স্যার টমাস রো, ঔরংজীবের রাজত্বকালে ফরাসী ব্যবসায়ী টেভার্নিয়ে ও চিকিৎসক বার্নিয়ে প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফিচ্ আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রিকে লণ্ডন নগরী অপেক্ষা বৃহত্তর বলে বর্ণনা করেছেন। হকিন্স মুঘল রাজসভার আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য দেখে অবাক হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন যে মুঘল রাজকর্মচারীদের অনেকেই ঘুষ নিত। পথঘাট নিরাপদ ছিল না। স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের রাজসভার বিলাসব্যসন, জাঁকজমকের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে মুঘল সম্রাট পারস্য বা তুরস্কের সম্রাটের চেয়েও বিত্তশালী ছিলেন। কিন্তু দেশের সাধারণ কৃষকদের অবস্থা ভাল ছিল না। আভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় ছিল না। দেশে কোন লিখিত আইন ছিল না। সম্রাটের নির্দেশে রাজ্য-শাসন চলত। রো জাহাঙ্গীরের বুদ্ধি ও ন্যায়বিচারের প্রশংসা করেছেন। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রটন ও কার্টরাইট নামে দুজন ইংরাজ ব্যবসায়ী বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁরা বাঙালীদের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে প্রশংসাবাচক উল্লেখ

করেছেন। ক্রুটন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরকে দেশের এক বিশিষ্ট ধর্মস্থান বলে বর্ণনা করেছেন। আকবরের শাসনকাল পর্যন্ত এই মন্দিরের ওপর কোনও কর ধার্য করা হয়নি। ক্রুটন উড়িষ্যার শ্রমজীবীদের দক্ষতার প্রশংসা করেছেন। বাঙালী কারিগরদের নৈপুণ্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে মুঘল-ভারতের জীবনযাত্রার এক চিত্তাকর্ষক পরিচয় পাওয়া যায়।

একাদশ অধ্যায়

মারাঠা ও শিখশক্তি

মারাঠাশক্তির উত্থান ও পতন

ভারতবর্ষের পশ্চিমে সাতপুরা, সহ্যাদ্রি, বিন্ধ্য পর্বতমালা এবং নর্মদা ও তাপ্তী নদীবেষ্টিত মহারাষ্ট্র দেশ এবং মারাঠাজাতির ইতিহাস সুপ্রাচীন ও গৌরবময়। প্রকৃতির দ্বারা সুরক্ষিত মহারাষ্ট্রের অসংখ্য পর্বতচূড়া স্বাভাবিক দুর্গের মত হওয়ায় বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের খুব সুবিধা ছিল। পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলের স্বাভাবিক প্রতিকূলতার মধ্যে মানুষ হওয়ায় মারাঠীরা ছিল কঠোর পরিশ্রমী ও আত্মনির্ভরশীল। প্রাচীন যুগে মহারাষ্ট্র অঞ্চল যথাক্রমে সাতবাহন, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট ও যাদব বংশের রাজ্যভুক্ত ছিল। আলাউদ্দীনের সময় এই অঞ্চলে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে বাহমনী পরে আহম্মদনগর ও বিজাপুরের সুলতানদের রাজ্য ও রাজনীতিতে মারাঠাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। কিন্তু মারাঠাজাতির প্রকৃত অভ্যুত্থান হয় সপ্তদশ শতকে শিবাজীর নেতৃত্বে।

মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান

প্রাচীন ইতিহাস

মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান মারাঠা জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সহায়ক হয়। তাছাড়া একনাথ, তুকারাম, রামদাস, বামনপণ্ডিত প্রমুখ ধর্মসংস্কারকদের জীবন ও শিক্ষা মারাঠীদের মধ্যে সাম্য-ভাব, স্বদেশপ্রেম ও ঐক্যবোধের সঞ্চার করে। মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে এই ঐক্যচেতনা আরও সুদৃঢ় হয়। সর্বোপরি শিবাজীর অসাধারণ সামরিক ও সংগঠনী প্রতিভা, বীরত্ব ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সপ্তদশ শতকে মারাঠাশক্তিকে সুসংহত ও জাগ্রত করে।

মারাঠা জাতীয়তা-বাদের উন্মেষের কারণ

১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৬৩০) পুণা জেলার অন্তর্গত শিবনের পার্বত্য দুর্গে **শিবাজীর** জন্ম হয়। তাঁর পিতা শাহজী ছিলেন আহম্মদনগরের সুলতানের একজন সেনানায়ক ও জায়গীরদার। মাতা জীজাবাঈ-এর স্নেহ-যত্নে ও পিতার বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ কর্মচারী দাদাজী কোণ্ডদেবের অভিভাবকত্বে শিবাজী বড় হয়েছিলেন। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ কিশোর শিবাজীর স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষে স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

শিবাজী (১৬২৭।৩০-১৬৮০)

কৃতসঙ্কল্প শিবাজী পার্বত্য মাওলিজাতীয় কৃষকদের নিয়ে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল গঠন করেন এবং দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর সুলতানী রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রথমে তোরণা দুর্গ জয় (১৬৪৬) করেন ও পরে রায়গড়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এরপর তিনি বিজাপুর রাজ্যের আরও কিছু অঞ্চল জয় করলে বিজাপুরের ক্রুদ্ধ ও শঙ্কিত সুলতান শিবাজীর পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করেন। বিজাপুর রাজ্য আর আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিবাজী পিতাকে মুক্ত করেন। কিন্তু সাময়িক বিরামের পর শিবাজী আবার রাজ্য জয়ে উদ্যোগী হন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি পুরন্দর ও জাউলীর দুর্গ, রায়গড় এবং কোঙ্কনের উত্তরাংশ জয় করেন।

সৈন্যদল গঠন ও তোরণা দুর্গ জয় (১৬৪৬)

পুরন্দর ও জাউলীর দুর্গ জয় ও অন্যান্য সাফল্য

শিবাজী যখন নিজের রাজ্যবিস্তারে সচেষ্ট সেই সময় দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবাদার ঔরংজীব বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। শিবাজী বিজাপুরের পক্ষ নিয়ে মুঘলদের আক্রমণ করায় ঔরংজীব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করায় ঔরংজীব শিবাজীকে সম্পূর্ণরূপে দমন করার সুযোগ পাননি। বিজাপুরের সুলতানও শিবাজীর রাজ্য ও ক্ষমতাবৃদ্ধিতে অসন্তুষ্ট এবং উদ্বিগ্ন ছিলেন। মুঘল আক্রমণ থেকে অব্যাহতি

ঔরংজীবের সঙ্গে বিরোধের সূচনা

বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে সংঘর্ষ

পাবার পর তিনি শিবাজীকে দমন করার উদ্দেশ্যে সেনাপতি **আফজল খাঁকে** প্রেরণ করেন (১৬৫৯)। শিবাজী প্রতাপগড় দুর্গে আশ্রয় নেন। শেষ পর্যন্ত দুজনের সাক্ষাৎকারের সময় শিবাজী বাঘনখের দ্বারা কেমন করে আফজল খাঁকে নিহত করেছিলেন সে বিতর্কমূলক কাহিনী সুবিদিত। সেনাপতির শোচনীয় মৃত্যুতে বিজাপুরবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে শিবাজী দক্ষিণ কোঙ্কন ও কোলহাপুর অধিকার করে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন।

আফজল খাঁর মৃত্যু (১৬৫৯) ও বিজাপুর বাহিনীর পরাজয়

দুঃসাহসী শিবাজীর শত্রুতার কথা ঔরংজীব বিস্মৃত হননি। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সিংহাসনে বসার অল্পকাল পরেই তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার **শায়েস্তা খাঁকে** শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শায়েস্তা খাঁ প্রথম দিকে কিছু সাফল্যলাভ করলেও শেষ পর্যন্ত সুচতুর শিবাজীর কাছে পরাজিত হন (১৬৬৩)। পরের বছর পশ্চিম ভারতের সমৃদ্ধিশালী বন্দর সুরাট লুণ্ঠন করে শিবাজী প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। তখন ঔরংজীব দুজন সুযোগ্য মুঘল সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে শিবাজীকে দমন করার দায়িত্ব দেন। জয়সিংহের কূটবুদ্ধি এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে শিবাজী মুঘলদের সঙ্গে **পুরন্দরের সন্ধি** (১৬৬৫) করতে বাধ্য হন। সন্ধির সর্তানুসারে শিবাজী মুঘল সম্রাটকে কয়েকটি দুর্গ, কিছু অঞ্চল ও বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হন।

মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষ

শায়েস্তা খাঁর পরাজয় (১৬৬৩)

কিছুকাল পরে জয়সিংহের পরামর্শে শিবাজী আগ্রায় ঔরংজীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু রাজদরবারে উপযুক্ত মর্যাদা না পাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে ঔরংজীব শিবাজীকে কারারুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত কৌশলে কারাগার থেকে পলায়ন করে শিবাজী স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজীব তাঁকে 'রাজা' বলে স্বীকৃতি দিলেও মুঘল-মারাঠা শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অতঃপর শিবাজী তাঁর হৃত দুর্গগুলি পুনরুদ্ধার এবং দ্বিতীয়বার সুরাট লুণ্ঠন করেন। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ছত্রপতি' ও 'গোব্রাহ্মণপালক' উপাধি গ্রহণ করেন এবং রায়গড়ে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে তিনি জিঞ্জি, ভেলোর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অধিকার করেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়।

মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষের পুনরারম্ভ

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক (১৬৭৪)

মৃত্যু (১৬৮০)

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শিবাজী শাসন ও সামরিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের নিয়ামক নিজে হলেও **'অষ্টপ্রধান'** নামে খ্যাত আটজন মন্ত্রীর সাহায্যে শিবাজী রাজ্য পরিচালনা করতেন। এই আট জনের মধ্যে প্রথম ছিলেন **'পেশোয়া'** বা প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তী কালে পেশোয়াই মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠেন। শিবাজী-প্রবর্তিত প্রাদেশিক শাসন ও রাজস্বব্যবস্থা ছিল সুপরিকল্পিত। মারাঠা রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে শিবাজী **চৌথ** (রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ) এবং **সরদেশমুখী** (রাজস্বের এক-দশমাংশ) নামে দুই প্রকার কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

শিবাজীর শাসনব্যবস্থা

সামরিক সংগঠনে শিবাজী মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। সুরক্ষিত পার্বত্য দুর্গগুলি ছিল মারাঠা সামরিক শক্তির প্রধান কেন্দ্র। শিবাজীর সৈন্যবাহিনী 'পদাতিক' ও 'অশ্বারোহী' এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। **'বারগীর'** ও **'শিলাদার'** নামে দুই শ্রেণীর অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। 'বারগীর'রা অশ্ব, অস্ত্র-শস্ত্র ও পরিচ্ছদ পেত সরকার থেকে। 'শিলাদার'রা নিজেরাই এই সব উপকরণ সংগ্রহ করতো। শিবাজী 'বারগীর'দের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেছিলেন। মারাঠা নৌবহর সৃষ্টি করে শিবাজী তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন।

সামরিক সংগঠন

বারগীর ও শিলাদার

শিবাজীর সময় এই নৌবাহিনী বিশেষ শক্তিশালী না হলেও পরবর্তী কালে আংগ্রিয়া সর্দারের নেতৃত্বে এই নৌবাহিনীই ইংরাজ, পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের জলপথে বাধা দিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে মুঘল সম্রাটরা কিন্তু সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নৌবাহিনীর অসীম গুরুত্ব তেমন উপলব্ধি করতে পারেননি।

নৌবাহিনী

দুর্জয় সাহস, অসীম মনোবল, স্থির প্রত্যয় এবং অসাধারণ সামরিক ও সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী শিবাজী মানুষ হিসাবেও মহান্ ছিলেন। সারা জীবন মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেও তিনি কখনও ইসলাম ধর্মের অমর্যাদা করেননি। পরধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁর উদার মনোভাব সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।

শিবাজীর চরিত্র

নারীজাতির প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার ছিল তাঁর চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য। শিবাজীর আদর্শ ও দেশপ্রেম আধুনিক যুগে বহু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

শম্ভুজী (১৬৮০-১৬৮৯)

শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী **শম্ভুজী** (১৬৮০-১৬৮৯) ঔরংজীবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে আশ্রয় দেওয়ায় মুঘল সম্রাট স্বয়ং মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। পিতার মত সুযোগ্য ও সচ্চরিত্র না হলেও শম্ভুজী নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মুঘলদের হাতে বন্দী ও নিহত হন (১৬৮৯)। তাঁর শিশুপুত্র শাহুকে মুঘলরা বন্দী করে রাখে এবং রাজধানী রায়গড়সমেত বহু মারাঠা দুর্গ তারা অধিকার করে নেয়।

রাজারাম (১৬৮৯-১৭০০)

মহারাষ্ট্রের এই চরম সঙ্কটমুহূর্তে শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র **রাজারাম** (১৬৮৯-১৭০০) জিঞ্জি দুর্গে আশ্রয় নিয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। এই সময় সান্তাজী ঘোরপাড়ে ও ধনজী যাদব নামে দুজন মারাঠা সেনাপতি বারবার আক্রমণ করে মুঘলবাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। শেষ পর্যন্ত জিঞ্জি, সাতারা ও অন্যান্য দুর্গ জয় করেও ঔরংজীব মারাঠাদের স্বাধীনতাস্পৃহা ও মনোবল জয় করতে পারেননি।

তৃতীয় শিবাজী (১৭০০-১৭১২)

রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী **তারাবাঈ** নাবালক পুত্র **তৃতীয় শিবাজীকে** সিংহাসনে স্থাপন করে মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। মারাঠা প্রতি-আক্রমণ কেবল মাত্র দাক্ষিণাত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত গুজরাট, মালব, বেরার প্রভৃতি অঞ্চল আক্রমণ ও লুঠ করে। শিবাজী মুঘলদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন প্রতিকূল অবস্থা ও বিপর্যয়ের মধ্যেও তাঁর উত্তরাধিকারীরা তা অব্যাহত রেখেছিলেন। প্রায় অর্ধশত বছর ধরে অকাতরে অর্থক্ষয় ও লোকক্ষয় করেও ঔরংজীব মারাঠাশক্তিকে দমন করতে পারেননি।

মারাঠা দমনে ঔরংজীবের ব্যর্থতা

ঔরংজীবের মৃত্যুর পর শম্ভুজীর পুত্র **শাহু** দীর্ঘকালের বন্দীদশা হতে মুক্তি পান। এই মুক্তিদানের পিছনে মুঘলদের আসল উদ্দেশ্য ছিল মারাঠাদের মধ্যে বিভেদ ও অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করা। তাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। শাহু স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলে তারাবাঈ তাঁর দাবী অস্বীকার করেন।

এই গৃহবিবাদের পরিণতিরূপে কোলহাপুরে তারাবাঈ-এর অভিভাবকত্বে **তৃতীয় শিবাজী** এবং সাতারায় শাহু দুটি স্বতন্ত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তৃতীয় শিবাজীর মৃত্যুর পর (১৭১২) তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা **দ্বিতীয় শম্ভুজী** (১৭১২-১৭৬০) কোলহাপুরের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি লুপ্ত হলে সমগ্র মহারাষ্ট্রে পেশোয়ারাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মারাঠা রাজ্যে গৃহবিবাদ

সাতারায় **শাহু** বা **দ্বিতীয় শিবাজীর** (১৭০৮-১৭৪৯) অধিকার ও কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার মূলে ছিল বালাজী বিশ্বনাথ নামে এক ব্রাহ্মণ কর্মচারীর অসাধারণ যোগ্যতা ও কূটবুদ্ধি। তাঁর কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে শাহু তাঁকে

রেখাঙ্কিত অংশ মারাঠা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত (১৭৬১)

'পেশোয়া' বা প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন (নভেম্বর, ১৭১৩)। বালাজী বিশ্বনাথ এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র প্রথম বাজীরাও নিজেদের বুদ্ধি ও যোগ্যতার বলে 'পেশোয়া'কেই মারাঠা রাজ্যের প্রকৃত শাসক ও ক্ষমতার অধিকারী করে তোলেন। এইভাবে **মহারাষ্ট্রে পেশোয়া-শাসন বা পেশোয়াতন্ত্রের** প্রতিষ্ঠা হয়। পেশোয়ারা পুণা থেকে মারাঠা রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন এবং মারাঠা নৃপতি বা 'ছত্রপতি' প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন হয়ে সাতারার দুর্গে বাস করতে থাকেন।

পেশোয়াতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

পেশোয়া নিযুক্ত হওয়ার অল্পকালের মধ্যে বালাজী **বিশ্বনাথ** রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে মুঘল সম্রাট ফররুখ্‌সিয়ারের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। সন্ধির সর্তানুসারে শাহু দাক্ষিণাত্যের বেরার, খান্দেশ, ঔরঙ্গাবাদ, বিদর, হায়দ্রাবাদ ও বিজাপুর এই ছ'টি সুবার চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করার অধিকার পান। তাছাড়া একদা শিবাজী-শাসিত যে সব অঞ্চল মুঘলরা জয় করে নিয়েছিল সেইগুলি শাহু ফিরে পেলেন। বিনিময়ে মারাঠারাজ মুঘল আনুগত্য স্বীকার করেন। এই সন্ধির ফলে শিবাজীর স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের আদর্শ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও দাক্ষিণাত্যের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এবং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মারাঠাদের প্রভাব ও গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-১৭২০)

মুঘল সম্রাটের সঙ্গে চুক্তি : গুরুত্ব

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **প্রথম বাজীরাও** (১৭২০-১৭৪০) পেশোয়া নিযুক্ত হন। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও সামরিক প্রতিভার অধিকারী প্রথম বাজীরাও-এর লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষে 'হিন্দুপাদশাহী' (সাম্রাজ্য) প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি জয়পুরের দ্বিতীয় জয়সিংহ বুন্দেলরাজ ছত্রসাল প্রভৃতি রাজাদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করেছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও অন্তর্বিরোধও তাঁর পথ সুগম করেছিল। তাঁর নেতৃত্বে মারাঠাবাহিনী মালব ও গুজরাট জয় করে। তাঁর ক্ষমতা, রাজ্যবিস্তার এবং দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত অগ্রগতিতে ভীত হয়ে মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ হায়দ্রাবাদের নিজামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ভূপালের কাছে এক যুদ্ধে (১৭৩৮) নিজামকে পরাজিত

প্রথম বাজীরাও (১৭২০-১৭৪০)

রাজ্যবিস্তার

করে বাজীরাও নর্মদা থেকে চম্বল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় মারাঠা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। পোর্তুগীজদের কাছ থেকে সলসেট ও বেসিন অধিকার (১৭৩৯) তাঁর আর এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। পারস্য সম্রাট নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি যখন হিন্দু-মুসলমানদের সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যস্ত, সেই সময় মাত্র ৪২ বছর বয়সে প্রথম বাজীরাও-এর মৃত্যু হয় (১৭৪০)।

মারাঠা সামন্তরাজ্যের উৎপত্তি

সুনিপুণ সেনানায়ক এবং মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্যতম স্থাপয়িতারূপে প্রথম বাজীরাও প্রসিদ্ধ। চারিত্রিক দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ইত্যাদি নানাবিধ গুণের জন্যও তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কিন্তু জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন ও সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার ব্যাপক প্রসারের ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যের মধ্যে পরবর্তী কালে যে অনৈক্য এবং অন্তর্বিরোধ দেখা দিয়েছিল তার সূচনাও হয়েছিল প্রথম বাজীরাও-এর সময়কালে। শক্তিশালী মারাঠা সেনানায়করা এক একটি অঞ্চলে নিজ নিজ রাজ্য গড়ে তোলেন। এইভাবে নাগপুরে **ভোঁসলা রাজ্য**, গোয়ালিয়রে **সিন্ধিয়া রাজ্য,** বরোদায় **গায়কবাড় রাজ্য,** ইন্দোরে **হোলকার রাজ্য** এবং মালবের অন্তর্গত **পবার রাজ্য** গড়ে ওঠে। সব কয়টি মারাঠা রাজ্যকে ঐতিহাসিকেরা **মারাঠা রাজ্যসঙ্ঘ** (Maratha Confederacy) নামে অভিহিত করেছেন। নামেমাত্র পেশোয়াকে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রধানরূপে স্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি মারাঠা রাজ্য ছিল স্বাধীন। মারাঠা সাম্রাজ্যের মধ্যে এই বিভাগ ও পারস্পরিক বিরোধ ভবিষ্যতে ইংরাজদের সুবিধা করে দিয়েছিল।

বালাজী বাজীরাও (১৭৪০-১৭৬১)

প্রথম বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **বালাজী বাজীরাও** (১৭৪০-১৭৬১) পেশোয়া নিযুক্ত হন। পিতার মত যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল না। মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে ভাড়াটিয়া অ-মারাঠা সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করে তিনি মারাঠা সৈন্যবাহিনীর জাতীয় চরিত্র নষ্ট করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শও বর্জন করেছিলেন। তাঁর সময় মারাঠা সৈন্যরা হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে সকলের ওপর জোরজুলুম লুঠতরাজ করে

অদূরদর্শী নীতি

অর্থ সংগ্রহ করায় রাজপুত এবং অন্যান্য হিন্দু নেতাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা হারিয়েছিল। এই **অপরিণাম-দর্শী নীতির ফলে ভবিষ্যতে মারাঠারা দেশী বা বিদেশী কোন**

শত্রুর বিরুদ্ধে সমগ্র হিন্দু জাতির নেতৃত্বের মর্যাদা ও ভূমিকা থেকে বঞ্চিত হয়।

অন্তর্নিহিত দুর্বলতা সত্ত্বেও বালাজী বাজীরাও-এর সময় মারাঠা সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি হয়েছিল। মহীশূরের একাংশে এবং কর্ণাটকে মারাঠা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে উদ্‌গীরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁর রাজ্যের কিছু অঞ্চল মারাঠাদের দিতে বাধ্য হন। বেরারের মারাঠা নেতা ভোঁসলা বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁকে চৌথ দিতে বাধ্য করেন এবং উড়িষ্যা অধিকার করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা ও বাদশাহের দুর্বলতার সুযোগে মারাঠারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে মারাঠারা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শক্তি ও সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

সাম্রাজ্য বিস্তার

আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের ফলে মুঘল সাম্রাজ্য যখন বিপর্যস্ত সেই সময় আফগান অধিপতি আহম্মদ শাহ দুরানী বারংবার ভারত আক্রমণ করে সিন্ধু, কাশ্মীর ও পাঞ্জাব জয় করেন এবং ঐ অঞ্চলে তাঁর পুত্র তিমুকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু আহম্মদ শাহের অনুপস্থিতির সুযোগে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও-এর ভ্রাতা রঘুনাথ রাও পাঞ্জাব অধিকার করে নেন (১৭৫৮)। এর ফলে আফগান-মারাঠা সংঘর্ষ ঘনিয়ে আসে। পরের বছরই পাঞ্জাব পুনরধিকার করে আহম্মদ শাহ দুরানী মারাঠাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং রোহিলা-নায়ক নজীর খাঁ যোগদান করায় আফগান শক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে মারাঠাদের ওপর বীতশ্রদ্ধ রাজপুতরা নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। শিখরাও নিরপেক্ষ থাকে। আহম্মদ শাহের রণনীতিও ছিল উন্নততর। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের পরিণতিরূপে **পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে** মারাঠাবাহিনী আফগানদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় (১৪ জানুয়ারী, ১৭৬১)। এই যুদ্ধে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও-এর পুত্র বিশ্বাসরাও ও সেনাপতি সদাশিবরাও নিহত হন। তাছাড়া বহু সহস্র মারাঠা সৈন্য নিহত বা বন্দী হয়। এই নিদারুণ বিপর্যয়ের অল্পকালের মধ্যেই পেশোয়া বালাজী বাজীরাও মারা যান।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)

মারাঠা বিপর্যয়

প্রথম ও দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের মত তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধও ভারতীয় ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রথম পানিপথের যুদ্ধে

(১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা করেছিলেন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬) হিমুকে পরাজিত করে আকবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত ও ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করেছিলেন। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে পেশোয়ার নেতৃত্বে ভারতবর্ষে এক অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়। এই যুদ্ধে বিজয়ী আহম্মদ শাহ আবদালী ভারতবর্ষে স্থায়ী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এমন কি পাঞ্জাবে পর্যন্ত আফগানরা নবজাগ্রত শিখজাতিকে দমন করতে পারেননি। কিন্তু তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের শোচনীয় বিপর্যয়ের ফলে মারাঠাদের মনোবল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পেশোয়া প্রথম মাধবরাও এবং মহাদাজী সিন্ধিয়া উত্তর ভারতে মারাঠা প্রাধান্য বহুলাংশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেও মারাঠা সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব সম্পূর্ণ উদ্ধার করতে পারেননি। মারাঠাদের দুর্বলতা মহীশূর রাজ্যে হায়দার আলির এবং কালক্রমে সারা ভারতে ইংরাজদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিস্তারের পথ সুগম করে দিয়েছিল।

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

বালাজী বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **প্রথম মাধবরাও** পেশোয়া হন। প্রায় কিশোর বয়সে এবং অত্যন্ত সঙ্কটজনক কালে গুরুদায়িত্বভার বহন করলেও তিনি তাঁর শাসনকালে (১৭৬১-১৭৭২) অসাধারণ বুদ্ধি ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে মারাঠাদের হৃত প্রাধান্য তিনি কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে সফল হয়েছিলেন। নিজামের আক্রমণ প্রতিরোধ, কর্ণাটক অভিযান, হায়দার আলির বিরুদ্ধে সাফল্য এবং ইংরাজ-আশ্রয়াধীন মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের ওপর মারাঠা প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া প্রথম মাধবরাও-এর অকালমৃত্যুতে মারাঠা সাম্রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতিহয়।

পেশোয়া প্রথম মাধবরাও (১৭৬১-১৭৭২)

নানা ফড়নবীশ

প্রথম মাধবরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **নারায়ণরাও** পেশোয়া পদ লাভের অল্পকালের মধ্যে নিজের পিতৃব্য **রঘুনাথরাও**-এর ষড়যন্ত্রে নিহত হন (১৭৭৩)।

রঘুনাথরাও নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু কিছুকাল পর **নানা ফড়নবীশ** নামে এক সুযোগ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তির নেতৃত্বে মারাঠা নায়করা রঘুনাথরাওকে বিতাড়িত করে নারায়ণরাও-এর শিশুপুত্র **দ্বিতীয় মাধবরাওকে** (মাধবরাও নারায়ণ) পেশোয়ার পদে অধিষ্ঠিত করেন। পিতার মৃত্যুর পর এই শিশুর জন্ম হয়েছিল। দ্বিতীয় মাধবরাও-এর আমলে (১৭৭৪-১৭৯৬) মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক ছিলেন নানা ফড়নবীশ।

রাজ্যচ্যুত রঘুনাথরাও বোম্বাই-এর ইংরাজ সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হন এবং সলসেট ও বেসিন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বোম্বাই-এর ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে **সুরাটের সন্ধি** করেন (১৭৭৫)। রঘুনাথরাও ও ইংরাজদের সম্মিলিত বাহিনী পেশোয়ার সৈন্যদলকে একটি যুদ্ধে পরাজিত করে। কিন্তু বাংলার ইংরাজ সরকার বোম্বাই সরকারের নীতি সমর্থনযোগ্য বিবেচনা না করে পেশোয়ার সঙ্গে **পুরন্দরের সন্ধি** করেন (১৭৭৬)। সন্ধির সর্তানুসারে ইংরাজরা সলসেট লাভের বিনিময়ে রঘুনাথের পক্ষত্যাগে স্বীকৃত হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক-মণ্ডলী সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করায় বোম্বাই ও বাংলার ইংরাজ সরকার মিলিতভাবে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু মারাঠারা ইংরাজবাহিনীকে পরাজিত করে তাদের অপমানজনক সর্তে **ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি** (১৭৭৯) স্বাক্ষরে বাধ্য করে। ওয়ারেন হেংস্টিস এই সন্ধির সর্ত স্বীকারে অসম্মত হলে যুদ্ধ পুনরায় সুরু হয়। অবশেষে **মহাদাজী সিন্ধিয়ার** মধ্যস্থতায় মারাঠা ও ইংরাজদের মধ্যে **সলবই-এর সন্ধি** (১৭৮২) স্বাক্ষরিত হলে **প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের** অবসান হয়। দ্বিতীয় মাধবরাও পেশোয়া রূপে স্বীকৃত হন। রঘুনাথ-রাওকে বার্ষিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। ইংরাজরা সলসেট লাভ করে।

দ্বিতীয় মাধবরাও (১৭৭৪-১৭৯৬)

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫-১৭৮২)

সলবই-এর সন্ধি (১৭৮২)

সলবই-এর সন্ধির পর বিভিন্ন অঞ্চলের মারাঠা সামন্তরাজদের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা আরও বৃদ্ধি পায়। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হন মহাদাজী সিন্ধিয়া। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত ও সুসংবদ্ধ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে মারাঠারা এক সুদক্ষ রণনায়ক

মহাদাজী সিন্ধিয়া

ও রাজনীতিজ্ঞকে হারায়। মারাঠা রাজ্যের আর এক নায়ক **নানা ফড়নবীশের** সঙ্গে মহাদাজী সিন্ধিয়ার সদ্ভাব ছিল না। নিজামের রাজ্য হায়দ্রাবাদের কিছু অংশ জয় করে (১৭৯৫) এবং ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতার বিনিময়ে মহীশূর রাজ্যের একাংশ লাভ করে নানা ফড়নবীশ মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন।

নানা ফড়নবীশ

অপুত্রক দ্বিতীয় মাধবরাও-এর মৃত্যুর (১৭৯৬) পর রঘুনাথরাও-এর পুত্র **দ্বিতীয় বাজীরাও** পেশোয়াপদ লাভ করেন। এই সময় মারাঠা নায়কদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ মারাঠা সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে তোলে। নানা ফড়নবীশের মৃত্যুর পর (১৮০০) পেশোয়া রাজ্যের অবস্থা আরও খারাপ হয়। সমসাময়িক জনৈক ইংরাজ রাজকর্মচারী মন্তব্য করেন যে ফড়নবীশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পেশোয়া দরবারের রাজনৈতিক সংযম ও সুবুদ্ধি লুপ্ত হয়।

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও (১৭৯৬-১৮১৮)

যশোবন্তরাও হোলকারের বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় বাজীরাও পুণা থেকে পলায়ন করেন এবং ইংরাজদের সঙ্গে **বেসিনের সন্ধি** (১৮০২) স্বাক্ষর করে লর্ড ওয়েলেসলি-প্রবর্তিত অধীনতামূলক মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হন। সিন্ধিয়া, ভোঁসলা প্রমুখ মারাঠা সামন্তরাজারা পেশোয়ার এই আত্মমর্যাদাহীন সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেননি। দ্বিতীয় বাজীরাও নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হন। ফলে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে **দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ** সুরু হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সমগ্র জাতির সংকটমুহূর্তেও মারাঠা সামন্তরাজারা স্বার্থ ও বিরোধ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হন। দুই অন্যতম প্রধান মারাঠা নেতা হোলকার ও গায়কবাড় যুদ্ধে যোগদানে বিরত থাকেন। বিচ্ছিন্ন বিভক্ত মারাঠাদের পরাজিত করা আর্থার ওয়েলেসলি (গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির কনিষ্ঠ ভ্রাতা), লর্ড লেক প্রমুখ কুশল ইংরাজ রণনায়কদের পক্ষে দুরূহ হয়নি। দক্ষিণ ভারতে **আসাই আরগাঁও** এবং উত্তর ভারতে **দিল্লী** ও **লাসোয়ারির** যুদ্ধে মারাঠাবাহিনী পরাজিত হয়। ফলে **দেওগাঁও-এর সন্ধির** সর্তানুসারে ভোঁসলা ইংরাজদের উড়িষ্যা অঞ্চল প্রদান করতে বাধ্য হন। অন্য দিকে সিন্ধিয়া **সুরজী অঞ্জনগাঁও**-এর

বেসিনের সন্ধি (১৮০২): পেশোয়ার ইংরাজ অধীনতা স্বীকার

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮০৩-১৮০৫)

বিভিন্ন যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়

সন্ধি স্বাক্ষর করে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে ইংরাজ প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমও মারাঠা আশ্রয় ত্যাগ করে কোম্পানীর আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। এইভাবে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে মারাঠা শক্তি ও সাম্রাজ্যের বিপর্যয় ঘটে।

দেওগাঁও ও সুরজী অঞ্জনগাঁও-এর সন্ধি (১৮০৩)

সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার পরাজয়ের পরিণামে উদ্বিগ্ন হয়ে যশোবন্তরাও হোলকার ভরতপুরের জাঠ রাজার সহযোগিতায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (১৮০৪)। কিন্তু **দীগের যুদ্ধে** তিনিও পরাজিত হন। লর্ড লেক ভরতপুর অবরোধ করলেও অধিকার করতে ব্যর্থ হন (১৮০৫)। যুদ্ধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্বেই গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হওয়ায় হোলকার সম্পূর্ণ পরাজয়ের অবমাননা থেকে অব্যাহতি পান।

হোলকারের পরাজয় (১৮০৪)

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় থেকেই পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর ইংরাজ-বিরোধী মনোভাব ও সন্দেহজনক গতিবিধির জন্য ইংরাজ সরকার তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। যুদ্ধের পরও ইংরাজ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গভর্নর-জেনারেল লর্ড ময়রা বা লর্ড হেস্টিংস (১৮১৩-১৮২৩) তাঁকে আরও কঠোর এবং অমর্যাদাকার চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। এর ফলে দ্বিতীয় বাজীরাও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। ইংরাজদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তারে সিন্ধিয়া, ভোঁসলা, হোলকার প্রভৃতি মারাঠা সামন্তরাজারাও খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত লর্ড হেস্টিংসের পিণ্ডারীদমনে ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে পেশোয়ার বাহিনী পুণার নিকটবর্তী কির্কির বিরাট দূতাবাস আক্রমণ করলে **তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ** আরম্ভ হয় (১৮১৭)। কিন্তু মারাঠা নায়করা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে না পারায় ইংরাজদের পক্ষে জয় লাভ করা কঠিন হয়নি। কির্কি আক্রমণ ব্যর্থ হয়। নাগপুরের কাছে **সিতাবলদিতে** ভোঁসলার সৈন্যবাহিনীর এবং **মাহিদপুরের** যুদ্ধে হোলকার-বাহিনী ইংরাজ সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়। পরিশেষে **কোরেগাঁও** এবং **অষ্টির** যুদ্ধে পুনরায় পরাজিত হয়ে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরাজদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে (১৮১৮) তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হয়। পেশোয়ার

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮১৭-১৮১৮)

মারাঠাদের পরাজয় ও পেশোয়ার আত্মসমর্পণ

পদ বিলোপ করা হয়। দ্বিতীয় বাজীরাওকে বার্ষিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করে কানপুরের কাছে বিঠুরে নির্বাসিতের জীবনযাপনে বাধ্য করা হয়। সাতারার সিংহাসনে শিবাজীর বংশধর প্রতাপসিংহ অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু পেশোয়ার রাজ্যের বৃহত্তর অংশ ইংরাজ-অধিকারভুক্ত হয়। ভোঁসলা ও হোলকার নিজ নিজ রাজ্যের কিছু অংশ ইংরাজদের প্রদান করে তাদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা স্থাপন করেন। সিন্ধিয়ার প্রভাবাধীন রাজপুত রাজ্যগুলিও ইংরাজদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হওয়ায় রাজপুতানায় বৃটিশ অধিকার বিস্তৃত হয়।

মারাঠা শক্তির পতন

মারাঠা শক্তি ও সাম্রাজ্যের পতন ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত সুদৃঢ় করে। এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির পরাজয়ের ফলে ভারতে নিরঙ্কুশ ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রায় নিষ্কণ্টক হয়ে পড়ে।

শিখজাতির অভ্যুত্থান

শিখধর্মের প্রবর্তক **গুরু নানক** (১৪৬৯-১৫৩৮) দেশে-বিদেশে বিভিন্ন স্থান পর্যটনের পর পাঞ্জাবের কর্তারপুরে স্থায়ীভাবে বাস করে ধর্মপ্রচার ও নতুন সম্প্রদায় গড়ে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। নানকের পরবর্তী গুরুদের সুযোগ্য নেতৃত্বে শিখধর্ম প্রসার লাভ করতে থাকে। নানক **অঙ্গদকে** পরবর্তী গুরুরূপে মনোনীত করে যান। এই মনোনয়নের বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে নানক যদি না নিজে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে যেতেন, তাহলে রামানন্দ, কবীর প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের শিষ্যদের মত নানকের শিষ্যরাও হিন্দু ধর্ম ও সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যেত। কিন্তু অঙ্গদের মনোনয়ন সেই সম্ভাবনা দূর করে শিখদের মধ্যে ঐক্য ও ধারাবাহিকতার সূচনা করেছিল। গুরু অঙ্গদ (১৫৩৮-১৫৫২) শিখদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। অনেকে তাঁকে গুরুমুখী বর্ণমালার স্রষ্টা বলে মনে করেন।

গুরু অঙ্গদ
(১৫৩৮-১৫৫২)

অঙ্গদের পর যথাক্রমে **অমরদাস** (১৫৫২-১৫৭৪), **রামদাস** (১৫৭৪-১৫৮১) এবং **অর্জুন** (১৫৮১-১৬০৬) শিখ ধর্মগুরুর পদে বৃত হন। গুরু অমরদাস শিখধর্মের প্রসার করেন ও তাঁর সময় থেকে শিখ জাতির স্বাতন্ত্র্য আরও সুস্পষ্ট হয়। গুরু রামদাস পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে শিখধর্মের কেন্দ্র স্থাপন করেন।

গুরু অর্জুন ছিলেন রামদাসের পুত্র। এই সময় থেকে শিখ গুরুপদ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। অর্জুন শিখ সম্প্রদায়ের জন্য বাণী ও উপদেশ সঙ্কলনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পূর্ববর্তী গুরুদের এবং নিজের কিছু উপদেশ সঙ্কলন করে শিখদের পবিত্র **আদিগ্রন্থ** বা **গ্রন্থসাহেব** প্রণয়ন করেন (১৬০৪)। হিন্দু ও মুসলমান সাধক ও ধর্মপুরুষদের কিছু কিছু বাণীও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গুরু অর্জুনের সাংগঠনিক প্রতিভা ছিল। শিষ্যদের কাছ থেকে দক্ষিণা সংগ্রহের জন্য **মসন্দ প্রথার** প্রবর্তন করে তিনি শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বনির্ভরতাবোধের উন্মেষে সহায়তা করেছিলেন।

পঞ্চম গুরু অর্জুন (১৫৮১-১৬০৬)

উপদেশ সঙ্কলন

'আদিগ্রন্থ' সংকলন

মসন্দ প্রথার প্রচলন

শিখগুরু রামদাস আকবরের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীর শিখ সম্প্রদায়ের প্রসার ও প্রভাব বৃদ্ধিতে সন্দিহান হন। বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে সাহায্য করার অপরাধে তিনি গুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন (১৬০৬)। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে শিখদের দমন করাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। তিনি অর্জুনের পুত্র ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দকেও দীর্ঘকাল বন্দী করে রেখেছিলেন। কিন্তু শিখদের দমনের চেষ্টা সফল হয়নি। উপরন্তু জাহাঙ্গীরের নিষ্ঠুর কর্মের ফলে শিখ-মুঘল বৈরিতার সূচনা হয়।

অর্জুনের প্রাণদণ্ড (১৬০৬) ও মুঘল-শিখ বিরোধের সূচনা

রণকুশল ও নির্ভীক গুরু **হরগোবিন্দের** সময় থেকেই শান্তিপ্রিয় শিখ সম্প্রদায় সামরিক জাতিতে রূপান্তরিত হতে সুরু করে। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি ক্ষুদ্র শিখ সৈন্যদল সম্রাট শাহজাহানের বাহিনীকে অমৃতসরের কাছে পরাজিত করে। হরগোবিন্দের পরবর্তী দুই শিখগুরু ছিলেন **হররায়** (১৬৪৫-১৬৬১) এবং **হরকিষণ** (১৬৬১-১৬৬৪)। এই সময়ের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা না ঘটলেও শিখরা মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করতে পেরেছিল।

গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-১৬৪৫)

হরকিষণের মৃত্যুর পর নবম শিখগুরু হন **তেগবাহাদুর** (১৬৬৪-১৬৭৫)। মুঘল সম্রাট ঔরংজীবের অনুদার নীতি ও ধর্মান্ধতার প্রতিবাদ করায় তিনি বন্দী হন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অসম্মত হয়ে বীরের মত ঘাতকের হাতে প্রাণ

তেগবাহাদুর (১৬৬৪-১৬৭৫)

দেন (১৬৭৫)। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমগ্র শিখজাতির মধ্যে গভীর বেদনা ও ক্রোধের সৃষ্টি করে।

দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮)

তেগবাহাদুর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুত্র গোবিন্দ সিংহকে দশম গুরুরূপে মনোনীত করে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ন'বছর মাত্র। **গুরু গোবিন্দ** (১৬৭৫-১৭০৮) শিখ ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছিলেন। পিতার মৃত্যু ও পূর্বপুরুষদের ওপর নির্যাতন তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে আক্রমণ ও অত্যাচার প্রতিরোধ করতে হলে সঙ্ঘবদ্ধ সামরিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে। ধর্মনৈতিক এবং সামাজিক কলুষমুক্ত এক নতুন জাতি ও রাষ্ট্র তিনি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ব্যক্তিগত 'মুক্তি' নয়, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ছিল তাঁর ধর্মের লক্ষ্য। তিনি প্রচার করেছিলেন যে আত্মবোধ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মদানই হল সিদ্ধি-লাভের সোপান।

গুরু গোবিন্দ সিংহ

নিজের আদর্শ ও লক্ষ্যের বাস্তব রূপায়ণের জন্য গুরু গোবিন্দ '**খালসা**'র সৃষ্টি করেন। 'খালসা' শব্দের অর্থ পবিত্র। তিনি বলেছিলেন যে আর গুরুর প্রয়োজন নেই। খালসা অর্থাৎ সমগ্র শিখ সম্প্রদায় তাদের বীরত্ব, অস্ত্রবিদ্যা ও ভ্রাতৃত্বের মধ্য দিয়ে এক শক্তিশালী জাতিরূপে গড়ে উঠবে। শিখরা এখন থেকে নামে ও কাজে হবে 'সিংহ'। খালসায় সকলে সমান। জাতি, বর্ণ, উচ্চ-নীচের কোন ভেদাভেদ থাকবে না।

শিখধর্মাবলম্বীদের প্রতীক

যোদ্ধসম্প্রদায় শিখদের প্রতীক হবে কেশ, কঙ্কতী (চিরুনি), কৃপাণ, কচ্ছ (খাটো পায়জামা) এবং কড় (লোহার বালা)। গুরু গোবিন্দ প্রচার করেছিলেন যে ঈশ্বর 'অসিধ্বজ' অর্থাৎ তাঁর পতাকা তরবারি-লাঞ্ছিত। এইভাবে **ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে শিখদের তিনি এক সামরিক জাতিতে পরিণত করেন।**

পঞ্চনদীর তীরে গুরু গোবিন্দের নব মন্ত্রে এক নির্ভীক বীর জাতি গড়ে উঠেছিল। তাদের 'জয় গুরুজীর জয়, জয় খালসার জয়'—এই তূর্যনিনাদ মুঘল সম্রাট ঔরংজীবকে বিচলিত করেছিল। পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলের রাজাদের সঙ্গে এবং মুঘল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শিখদের কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ঔরংজীব তখন দাক্ষিণাত্যে ব্যস্ত থাকায় তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়নি। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চাতুর্যে ঔরংজীব গুরু গোবিন্দকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। গুরু গোবিন্দ মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর চার পুত্র, আত্মীয়-বান্ধব ও বহু অনুগামীকে হারিয়েছিলেন। তিনি অসীম দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছিলেন, তবু শক্তিশালী শত্রুর কাছে নতি স্বীকারের চিন্তা পর্যন্ত কখনও করেননি।

মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ঔরংজীবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ বাধলে বাহাদুর শাহ গুরু গোবিন্দের সাহায্যপ্রার্থী হন। গুরু গোবিন্দ সম্মত হন এবং তাঁর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যান। সেইখানে ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে এক পাঠান আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন। নিজের জীবদ্দশায় গুরু গোবিন্দ তাঁর মানসলোকের শিখরাজ্য দেখে যেতে পারেননি। তাঁর স্বপ্ন সার্থক করেছিলেন পরবর্তী কালে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ।

গোবিন্দ সিংহ ছিলেন শিখদের দশম এবং শেষ গুরু। তাঁর মৃত্যুর পর শিখদের নেতা হন **বান্দা**। তিনি সিরহিন্দের মুঘল ফৌজদারকে পরাজিত ও নিহত করে সিরহিন্দ অধিকার করেন। এই মুঘল ফৌজদারই গুরু গোবিন্দের পুত্রদের হত্যা করেছিল। কিন্তু সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিলেও শেষ পর্যন্ত বান্দা মুঘলবাহিনীর কাছে পরাজিত হন। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে বান্দা বন্দী হন এবং তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

অষ্টাদশ শতকে শিখ স্বাধীনতা সংগ্রাম : বান্দার মৃত্যুদণ্ড (১৭১৬)

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আহম্মদশাহ আবদালী মুঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করে পাঞ্জাব অধিকার করলে (১৭৫২) শিখদের ভীষণ সঙ্কট দেখা দেয়। কিন্তু বারংবার চেষ্টা করেও আহম্মদশাহ শিখদের সম্পূর্ণ দমন করতে পারেননি। এমন কি ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে শক্তিশালী মারাঠাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার পরও আফগান নায়কের পক্ষে শিখদের ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। পাঞ্জাবে শিখজাতির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

আফগান-শিখ সংগ্রাম

প্রথমে মুঘল ও পরে আফগানদের বিরুদ্ধে শিখজাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম এক গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। শিখদের স্বধর্মনিষ্ঠা ছিল তাদের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। আহম্মদশাহ শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করেছিলেন যে শিখদের ধর্মোন্মাদনা দূর করতে না পারলে তাদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। শিখদের সামরিক প্রতিভা, রণকৌশল এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই ছিল তাদের সাফল্যের প্রধান কারণ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে শিখদের সাফল্যের কারণ

শিখ জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হলেও সমগ্র পাঞ্জাবে একটি বৃহৎ সুসংহত শিখরাজ্য স্থাপিত হয়নি। শিখরা এই অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এইভাবে তারা বারোটি **'মিস্‌ল'** বা দলে বিভক্ত হয়। প্রতিটি 'মিস্‌ল'-এর একজন শক্তিশালী নায়ক ছিলেন। তিনিই ছিলেন 'মিস্‌ল' বা দল-অধিকৃত ভূখণ্ডের শাসক। প্রতি বছর শিখ নায়করা দুবার 'সরবৎ খালসা' নামক সভায় মিলিত হয়ে বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা করতেন। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের অভাবে শীঘ্রই মিস্‌লগুলির মধ্যে ক্ষমতা বা প্রাধান্য লাভের জন্য বিরোধ দেখা দেয়। শিখদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে সুকেরচকিয়া মিস্‌লের নায়ক **রণজিৎ সিংহ** অন্যান্য মিস্‌লের ভূখণ্ড অধিকার করে ঐক্যবদ্ধ শিখরাজ্য স্থাপন করেন।

'মিস্‌ল'-এর উৎপত্তি

সুকেরচকিয়া মিস্‌লের নায়ক মহা সিংহের পুত্র রণজিৎ সিংহের জন্ম হয় ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে। বাল্যবয়সে পিতৃহীন হবার কয়েক বছরের মধ্যে কিশোর রণজিৎ পিতার রাজ্যখণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করেন। আফগানিস্তানের শাসক জামান শাহকে পাঞ্জাব আক্রমণে সহায়তা করায় তিনি তাঁর কাছ থেকে লাহোরের শাসনভার লাভ করেন (১৭৯৯)। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই আফগান অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হন। শিখ মিস্‌লগুলির দুর্বলতা ও অন্তর্বিরোধ তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করেছিল। প্রথমে অমৃতসর (১৮০২) ও কয়েক

রণজিৎ সিংহ (১৭৮০-১৮৩৯)

বছর পর লুধিয়ানা (১৮০৬) তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। তাঁর রাজ্যসীমা শতদ্রু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীর এবং যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত শিখরাজ্যগুলিতে রণজিৎ সিংহ নিজের আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হলে ঐ মিস্‌লগুলির নায়করা ইংরাজদের সাহায্যপ্রার্থী হন। গভর্নর-জেনারেল **লর্ড মিণ্টো** (১৮০৭-১৮১৩) রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা ও রাজ্যবৃদ্ধিতে শঙ্কিত বোধ করেছিলেন। এই সময় উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে ফরাসী আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, সুতরাং রণজিৎ সিংহের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা ইংরাজদের ছিল না। অন্য দিকে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রণজিৎ উপলব্ধি করলেন যে শক্তিশালী ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। তাছাড়া ভবিষ্যতে সঙ্কটকালে বিজিত শিখ নায়কদের বিরুদ্ধাচরণের আশঙ্কাও ছিল। এইভাবে পারস্পরিক স্বার্থের কারণে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ ও ইংরাজদের মধ্যে **অমৃতসরের সন্ধি** স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির সর্তানুসারে স্থির হয় যে রণজিৎ শতদ্রু নদীর দক্ষিণে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করবেন না। কিন্তু শতদ্রুর পরপারে তাঁর আধিপত্য স্বীকৃত হয়। রণজিৎ সিংহ তাঁর জীবিতকালে এই সন্ধির সর্ত মান্য করে ইংরাজদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করেছিলেন। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে শতদ্রুর দক্ষিণের শিখরাজ্যগুলি জয় করতে রণজিতের ব্যর্থতার ফলে ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ শিখ সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়।

ইংরাজদের সঙ্গে অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৯)

শতদ্রুর দক্ষিণে রাজ্যবিস্তারে বাধাপ্রাপ্ত হলে রণজিৎ সিংহ উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ ক'রে আফগানদের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হন। একাধিকবার তিনি আফগানদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। পাঞ্জাবের পার্বত্য রাজ্যসমূহ ছাড়া মূলতান, কাশ্মীর, পেশোয়ার তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। সিন্ধু দেশ জয় করার ইচ্ছা থাকলেও ইংরাজদের আপত্তির জন্য তাঁকে বিরত হতে হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়।

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে রাজ্যবিস্তার

নিজের বুদ্ধি ও বাহুবলে সামান্য মিস্‌লের শাসক থেকে এক বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি হয়ে 'পাঞ্জাবকেশরী' রণজিৎ সিংহ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সুশাসকরূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল। যোগ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত পদে নিয়োগ ছিল তাঁর রাজ্য-

রণজিতের কৃতিত্ব

রণজিৎ সিংহের রাজ্য
১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে
১৮৩৯ ,,
০ ১০০ ২০০
কিলোমিটার
আফগান রাজ্য
কাবুল
কাবুল নং
কান্দাহার
গজনী
কালাত
পেশোয়ার
কোহাট
আটক
রাওয়ালপিণ্ডি
শ্রীনগর
সিন্ধু নং
লাহোর
অমৃতসর
জলন্ধর
লুধিয়ানা
সিমলা
আম্বালা
পাতিয়ালা
মুলতান
ডেরা ইসমাইল খাঁ
ডেরা গাজি খাঁ
রাজপুতানা
দিল্লী
যমুনা নং
গঙ্গা নং
হরিদ্বার

শাসনের এক বৈশিষ্ট্য। শিখ সৈন্যবাহিনীকে পাশ্চাত্য রণবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য তিনি কয়েকজন বিদেশী সেনানায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর সৈন্যদল ছিল সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ। শিখ, হিন্দু ও মুসলমান সকল শ্রেণীর মানুষেরই তিনি শ্রদ্ধা এবং আস্থা অর্জন করেছিলেন। দুর্ধর্ষ উপজাতিদের নিয়ন্ত্রিত করে তিনি রাজ্যের সীমা সুরক্ষিত করেছিলেন। আফগানদের বিরুদ্ধে সাফল্য, রাজ্যবিস্তার, সুশাসনব্যবস্থা প্রবর্তন, সুসংবদ্ধ সৈন্যবাহিনী গঠন এবং স্বাধীন শিখরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা তাঁর অসাধারণ সাফল্যের পরিচয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে রণজিৎ সিংহ এক স্মরণীয় চরিত্র।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখশক্তি ও সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাত্র এক দশকের মধ্যেই শিখ রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। (পৃষ্ঠা ১৭০ দ্রষ্টব্য)।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিদেশী বণিকদের আগমন : ইংরাজ প্রভুত্বের সূচনা

অতি প্রাচীন যুগেও ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশগুলির সামুদ্রিক বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। মধ্য যুগে ইউরোপীয় বণিকদের প্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানতঃ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি ইতালীয় বন্দরের বণিকরা আরব বণিকদের কাছ থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে ইউরোপের নানা দেশে রপ্তানী করতে থাকে। আরব ও ইতালীয় বণিকদের সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত ইউরোপীয় বণিকরা ভারত এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য করতে আগ্রহী হয়। কিন্তু প্রাচ্যে যাতায়াতের জলপথ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

ভূমিকা

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে অভূতপূর্ব নবজাগরণ দেখা দেয় তার এক প্রধান লক্ষণ ছিল বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে কৌতূহল এবং নতুন নতুন দেশ ও জলপথ আবিষ্কারে আগ্রহ। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার, উন্নত ধরনের ম্যাপ ও চার্টের ব্যবহার, সুদৃঢ় ও বৃহদাকার জাহাজ নির্মাণ এবং ভূগোল, অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে চর্চা ভৌগোলিক আবিষ্কারের সহায়তা করে। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে

ভৌগোলিক আবিষ্কারের সূচনা

পোর্তুগীজ নাবিক **বার্থোলোমিও দিয়াজ** উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তোলেন। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে **ভাস্কো দা গামা** ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে উপনীত হন। দু'বছর পরে **কাব্রাল** এইখানে একটি পোর্তুগীজ বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেন। কিছুকালের মধ্যে পশ্চিম উপকূলের গোয়া, দমন, দিউ, সলসেট, বেসিন, বাংলাদেশের হুগলী প্রভৃতি স্থানে পোর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়। পোর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র এবং প্রতিপত্তি বিস্তারের মূলে ছিলেন ভারতে পোর্তুগীজ-অধিকৃত অঞ্চলগুলির শাসনকর্তা **আলবুকার্ক** (১৫০৯-১৫১৫)। পোর্তুগীজ প্রাধান্য কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ভারতীয়দের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা, বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার, স্থানীয় জনসাধারণের প্রতি দুর্ব্যবহার, কুশাসন, অদূরদর্শিতা, জলদস্যুতার প্রবণতা প্রভৃতি কারণের সমাবেশে পোর্তুগীজদের পতন হয়।

ভারতে পোর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন

পোর্তুগীজদের ব্যর্থতার কারণ

পোর্তুগীজরা যখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রাধান্য বিস্তারে ব্যস্ত তখন অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিরাও নিশ্চেষ্ট ছিল না। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে একটি ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা ভারতবর্ষ, দূরপ্রাচ্য ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের চেষ্টা করে। ভারতবর্ষে ওলন্দাজ বাণিজ্যকুঠিগুলির মধ্যে পশ্চিম উপকূলে সুরাট, দক্ষিণে নেগাপত্তম এবং বাংলায় চুঁচুড়া প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ অপেক্ষা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রতি ওলন্দাজদের আকর্ষণ ছিল বেশী।

ওলন্দাজ বণিকদের উদ্যম

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এই কোম্পানীটি রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে প্রাচ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। সুরাটে একটি ইংরাজ বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি লাভের জন্য ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্স মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কয়েক বছর পর স্যার টমাস রো ইংল্যাণ্ডের রাজদূতরূপে মুঘল দরবারে উপস্থিত হন। কিছুকালের মধ্যে পশ্চিমে সুরাট (১৬১৩), দক্ষিণ-পূর্বে মসুলিপত্তন, দক্ষিণে মাদ্রাজ (১৬৩৯) এবং পূর্ব ভারতে হুগলী (১৬৫১), হরিহরপুর, বালেশ্বর, ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি

ইংরাজ বণিকদের আগমন

স্থানে ইংরাজ-কুঠি নির্মিত হয়। চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে মাদ্রাজের শাসনভারও ইংরাজরা লাভ করেছিল। এই বাণিজ্যকেন্দ্রটি সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তারা ফোর্ট সেণ্ট জর্জ দুর্গ নির্মাণ করে। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস্ বিবাহের যৌতুকরূপে পোর্তুগালের কাছ থেকে বোম্বাই দ্বীপটি লাভ করেন। তিনি এই দ্বীপটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নামমাত্র মূল্যে ইজারা দেন (১৬৬৮)।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কুঠি নির্মাণ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শুল্ক আদায় সংক্রান্ত মতভেদকে কেন্দ্র করে মুঘল সরকারের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ দেখা দেয়। কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইংরাজরা সম্রাট ঔরংজীবের কাছে নতি স্বীকার করলে তিনি তাদের তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দান করেন। ইংরাজ কুঠিগুলির প্রধান **জব চার্নক** বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে (আগস্ট, ১৬৯০) গঙ্গাতীরে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রাম নিয়ে কলিকাতা নগরীর পত্তন করেন। কয়েক বছর পর এইখানে ইংরাজরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর মত কলিকাতাও একজন ইংরাজ প্রেসিডেণ্ট ও কাউন্সিলের শাসনাধীন হওয়ায় 'প্রেসিডেন্সি' নামে অভিহিত হয়। এইভাবে ভারতবর্ষে তিনটি ইংরাজ প্রেসিডেন্সি স্থাপিত হয়।

মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরাজদের পরাজয়

কলিকাতায় ইংরাজ প্রেসিডেন্সির প্রতিষ্ঠা

১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যে সুরাট (১৬৬৮), মসুলিপত্তন (১৬৬৯), পণ্ডিচেরী (১৬৭৪) এবং চন্দননগরে (১৬৮৮) ফরাসীরা বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করে। আরও কিছুকাল পরে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে মাহে এবং পূর্ব উপকূলে কারিকল ফরাসী বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের দ্বন্দ্বে কালক্রমে পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের পরাজয় হয় এবং অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড পরস্পরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে দেখা দেয়। দুই দেশের মধ্যে এই বিরোধ ইউরোপের রাজনৈতিক আবর্তনের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল।

ফরাসী বণিক

ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা

প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ (১৭৪৬-১৭৪৮)

ভারতবর্ষে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধান ক্ষেত্র ছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্য। মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতাপ্রসূত রাজনৈতিক অরাজকতা এই রাজ্যটিতেও প্রবেশ করেছিল।

তখন কর্ণাটকের নবাব ছিলেন **আনোয়ারউদ্দীন**। ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনি এই রাজ্যের শাসনক্ষমতা অধিকার করেছিলেন। স্বভাবতই তাঁর বহু শত্রু ছিল এবং সামগ্রিকভাবে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল অনিশ্চিত। ইতিমধ্যে ইউরোপে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ (১৭৪০-১৭৪৮) সুরু হয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দুই বিবদমান পক্ষে যোগ দেওয়ায় ভারতবর্ষেও ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই সংঘর্ষ নিবারণের চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ভারতেও এই যুদ্ধ সুরু হয়ে যায়। প্রথমে ফরাসীরা কিছুটা অসুবিধার মধ্যে পড়লেও মরিশাসের শাসনকর্তা **লা বুরদনে** একটি নৌবাহিনীর সাহায্যে মাদ্রাজ অধিকার করেন (১৭৪৬)। বিপন্ন হয়ে ইংরাজরা নবাব আনোয়ার-উদ্দীনের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন, কেননা তাঁর রাজ্যের মধ্যেই দু'পক্ষের যুদ্ধ সুরু হয়েছিল। তখন পণ্ডিচেরীর ফরাসী শাসনকর্তা **ডুপ্লে** নবাবকে জানালেন যে মাদ্রাজ তাঁরা তাঁকেই প্রদান করবেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসযোগ্য মনে না করে আনোয়ার-উদ্দীন ফরাসীদের যুদ্ধ বন্ধ করতে নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ তারা অমান্য করলে নবাব ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু মাদ্রাজের কাছে এক যুদ্ধে মাত্র কয়েকশত ফরাসী সৈন্য দশ সহস্রাধিক সৈন্যের নবাববাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। অল্পকালের মধ্যে ইউরোপে যুদ্ধের অবসান হওয়ায় ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের অবসান হয়। ফরাসীরা ইংরাজদের মাদ্রাজ প্রত্যর্পণ করে।

কর্ণাটক রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ

ডুপ্লে

ডুপ্লের স্বপ্ন ছিল ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। মুষ্টিমেয় ফরাসী সৈন্যের কাছে নবাববাহিনীর শোচনীয় পরাজয় তাঁকে আরও উৎসাহিত করে। তিনি উপলব্ধি করেন যে আরও বেশীসংখ্যক সৈন্য ও নৌবাহিনীর সাহায্যে এবং রাজনৈতিক অরাজকতার সুযোগে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব। সুতরাং যুদ্ধ শেষ হলেও তিনি ভবিষ্যৎ সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

ডুপ্লের উচ্চাভিলাষ

ডুপ্লেকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। খুব শীঘ্রই হায়দ্রাবাদ এবং কর্ণাটক রাজ্যের সিংহাসন নিয়ে প্রবল অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। সুযোগ বুঝে ডুপ্লে দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে ফরাসী প্রাধান্য বিস্তারে উদ্যোগী হন। ঘটনাচক্রে পরিস্থিতি ফরাসীদের অনুকূলে গেলে এবং দুই রাজ্যেই তাদের সমর্থিত প্রার্থী ক্ষমতালাভ করলে ইংরাজরা উদ্বিগ্ন হয়ে বিরোধী প্রার্থীদের পক্ষে যোগ দেয়। এর ফলে দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ (১৭৫১-১৭৫৪) সুরু হয়। এই সময় ইংরাজ পক্ষের অধিনায়ক ছিলেন **রবার্ট ক্লাইভ**। অসীম সাহস, বুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ক্লাইভ অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও রাজধানী আর্কট অধিকার করেন এবং ত্রিচিনোপল্লীতে ফরাসী এবং ফরাসী মিত্রবাহিনীকে পরাজিত করেন। কর্ণাটক রাজ্যে ফরাসী প্রাধান্য লুপ্ত এবং ইংরাজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও দু'বছর ব্যর্থ যুদ্ধের পর ফরাসীরা ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয় (১৭৫৪)। হতাশ ও পদচ্যুত হয়ে ডুপ্লে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ (১৭৫১-১৭৫৪)

রবার্ট ক্লাইভ

দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের অবসানের দু'বছরের মধ্যে ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-১৭৬৩) সুরু হলে ভারতবর্ষেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তৃতীয় বার যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধের (১৭৫৬-১৭৬৩) সূচনাতেই ইংরাজরা চন্দননগর অধিকার করে নেয় (মার্চ, ১৭৫৭)। এর কয়েক মাস পরেই পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করায় বাংলাদেশে ইংরাজ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সরকার তাদের সুদক্ষ সেনানায়ক **লালীকে** দক্ষিণ ভারতে প্রেরণ করে। প্রাথমিক সাফল্যের পর ফরাসীরা বিপর্যস্ত হলে লালী ফরাসী সেনাপতি **বুসিকে** হায়দ্রাবাদ থেকে আসতে নির্দেশ দেন। এর ফলে নিজামের রাজ্যে ফরাসী প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়। কিন্তু তারা ইংরাজদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়নি। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে **ওয়ান্দিওয়াশের যুদ্ধে**

তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ (১৭৫৬-১৭৬৩)

ইংরাজ সেনাপতি স্যার অয়ার কূটের কাছে লালী পরাজিত ও বন্দী হন। এরপর ইংরাজরা পণ্ডিচেরী অধিকার করে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান হলে ভারতবর্ষেও যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ফরাসীরা তাদের অধিকৃত স্থানগুলি ফিরে পেলেও ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা চিরকালের মত বিলীন হয়। অন্য দিকে প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী শক্তিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে ইংরাজরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ আরও সুগম করে।

ফরাসী ব্যর্থতার কারণ

ফরাসী সরকারের কাছ থেকে সময় ও প্রয়োজনমত উৎসাহ এবং সাহায্যের অভাব, ভারতে ইংরাজ কোম্পানীর সাংগঠনিক শক্তি ও আর্থিক সমৃদ্ধি, ইংরাজ নৌবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রথমে ডুপ্লে ও পরে লালীর কূটনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনার ত্রুটি, ক্লাইভের সুযোগ্য নেতৃত্ব, বাংলাদেশে ইংরাজদের সাফল্য, ইউরোপ ও আমেরিকার রণক্ষেত্রে ফ্রান্সের পরাজয় ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের ফলে ভারতবর্ষে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসীদের পরাজয় ঘটেছিল।

বাংলাদেশে ইংরাজ প্রভুত্বের সূচনা

সিরাজদ্দৌলা ও ইংরাজদের মধ্যে বিরোধের কারণ

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র **সিরাজদ্দৌলা** বাংলার মস্‌নদ লাভ করেন। বিভিন্ন কারণে তরুণ নবাবের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। আলিবর্দির জীবিতকালে ইংরাজরা তাঁর রাজ্যের মধ্যে কোন দুর্গ সংস্কারের অনুমতি লাভ করেনি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সিরাজের আদেশ অমান্য করে ইংরাজরা কলিকাতার দুর্গের সংস্কার করে। ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহারও তারা করতে থাকে। এছাড়া সিরাজের গভীর সন্দেহ হয় যে ইংরাজরা তাঁর বিরোধী পক্ষের কার্যকলাপের সঙ্গে লিপ্ত রয়েছে। নবাবের বিরোধী দলভুক্ত রাজকর্মচারী রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে কলিকাতায় আশ্রয় দেওয়ায় সিরাজ ইংরাজদের ওপর

সিরাজদ্দৌলা

আরও অসন্তুষ্ট হন। এইভাবে বারবার তাঁর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ও তাঁর আদেশ অমান্য করায় ক্ষুব্ধ হয়ে সিরাজ প্রথমে কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠি দখল ও পরে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অধিকার করেন (জুন, ১৭৫৬)। নবাবের আক্রমণে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে কলিকাতার গভর্নর ড্রেক ও অন্যান্য বহু ইংরাজ কর্মচারী পলায়ন করেন।

ইংরাজদের বিপর্যয়ের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছলে রবার্ট ক্লাইভ ও নৌ-সেনাপতি ওয়াটসনের নেতৃত্বে একদল ইংরাজ সৈন্য ও কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করে এবং অল্পায়াসে কলিকাতা পুনরধিকার করে (জানুয়ারী, ১৭৫৭)। সিরাজ ও ইংরাজদের মধ্যে **আলিনগরের সন্ধি** হয়। সন্ধির সর্তানুসারে নবাব যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণে সম্মত হন। ইংরাজরা দুর্গনির্মাণ, বিনা শুল্কে বাণিজ্য-পরিচালনা এবং নিজেদের মুদ্রা প্রচলনের অধিকার লাভ করে।

কলিকাতা পুনরধিকার : আলিনগরের সন্ধি (ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭)

পরবর্তী কয়েক মাসের ঘটনা বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। ইংরাজরা উপলব্ধি করেছিল যে এই ইংরাজ-বিরোধী তরুণ নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত না করা পর্যন্ত বাংলাদেশে তাদের পক্ষে নিশ্চিন্তে বাণিজ্য ও প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভব হবে না। ঘটনাচক্রে এই সময় মুর্শিদাবাদের রাজদরবারেই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার এক গভীর ষড়যন্ত্র সুরু হয়েছিল। এর নায়ক ছিলেন নবাবের আত্মীয় ও সেনাপতি **মীরজাফর**। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, স্বরূপচাঁদ ইত্যাদি বিত্তশালী ও প্রভাবশালী বহু ব্যক্তি। ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ছিল সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরজাফরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা। সুবর্ণসুযোগ বুঝে ক্লাইভ গোপনে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হলেন। স্থির হল যে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে মীরজাফর কোম্পানীকে ১৭৫ লক্ষ টাকা দেবেন। এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শোচনীয় পরিণতিরূপে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে মাত্র কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধে ক্লাইভের পরিচালনায় অল্পসংখ্যক ইংরাজসৈন্য পঞ্চাশ সহস্রাধিক নবাব সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে। মীরমদন, মোহনলাল প্রভৃতি বীর সেনাপতিদের মরণ-পণ সংগ্রাম মীরজাফর ও তাঁর সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতায় নিষ্ফল হয়। হতভাগ্য সিরাজ

মুর্শিদাবাদে সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র

পলাশীর যুদ্ধ (২৩ জুন, ৫৭)

পলায়নকালে ধরা পড়ে মীরজাফরের পুত্র মীরনের হাতে নিহত হন। **পলাশীর যুদ্ধ নামে 'যুদ্ধ' হলেও প্রকৃতপক্ষে ছিল প্রহসন-মাত্র। কিন্তু এই জঘন্য ও মর্মান্তিক ষড়যন্ত্র ও প্রহসনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূচনা হয়।** কালক্রমে এই সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করে সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করেছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার

ইংরাজদের ক্রীড়নকরূপে **মীরজাফর** (১৭৫৭-১৭৬০) বাংলার সিংহাসনে বসলেও দীর্ঘকাল তাঁর পক্ষে রাজ্যসুখ ভোগ করা সম্ভব হয়নি। প্রচুর জমি-জমা, অর্থ-সম্পদ দান করেও তিনি কোম্পানী, রবার্ট ক্লাইভ ও অন্যান্য ইংরাজ কর্মচারীদের অর্থের চাহিদা মেটাতে পারেননি। বিরক্ত ও ধৈর্যচ্যুত হয়ে মীরজাফর ওলন্দাজদের সহ-যোগিতায় ইংরাজদের বিতাড়িত করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু **বিদেরার যুদ্ধে** (নভেম্বর, ১৭৫৯) ওলন্দাজদের পরাজিত করে ক্লাইভ এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন। কয়েক মাস পর তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলে **ভ্যান্‌সিটার্ট** কলিকাতার গভর্নর নিযুক্ত হন। ওলন্দাজ-দের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হন। ইংরাজরা মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিমকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে।

মীরকাসিম (১৭৬০-১৭৬৩)

ওলন্দাজদের পরাজয় (১৭৫৯)

মীরজাফরের মত **মীরকাসিম**ও (১৭৬০-১৭৬৩) ইংরাজদের সাহায্য ও অনুগ্রহে বাংলার নবাব হয়েছিলেন এবং তার বিনিময়ে কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার জমিদারী স্বত্ব ও প্রচুর অর্থ দান

করেছিলেন। কিন্তু মীরকাসিম ছিলেন স্বাধীনচেতা, সাহসী ও সুদক্ষ শাসক। ইংরাজদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তিনি পছন্দ করতেন না। কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নবাবকে তাঁর প্রাপ্য শুল্ক না দেওয়ায় মীরকাসিম ক্ষুব্ধ হয়ে এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এরই পরিণতিরূপে তাঁর সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বেধে যায় (১৭৬৩)। কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হবার পর মীরকাসিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের মিত্রতা প্রার্থনা করেন। কিন্তু **বক্সারের যুদ্ধে** (২২ অক্টোবর, ১৭৬৪) ইংরাজ সেনাপতি মনরো ঐ ত্রিশক্তির সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে পূর্ব ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত সুদৃঢ় করেন। বক্সারের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে বাংলার নবাবের অবশিষ্ট মর্যাদা ও ক্ষমতাটুকুও লুপ্ত হয়। ইতিপূর্বে মীরকাসিমের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজরা তাঁকে পদচ্যুত করে মীরজাফরকে বাংলার নবাব পদে পুনর্নিযুক্ত করেছিল। মীরজাফরের মৃত্যুর (১৭৬৫) পর তাঁর পুত্র **নজমউদ্দৌলার** সঙ্গে স্বাক্ষরিত এক নতুন চুক্তি অনুসারে নবাব নামেমাত্র রাজ্যের প্রধানরূপে থাকলেও প্রকৃত শাসনক্ষমতা কোম্পানীর হস্তগত হয় (ফেব্রুয়ারী, ১৭৬৫)।

বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪)

ইংরাজদের শাসন-ক্ষমতা বৃদ্ধি

বক্সারের যুদ্ধের পর কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ক্লাইভকে পুনরায় বাংলার গভর্নর করে পাঠান (মে, ১৭৬৫)। তাঁর দ্বিতীয় শাসনকালে (১৭৬৫-১৭৬৭) দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমতঃ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমের সঙ্গে একটি সন্ধির মাধ্যমে ইংরাজ কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী (রাজস্ব সংগ্রহ ও দেওয়ানী বিচারের অধিকার) লাভ করে (আগস্ট, ১৭৬৫)। মুঘল বাদশাহ ইংরাজদের বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন। দ্বিতীয়তঃ অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এলাহাবাদের সন্ধির সর্তানুসারে ইংরাজরা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ছাড়া কোরা ও এলাহাবাদ জেলা লাভ করে এবং ঐ দুটি জেলা মুঘল সম্রাটকে প্রদান করে। অযোধ্যা রাজ্যটি ইংরাজের প্রভাবাধীন হয়।

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫)

অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে সন্ধি

রবার্ট ক্লাইভ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অর্থলোভী ও নীতিজ্ঞানহীন। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য ষড়যন্ত্র, শঠতা বা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে তাঁর কোন দ্বিধা

ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষে ফরাসীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংরাজের সাফল্য ও বাংলাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল তাঁর সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অসাধারণ কূটবুদ্ধি।

ক্লাইভের কৃতিত্ব

বাংলাদেশে ইংরাজ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার খুব সহজ হয়নি। উত্তর ভারতে মারাঠা রাজ্য, হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং মহীশূর রাজ্যের হায়দার আলি তখন বিশেষ শক্তিশালী ছিল। এইসব প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত সমগ্র ভারতে বৃটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব ছিল না। ক্লাইভের পরবর্তী দুই গভর্নর **ভেরেল্স্ট** (১৭৬৭-১৭৬৯) ও **কার্টিয়ার** (১৭৬৯-১৭৭২) কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেননি।

প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় রাজ্যসমূহ

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে **ওয়ারেন হেষ্টিংস** (১৭৭২-১৭৮৫) বাংলার শাসন-কর্তা নিযুক্ত হন। ভারতে বৃটিশ প্রাধান্য বিস্তারে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম মারাঠাদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ায় হেস্টিংস তাঁর বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করে দেন এবং তাঁর কাছ থেকে এলাহাবাদ ও কোরা জেলা দুটি কেড়ে নিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অযোধ্যার নবাবকে ফিরিয়ে দেন। নবাব সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যায় একদল বৃটিশ সৈন্য রাখতে ও তার ব্যয়ভার বহন করতে সম্মত হন। ইংরাজ সমর্থন ও সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে সুজাউদ্দৌলা তাঁর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রোহিলখণ্ড রাজ্যটি জয় করতে উদ্যোগী হন। রোহিলা নামে আফগানরা এই রাজ্যটি স্থাপন করেছিল। চল্লিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে হেস্টিংস সুজাউদ্দৌলাকে একদল ইংরাজ সৈন্য ভাড়া দেন। এই ভাড়াটিয়া সৈন্যের সাহায্যে তিনি রোহিলখণ্ড অধিকার করে নেন (১৭৭৪)। ন্যায়নীতির বিচারে **হেস্টিংসের রোহিলা নীতি** সমর্থন করা যায় না। কিন্তু রোহিলা

সাম্রাজ্যবিস্তারে ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিকা

অযোধ্যায় ইংরাজ প্রভাব বৃদ্ধি

ওয়ারেন হেস্টিংস

যুদ্ধের ফলে ঐ অঞ্চলে মারাঠাদের প্রাধান্য বিস্তারের সম্ভাবনা দূর হয়েছিল ও অযোধ্যায় ইংরাজদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং হেস্টিংসের রোহিলা নীতির পিছনে কিছুটা রাজনৈতিক যুক্তি ছিল।

ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় ইংরাজদের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মারাঠা ও মহীশূর রাজ্য। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের (১৭৭৫-১৭৮২) কারণ, ঘটনাবলী ও সলবই-এর সন্ধি (১৭৮২) ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে (পৃষ্ঠা ১৪৫-১৪৮)।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫-১৭৮২)

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে মহীশূর একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে **হায়দার আলি** নামে এক সাহসী ও সুদক্ষ সেনানায়ক মহীশূরের হিন্দু রাজাকে পদচ্যুত করে নিজেকে ঐ রাজ্যের সুলতানরূপে ঘোষণা করেন। দাক্ষিণাত্যে তাঁর শক্তিবৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন নিজাম, মাদ্রাজের ইংরাজ সরকার ও মারাঠাদের মধ্যে এক হায়দার-বিরোধী চুক্তি হয়। কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এই জোটের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও হায়দার ইংরাজবাহিনীর কাছে পরাজিত হন (১৭৬৭)। কিন্তু কিছুকাল পরে রণচাতুর্যের পরিচয় দিয়ে হায়দার আকস্মিকভাবে মাদ্রাজ শহরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হলে ইংরাজরা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয় (এপ্রিল, ১৭৬৯)। স্থির হয় যে ভবিষ্যতে উভয়ে উভয়ের বিপদকালে সাহায্য করবে। এইভাবে **প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ** (১৭৬৭-১৭৬৯) শেষ হয়। কিন্তু দু'বছর পর মারাঠারা হায়দারের রাজ্য আক্রমণ করলে ইংরাজরা সন্ধির সর্ত পালন না করায় হায়দার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি দক্ষিণ ভারতে ইংরাজ প্রাধান্য উচ্ছেদ করতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হন।

হায়দার আলি

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হলে ইংরাজরা মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী উপনিবেশ মাহে অধিকার করে। ইংরাজদের এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে হায়দার

নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে জোট বেঁধে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে **দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ** (১৭৮০-১৭৮৪) আরম্ভ হয়। মাদ্রাজ সরকারের ত্রুটিপূর্ণ নীতির ফলে এই যুদ্ধ সুরু হলেও হেস্টিংস এই সংঘর্ষে লিপ্ত হন, কেননা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে দক্ষিণ ভারতে ইংরাজশক্তি বিপন্ন হলে সমগ্র ভারতে ইংরাজদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তিনি কৌশলে প্রথমে নিজামকে ও পরে মারাঠাদের এই জোট থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বে হায়দারের মৃত্যু হলে (১৭৮২) তাঁর পুত্র **টিপু সুলতান** যুদ্ধ চালিয়ে যান। অবশেষে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে **ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির** দ্বারা যুদ্ধের অবসান হয়। দুই পক্ষ পরস্পরের বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করে।

টিপু সুলতান

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি (১৭৮৪)

মারাঠা ও মহীশূর যুদ্ধে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছিল তা সংগ্রহ করার জন্য হেস্টিংস বারাণসীর রাজা চৈৎ সিংহ ও অযোধ্যার বেগমদের সঙ্গে অত্যন্ত অন্যায় ও গর্হিত আচরণ করেছিলেন।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি নতুন আইন বৃটিশ পার্লামেণ্ট পাস করে। এই আইনে নির্দেশ ছিল, কোম্পানী যেন ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার এবং ভারতীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হয়। কিন্তু এই নির্দেশ সঠিকভাবে পালিত হয়নি। মহীশূরের টিপু সুলতান ও ইংরাজদের মধ্যে শত্রুতার অবসান হয়নি। দুই পক্ষই পরস্পরের মনোভাব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ পোষণ করত। এই পরিস্থিতিতে টিপু ইংরাজ-আশ্রিত রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করলে গভর্নর-জেনারেল **লর্ড কর্নওয়ালিস** (১৭৮৬-১৭৯৩) নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেননি। ফলে **তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ** (১৭৯০-১৭৯২) সুরু হয়। পেশোয়া ও নিজাম ইংরাজ পক্ষে যোগদান করেন। দু'বছর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকৃত

লর্ড কর্নওয়ালিস ও তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯০-১৭৯২)

হলে টিপু ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। তিনি নিজের রাজ্যের অর্ধাংশ ও ৩৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মহীশূরের ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাস পায়।

শোরের ঔদাসীন্য নীতি

লর্ড কর্নওয়ালিসের পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল **স্যার জন শোর** (১৭৯৩-১৭৯৮) ভারতীয় রাজ্যসমূহের ব্যাপারে বিলাতের কর্তৃপক্ষ-নির্দেশিত নির্লিপ্ততা বা **ঔদাসীন্যের নীতি** অনুসরণ করেন। কিন্তু অযোধ্যা রাজ্যের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিরোধে হস্তক্ষেপ করে তিনি এলাহাবাদ দুর্গটি লাভ করেন।

শোরের পরবর্তী ইংরাজ শাসনকর্তা **লর্ড ওয়েলেসলি** (১৭৯৮-১৮০৫) ঔদাসীন্য নীতির যৌক্তিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ইংলণ্ড তখন নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনায় ভীত ও সন্ত্রস্ত। ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ ও ইংরাজ-বিরোধী মনোভাবের সুযোগে ফরাসীরা প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে ঔদাসীন্যের নীতি ত্যাগ করে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার ও ফরাসী প্রভাব উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা ওয়েলেসলি গ্রহণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ওয়েলেসলি **অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি** (Policy of Subsidiary Alliance) প্রবর্তন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে যদি কোন দেশীয় রাজা এই নীতি গ্রহণ করে ইংরাজদের সঙ্গে মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হন, তাহলে ইংরাজরা তাঁর রাজ্যকে বহিঃশত্রু ও আভ্যন্তরীণ বিপদ হতে রক্ষা করবে। কিন্তু ঐ আশ্রিত রাজাকে তাঁর রাজ্যে একদল ইংরাজ সৈন্য রাখতে হবে এবং ঐ সৈন্যদলের ব্যয়বহনের জন্য তাঁকে নগদ টাকা বা রাজ্যের একাংশ ইংরাজদের দিতে হবে। তাছাড়া তিনি অন্য কোন বিদেশী শক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে বা তাঁর রাজ্যে ইংরাজ ছাড়া অন্য কোন

লর্ড ওয়েলেসলি

অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতি

বিদেশী কর্মচারী নিযুক্ত করতে পারবেন না। নিজের স্বাধীনতার বিনিময়ে ইংরাজদের কাছে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি লাভ—এই ছিল ওয়েলেসলি-প্রবর্তিত নীতির মূল কথা।

হায়দ্রাবাদের নিজাম ছাড়া অন্য কোনও ভারতীয় নৃপতি প্রথমে এই অপমানকর প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। ঘোরতর ইংরাজবিরোধী টিপু সুলতান ফরাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ওয়েলেসলির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে কালক্ষেপ না করে ইংরাজরা মহীশূর আক্রমণ করে ও **চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ** (১৭৯৯) আরম্ভ হয়। শ্রীরঙ্গপত্তন রক্ষার জন্য মরণপণ সংগ্রামের পর টিপু পরাজিত ও নিহত হন। মহীশূর রাজ্যের বৃহদংশ কোম্পানী ও নিজাম নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। বাকি অংশ প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের এক উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হয়। এইভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথের অন্তরায় স্বাধীন মহীশূর রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটে।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯৯): মহীশূর রাজ্যের পরাজয় ও অবলুপ্তি

কিছুকালের মধ্যে মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্তর্বিরোধের ফলে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও বেসিনের সন্ধির (১৮০২) সর্তানুসারে অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করার পর দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ সুরু হয়। এই যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয় ও মারাঠা সামন্ত রাজাদের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণের কাহিনী পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে (পৃষ্ঠা ১৪৫-১৪৮)।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮০৩)

বিনা যুদ্ধেও ওয়েলেসলি কয়েকটি দেশীয় রাজ্য অধিকার করেছিলেন। বিভিন্ন অজুহাতে তিনি সুরাট, তাঞ্জোর, কর্ণাটক এবং অযোধ্যা রাজ্যের একাংশ অধিকার করে নিয়েছিলেন।

অন্যান্য রাজ্য অধিকার

ওয়েলেসলির পদত্যাগের (১৮০৫) পর ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ভারতের ইংরাজ সরকার পুনরায় ঔদাসীন্য নীতি অনুসরণ করে। এই সময়ের মধ্যে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয়নি। অবশ্য রণজিৎ সিংহের সঙ্গে অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৫) স্বাক্ষর করে **লর্ড মিণ্টো** (১৮০৭-১৮১৩) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বৃটিশ প্রাধান্য বিস্তৃত করেছিলেন।

ঔদাসীন্য নীতির পুনঃপ্রবর্তন (১৮০৫-১৮১৩)

লর্ড ময়রা (বা **হেস্টিংস**) গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হয়ে ঔদাসীন্য নীতি বর্জন করে পুনরায় সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকালে (১৮১৩-১৮২৩) **ইঙ্গ-নেপাল বা গুর্খা যুদ্ধ** (১৮১৪-১৮১৬) এবং **তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ** (১৮১৭-১৮১৮) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নেপাল রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা ও কোম্পানীর সাম্রাজ্যের উত্তর সীমানা সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় প্রায়ই সীমান্ত-সংঘর্ষ হত এবং এই কারণেই শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ সুরু হয়। কিছুকাল যুদ্ধের পর গুর্খারা **সগোলির সন্ধি** স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। সন্ধির সর্তানুসারে ইংরাজরা কুমায়ুন ও গাড়োয়াল জিলা এবং তরাই অঞ্চলের একাংশ লাভ করে। সিকিমে গুর্খা আধিপত্য লুপ্ত হয়। নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে একজন বৃটিশ প্রতিনিধি নিযুক্ত হন।

লর্ড হেষ্টিংস্ (১৮১৩-১৮২৩)

ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ (১৮১৪-১৮১৬)

লর্ড হেস্টিংসের শাসনকালে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে মারাঠা শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। এই যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে (পৃষ্ঠা ১৪৮-১৪৯)।

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে জয়লাভ (১৮১৮)

পিণ্ডারী দমন বা পিণ্ডারী যুদ্ধে (১৮১৭-১৮১৮) সাফল্য লর্ড হেস্টিংসের আর এক স্মরণীয় কীর্তি। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়ে গঠিত পিণ্ডারী নামে একদল সশস্ত্র দস্যু মধ্য ভারত ও রাজপুতানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আক্রমণ ও লুঠতরাজ করে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। কোম্পানীর রাজ্যের শান্তিও তারা বিঘ্নিত করেছিল। এই দস্যুদলের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে হেস্টিংস তাদের দমন করেন। পিণ্ডারী নেতারা ইংরাজ বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে সাফল্যের ফলে ভারতে ইংরাজ প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ভূপালের নবাব অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করেন (১৮১৮)। পিণ্ডারী যুদ্ধ পরোক্ষভাবে রাজপুতানায় ইংরাজ আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করেছিল।

পিণ্ডারী যুদ্ধ (১৮১৭-১৮১৮)

দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন রাজপুত রাজ্যগুলি উপলব্ধি করেছিল যে ইংরাজদের সাহায্য ভিন্ন ঐ নির্মম দস্যুদের আক্রমণ ও অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি লাভ সম্ভব নয়। কিছুকালের মধ্যে রাজপুত রাজ্যগুলি ইংরাজদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হলে রাজপুতানায় বৃটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজপুতানায় ইংরাজ প্রাধান্য বিস্তার

পরবর্তী পঁচিশ বছর (১৮২৩-১৮৪৮) ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থিতি ও সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে। **লর্ড আমহার্স্ট**-এর শাসনকালে (১৮২৩-১৮২৮) **প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধে** (১৮২৪-১৮২৬) জয়লাভের ফলে ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বৃটিশ অধিকার বিস্তৃত হয় ও সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সুরক্ষিত হয়। ভরতপুরের দুর্গ অধিকার (১৮২৬) আমহার্স্টের শাসনকালের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

লর্ড আমহার্স্ট ও প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮২৪-১৮২৬)

পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল **লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক** (১৮২৯-১৮৩৫) তাঁর শাসন ও সমাজ-সংস্কারের জন্য অধিকতর প্রসিদ্ধ হলেও তাঁর সময় কুর্গ ও মহীশূর রাজ্য এবং পূর্ব দিকে কাছাড় ও জয়ন্তিয়া জিলা বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমে রণজিৎ সিংহ ও সিন্ধু প্রদেশের আমীরদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে তিনি সম্ভাব্য রুশ আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ইংলণ্ডের শাসকগণ এই সময় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। মূলতঃ রুশ আতঙ্ক ও অন্যান্য ঘটনাচক্রের ফলে **লর্ড অকল্যাণ্ড**-এর সময় (১৮৩৬-১৮৪২) **প্রথম আফগান যুদ্ধ** সুরু হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজদের শোচনীয় বিপর্যয় এবং মর্যাদাহানি হয়েছিল।

উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের পররাষ্ট্রনীতি

লর্ড অকল্যাণ্ড ও প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯-১৮৪২)

লর্ড এলেনবরার শাসনকালে (১৮৪২-১৮৪৪) ইংরাজ সেনাপতি স্যার চার্লস নেপিয়ার সিন্ধুদেশের আমীরদের পরাজিত করে ঐ অঞ্চলে ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

সিন্ধু বিজয় (১৮৪৩)

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখরাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। দৈবদুর্ঘটনা ও চক্রান্তে অল্পকালের মধ্যে তাঁর দুই পুত্র ও এক পৌত্র নিহত হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের নাবালক পুত্র **দলীপ সিংহ** তাঁর মাতা **রাণী ঝিন্দনের** অভিভাবকত্বে সিংহাসনে বসেন। এই সময় খালসা

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-১৮৪৬)

সৈন্যদল দুর্বল শাসনের সুযোগে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। রাজমাতা ঝিন্দন বা অন্য কেউই এই সৈন্যদলকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তাদের ইংরাজ রাজ্য আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেন। শিখরাজ্যের সীমান্তে ইংরাজদের তৎপরতা ইতিমধ্যেই শিখদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শিখবাহিনী অমৃতসরের সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করে শতদ্রু নদী অতিক্রম করলে **প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ** সুরু হয়। পরপর চারটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শিখরা ইংরাজদের সঙ্গে **লাহোরের সন্ধি** (১৮৪৬) করতে বাধ্য হয়। এই সন্ধির সর্তানুসারে শিখরাজ্যের একাংশ ইংরাজ অধিকারভুক্ত হয় এবং শিখরা প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। গুলাব সিংহ নামে জনৈক স্বার্থান্বেষী ডোগরা সর্দার প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কাশ্মীর রাজ্যটি লাভ করেন। দলীপ সিংহ নামেমাত্র শিখরাজ্যের অধিপতি থাকলেও প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাবে ইংরাজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

লাহোরের সন্ধি (১৮৪৬)

লাহোরের সন্ধির অপমানজনক সর্ত এবং শিখরাজ্যে ইংরাজদের উপস্থিতি ও প্রাধান্য স্বাধীনচেতা শিখদের পক্ষে দীর্ঘকাল সহ্য করা সম্ভব হয়নি। অল্পকালের মধ্যেই শিখরাজ্যের এক আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে **দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ** (১৮৪৮-১৮৪৯) সুরু হয়। প্রথমে **চিনিয়ালওয়ালার যুদ্ধে** (১৮৪৯) ইংরাজবাহিনী জয়লাভ করতে না পারলেও অল্প দিনের মধ্যে **গুজরাটের যুদ্ধে** শিখেরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসী এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা পাঞ্জাবকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। রাজ্যচ্যুত শিখ নৃপতি দলীপ সিংহকে বৃত্তিদান করে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়। এইভাবে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর মাত্র দশ বছরের মধ্যে শিখ রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটে। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে আর এক বড় অন্তরায় দূর হয়।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-১৮৪৯)

শিখশক্তির অবলুপ্তি

ওয়েলেসলি ও লর্ড হেস্টিংসের মত **লর্ড ডালহৌসী** (১৮৪৮-১৮৫৬) ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে বিশেষ সাফল্যলাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে সমগ্র পাঞ্জাব বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়েছিল। তাঁর সময় **দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ** অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রহ্মদেশে ইংরাজ বণিকদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও একজন ইংরাজ দূতকে অপমান করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধ সুরু হয়। যুদ্ধে জয়লাভের পর

ভারতবর্ষ
বৃটিশ অধিকারের ক্রম-বিস্তার
কাবুল
আফগানিস্থান
পারস্য
কাশ্মীর
পঞ্জাব
শিখরাজ্য
বেলুচিস্থান
সিন্ধু
রাজপুতানা
দিল্লী
আজমীঢ়
নেপাল
ব্রহ্মপুত্র নদ
ভুটান
গঙ্গা নদী
আসাম
বঙ্গদেশ
কলিকাতা
মান্দালয়
রেঙ্গুন
শ্যাম
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
বোম্বাই
বেরার
নিজাম রাজ্য
গোয়া (পর্তুগীজ)
কুর্গ
মহীশূর
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরী (ফরাসী)
ত্রিবাঙ্কুর
আন্দামান দ্বীঃ পুঃ
নিকোবর দ্বীঃ পুঃ
১৭৬৫ সালে
১৮০৫-সালের মধ্যে
১৮০৫-১৮৫৮-র মধ্যে
১৮৫৮-র পরে
ভারতীয় সামন্ত রাজ্য

ডালহৌসী এক ঘোষণাপত্র দ্বারা পেগু প্রদেশটি কোম্পানীর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন (১৮৫২)।

বিভিন্ন রাজ্য অধিকার

দুইজন ইংরাজ কর্মচারীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে তিনি সিকিম রাজ্যের একাংশ অধিকার করে নেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁর রাজ্যের বৃটিশ সৈন্যদের ব্যয় নির্বাহের জন্য টাকা দিতে না পারায় বেরার প্রদেশটি কোম্পানীকে দিতে বাধ্য হন। কুশাসনের অভিযোগে ডালহৌসী অযোধ্যা রাজ্যটি অধিকার করেন (১৮৫৬)।

ভারতে রাজ্যবিস্তারের জন্য ডালহৌসী **স্বত্বলোপ নীতি** (Doctrine of Lapse) প্রবর্তন করেন। সম্পূর্ণ অভিনব না হলেও তাঁর পূর্বে কোন গভর্নর-জেনারেল এই নীতি কঠোর-ভাবে কার্যকরী করেননি। ডালহৌসী ঘোষণা করেন যে ইংরাজ-আশ্রিত কোন রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ঐ রাজ্য কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হবে। দত্তকপুত্র গ্রহণ করার পূর্বে অপুত্রক দেশীয় রাজাদের ইংরাজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। এই নীতি প্রয়োগ করে ডালহৌসী সাতারা, ঝান্সি, নাগপুর, সম্বলপুর ইত্যাদি রাজ্য কোম্পানীর অধিকারভুক্ত করেন। কর্ণাটকের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজার দত্তকপুত্রদের এবং পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানা সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

লর্ড ডালহৌসী

ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য

বলপ্রয়োগ ও বিভিন্ন কৌশলের দ্বারা ডালহৌসী ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের রাজ্যবিস্তারের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও ডালহৌসীর আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইংরাজ-আশ্রিত দায়িত্বশূন্য দেশীয় রাজাদের শাসনাধীন না থেকে প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ শাসনাধীন হলে ভারতীয় প্রজাদের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি হবে। কিন্তু তাঁর অত্যুগ্র রাজ্যবিস্তার নীতির ফলে ভারতীয় রাজ্যসমূহে গভীর

আশঙ্কা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এই কারণে ডালহৌসীর রাজ্যগ্রাস-নীতিকে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের অন্যতম কারণ মনে করা হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

সংস্কার প্রবর্তনের সরকারী প্রচেষ্টা : নবজীবনের প্রাণস্পন্দন

শাসন ও বিবিধ সংস্কার প্রবর্তনে সরকারী উদ্যম : ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। মুনাফা অর্জনই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা, ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সুযোগে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের মত ইংরাজরাও ভারতে নিজেদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে ও ভাগ্যের সহায়তায় তারা সাফল্যলাভ করে ও বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বৃটিশ প্রভুত্বের সূচনা হয়। সিরাজদ্দৌলা ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। পরবর্তী নবাবরা ছিলেন ইংরাজদের ক্রীড়নক মাত্র। স্বাধীনচেতা মীরকাসিম এই অসহনীয় ইংরাজ প্রাধান্যের অবসান ঘটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। নবাব নজমউদ্দৌলার সঙ্গে নতুন চুক্তির (ফেব্রুয়ারী, ১৭৬৫) পর বাংলাদেশে ইংরাজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। নবাবের নামমাত্র ক্ষমতা ও মর্যাদাটুকুও লুপ্ত হয়।

পটভূমি

দেওয়ানীলাভের পর রাজ্যের প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী ইংরাজ কোম্পানী হলেও রাজস্ব আদায় ও শাসনের দায়িত্ব থাকে অক্ষম মর্যাদাহীন নবাবের উপর। অর্থাৎ এক বিরাট অঞ্চলে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করলেও শাসকের কোন দায়দায়িত্ব গ্রহণে কোম্পানী অনিচ্ছুক ছিল। অন্য দিকে নবাবের কোনও মর্যাদা ও ক্ষমতা না থাকলেও রাজ্যশাসনের গুরুদায়িত্ব ছিল তাঁর। ক্লাইভ-প্রবর্তিত এই **দ্বৈত শাসন** ব্যবস্থার ফলে রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার সীমা

দ্বৈত শাসনের কুফল

ছিল না। এই অব্যবস্থার চরম পরিণতিরূপে দেখা দেয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বা ভীষণ দুর্ভিক্ষ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ/ইং ১৭৭০)।

দ্বৈত শাসন-প্রসূত শোচনীয় অরাজকতা ও অব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে শাসন-সংস্কারের প্রবর্তন করেন **ওয়ারেন হেস্টিংস** (১৭৭২-১৭৮৫)। তিনি

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসন-সংস্কার

দ্বৈত শাসনব্যবস্থা রহিত করে প্রত্যক্ষভাবে শাসনভার গ্রহণ করেন। দুই অত্যাচারী রাজস্ব-সংগ্রহকারী রেজা খাঁ ও সীতাব রায়কে পদচ্যুত করে তিনি রাজস্ব সংগ্রহের জন্য **কালেক্টর** নামে ইংরাজ কর্মচারীদের নিযুক্ত করেন। রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য একটি **রেভিনিউ বোর্ড** বা সংস্থা গঠিত হয়।

রাজস্ব-সংস্কার

রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ এবং সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে জমিদারদের সঙ্গে পাঁচ বছর মেয়াদী বন্দোবস্ত করার জন্য ঐ বোর্ডের অধীনে একটি **ভ্রাম্যমাণ কমিটি** (Committee of Circuit) গঠন করা হয়। রাজকোষ মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।

হেস্টিংস বিচার-বিষয়ক ব্যবস্থারও উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেন। প্রতিটি

বিচার-বিষয়ক সংস্কার

জিলায় একটি দেওয়ানী আদালত ও একটি ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়। দেওয়ানী বিচারের ভার কালেক্টরের ওপর এবং ফৌজদারী বিচারের ভার দেশীয় বিচারকদের ওপর অর্পণ করা হয়। মফঃস্বল আদালতের আপীল বিচারের জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত স্থাপিত হয়। এইভাবে রাজস্ব ও বিচারব্যবস্থার সংস্কার করে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলাদেশে বৃটিশ শাসনব্যবস্থা সুসংবদ্ধ ও উন্নত করেন।

প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহ ও প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনে উৎসাহদান

প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা

ছিল হেস্টিংসের আর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১), এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪) ও বারাণসী সংস্কৃত কলেজ (১৭৯২) স্থাপিত হয়েছিল।

হেস্টিংসের শাসনকালে দুটি আইন প্রবর্তন করে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতে ইংরাজ কোম্পানীর কার্যকলাপ ও শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। **১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট**-এর দ্বারা বাংলার শাসনভার

গভর্নর-জেনারেল ও চার জন সদস্যবিশিষ্ট এক কাউন্সিলের ওপর অর্পণ করা হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির শাসনব্যবস্থা পৃথক থাকলেও অর্থনৈতিক ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তারা কিছুটা কলিকাতাস্থ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। কলিকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। কার্যকরী হওয়ার অল্পকালের মধ্যে রেগুলেটিং অ্যাক্টের বহু ত্রুটি ধরা পড়ে এবং কোম্পানীর শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় নানাবিধ অসুবিধা ও সমস্যা দেখা দেয়।

বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক কোম্পানীর শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা : রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩)

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম পিট **ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট** নামে একটি নতুন আইন পার্লামেন্টে পাস করান। এই আইন অনুসারে ছ'জন সদস্যবিশিষ্ট একটি নবগঠিত 'বোর্ড অব কণ্ট্রোল'-এর ওপর ভারতে ইংরাজ সরকারের সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃত্ব ও নীতি নির্ধারণের ভার দেওয়া হয়। যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যান্য ব্যাপারে বোম্বাই ও মাদ্রাজের সরকার বাংলার গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলের নিরন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। কোম্পানীর ডিরেক্টর ও অংশীদারদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়।

পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (১৭৮৪)

ওয়ারেন হেস্টিংস-প্রবর্তিত রাজস্ব ও বিচারবিভাগীয় সংস্কার সত্ত্বেও কোম্পানীর শাসনপদ্ধতি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলামুক্ত হয়নি। হেস্টিংসের পদত্যাগের কিছুকাল পর **লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩)** যখন গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হয়ে বাংলায় আসেন তখন শাসন-সংস্কারই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। কোম্পানীর কর্মচারীদের অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের প্রবণতা দূর করার জন্য তিনি তাঁদের বেতন বৃদ্ধি করেন। দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা সুরক্ষিত করার জন্য গ্রামাঞ্চলে থানা-পুলিশ ব্যবস্থার উন্নতি করেন। প্রত্যেক জেলায় জজ্ ও ম্যাজিস্ট্রেট (District Judge and Magistrate) এবং কালেক্টর এই দু'জন কর্মচারী নিযুক্ত হয়। বিচার ও শান্তিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় ম্যাজিস্ট্রেটকে। শুধুমাত্র রাজস্ব সংগ্রহের ভার থাকে কালেক্টরের ওপর। নিম্ন আদালত থেকে আপীলের বিচারের জন্য চারটি প্রাদেশিক আদালত স্থাপন করা হয়। প্রত্যেক প্রাদেশিক আদালতে তিনজন ইংরাজ বিচারক নিযুক্ত হন। এই বিচারকরা নিজেদের এলাকায় ঘুরে ঘুরে ফৌজদারী বিচার করতেন। বিচারকার্যে তাঁরা এদেশীয় হিন্দু ও মুসলমান আইনজ্ঞ কর্মচারীদের সাহায্য

লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসন-সংস্কার

বিচারবিভাগীয় সংস্কার

গভর্নর-জেনারেল ও চার জন সদস্যবিশিষ্ট এক কাউন্সিলের ওপর অর্পণ করা হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির শাসনব্যবস্থা পৃথক থাকলেও অর্থনৈতিক ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তারা কিছুটা কলিকাতাস্থ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। কলিকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। কার্যকরী হওয়ার অল্পকালের মধ্যে রেগুলেটিং অ্যাক্টের বহু ত্রুটি ধরা পড়ে এবং কোম্পানীর শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় নানাবিধ অসুবিধা ও সমস্যা দেখা দেয়।

বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক কোম্পানীর শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা : রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩)

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম পিট **ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট** নামে একটি নতুন আইন পার্লামেন্টে পাস করান। এই আইন অনুসারে ছ'জন সদস্যবিশিষ্ট একটি নবগঠিত 'বোর্ড অব কণ্ট্রোল'-এর ওপর ভারতে ইংরাজ সরকারের সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃত্ব ও নীতি নির্ধারণের ভার দেওয়া হয়। যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যান্য ব্যাপারে বোম্বাই ও মাদ্রাজের সরকার বাংলার গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। কোম্পানীর ডিরেক্টর ও অংশীদারদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়।

পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (১৭৮৪)

ওয়ারেন হেস্টিংস-প্রবর্তিত রাজস্ব ও বিচারবিভাগীয় সংস্কার সত্ত্বেও কোম্পানীর শাসনপদ্ধতি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলামুক্ত হয়নি। হেস্টিংসের পদত্যাগের কিছুকাল পর **লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩)** যখন গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হয়ে বাংলায় আসেন তখন শাসন-সংস্কারই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। কোম্পানীর কর্মচারীদের অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের প্রবণতা দূর করার জন্য তিনি তাঁদের বেতন বৃদ্ধি করেন। দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা সুরক্ষিত করার জন্য গ্রামাঞ্চলে থানা-পুলিশ ব্যবস্থার উন্নতি করেন। প্রত্যেক জেলায় জজ্ ও ম্যাজিস্ট্রেট (District Judge and Magistrate) এবং কালেক্টর এই দু'জন কর্মচারী নিযুক্ত হয়। বিচার ও শান্তিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় ম্যাজিস্ট্রেটকে। শুধুমাত্র রাজস্ব সংগ্রহের ভার থাকে কালেক্টরের ওপর। নিম্ন আদালত থেকে আপীলের বিচারের জন্য চারটি প্রাদেশিক আদালত স্থাপন করা হয়। প্রত্যেক প্রাদেশিক আদালতে তিনজন ইংরাজ বিচারক নিযুক্ত হন। এই বিচারকরা নিজেদের এলাকায় ঘুরে ঘুরে ফৌজদারী বিচার করতেন। বিচারকার্যে তাঁরা এদেশীয় হিন্দু ও মুসলমান আইনজ্ঞ কর্মচারীদের সাহায্য

লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসন-সংস্কার

বিচারবিভাগীয় সংস্কার

নিতেন। কর্নওয়ালিস-প্রবর্তিত শাসন ও বিচারবিভাগীয় সংস্কারগুলি সঙ্কলিত হয়ে **কর্নওয়ালিস কোড** নামে পরিচিত হয়। কর্নওয়ালিস ভারতীয়দের চরিত্র ও সততা সম্বন্ধে অত্যন্ত নিম্ন ধারণা পোষণ করতেন। এই কারণে তিনি ভারতীয়দের শাসন বা বিচারবিভাগের কোন মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেননি।

কর্নওয়ালিসের শাসনকালের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ভূমিরাজস্ব-সংক্রান্ত **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** (Permanent Settlement) প্রবর্তন (১৭৯৩)। ব্যবস্থা অনুসারে স্থির হয় যে জমিদার বংশানুক্রমে জমির মালিক থাকবেন এবং তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব কোম্পানীকে প্রদান করতে হবে। রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের জন্য নির্ধারিত হবে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জমিদার যদি তাঁর দেয় রাজস্ব জমা দিতে না পারেন তাহলে তাঁর জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষগুণ সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু কর্নওয়ালিস-প্রবর্তিত এই ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মতানৈক্য নেই।

লর্ড কর্নওয়ালিস

ভারতীয়দের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি

দীর্ঘকাল ইংরাজ সরকার হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক ছিল। তাদের আশঙ্কা ছিল যে হস্তক্ষেপ করলে এ দেশের মানুষের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেবে এবং ইংরাজ অধিকার বিপন্ন হতে পারে। শাসকদের কর্তব্য পালনেও কোম্পানীর অনীহা ছিল। রাজ্যবিস্তার ও সাম্রাজ্যকে নিরাপদ ও সুদৃঢ় করাই ছিল ইংরাজদের প্রধান লক্ষ্য। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে বৃটিশ আধিপত্য সুনিশ্চিতভাবে স্থাপিত হবার পর ইংরাজ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতির পরিবর্তন সূচিত হয়। ইতিপূর্বে অবশ্য নিষ্ঠুর **শিশুহত্যা প্রথা নিষিদ্ধ** করা হয়েছিল।

সরকারী নীতি পরিবর্তনের সূচনা

ভারতের কোন কোন অঞ্চলের অনুন্নত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথার প্রচলন ছিল।

কোম্পানীর শিক্ষানীতি

এদেশের **শিক্ষাবিস্তার** সম্বন্ধেও কোম্পানী দীর্ঘকাল উদাসীন ছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী উদ্যোগে কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় এবং শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থের ব্যবহার সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণের জন্য 'কমিটি অব্ পাবলিক ইন্সট্রাকশন' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়।

বেণ্টিঙ্কের বিবিধ সংস্কার

উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-১৮৩৫) তাঁর আভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি যখন গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হয়ে আসেন তখন শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ প্রাচ্য না পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে এই নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছিল। প্রাচ্যবিদ্যা প্রচারের সমর্থকরা 'ওরিয়েন্টালিস্ট' এবং পাশ্চাত্যবিদ্যার সমর্থকরা 'অ্যাংলিসিস্ট্' নামে পরিচিতি লাভ করেন। কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনের সদস্যরাও এই প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কমিটির সভাপতি **টমাস ব্যাবিংটন মেকলে** পাশ্চাত্য শিক্ষার উগ্র সমর্থক ছিলেন। বেণ্টিঙ্ক নিজেও এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সপক্ষে ছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণা করা হয় যে অতঃপর পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারের জন্যই সরকারী অর্থ ব্যয় করা হবে। এই সিদ্ধান্ত এক ঐতিহাসিক ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পাশ্চাত্য ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের পথ সুগম হওয়ায় ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ও পরিবর্তন দেখা দেয়। কলিকাতায় **মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা** (১৮৩৫) বেণ্টিঙ্কের শাসনকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই কলেজটিই সর্বপ্রথম আমাদের দেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা-চর্চার সূত্রপাত করে।

শিক্ষানীতি সম্বন্ধে মতভেদ

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে বেণ্টিঙ্কের ভূমিকা

সতীদাহ প্রথার অবসান (১৮২৯)

সতীদাহ প্রথার অবসান বেণ্টিঙ্কের এক স্মরণীয় কীর্তি। ইতিপূর্বে কয়েকবার আইনের দ্বারা এই ভয়াবহ নিষ্ঠুর প্রথা রোধ করার আংশিক প্রচেষ্টা সফল হয়নি। এর কারণ, সরকারী প্রচেষ্টায় তেমন দৃঢ়তা ও একাগ্রতা ছিল না এবং

সুসংবদ্ধ প্রগতিশীল কোন জনমত তখনও গঠিত হয়নি। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষিত এক আইনের দ্বারা বেন্টিঙ্ক বৃটিশ অধিকারভুক্ত অঞ্চলে এই প্রথা নিষিদ্ধ করেন (পৃষ্ঠা ১৮৩-১৮৪ দ্রষ্টব্য)। কয়েক বছর পর লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় ভারতীয় রাজ্যসমূহেও এই প্রথা রোধ করা হয়।

ঠগীদমন

ঠগী নামে পরিচিত নির্মম দস্যুদলকে দমন করে বেন্টিঙ্ক জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এই দস্যুরা শ্বাসরোধ করে বহু নিরীহ পথচারীকে হত্যা করে তাদের সর্বস্ব লুঠ করত। উইলিয়ম শ্লীম্যান ও অন্যান্য ইংরাজ কর্মচারীদের সহায়তায় বেন্টিঙ্ক এই দস্যুদলকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অর্থসঙ্কটের সমাধান

তাঁর **শাসন-সংস্কারের** জন্যও বেন্টিঙ্ক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে কোম্পানীর অর্থসঙ্কট দেখা দিয়েছিল। রাজকর্মচারী ও সৈন্যদের বেতন ও ভাতা হ্রাস, শুল্ক ও করবৃদ্ধি, ব্যয়সঙ্কোচ প্রভৃতি উপায়ে বেন্টিঙ্ক এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

বিচারবিভাগীয় সংস্কার

স্বল্পব্যয়ে ও অল্প সময়ের মধ্যে বিচারকার্য যাতে সম্পন্ন হয় এই উদ্দেশ্যে বেন্টিঙ্ক কয়েকটি **বিচারবিভাগীয় সংস্কার** প্রবর্তন করেছিলেন। কর্নওয়ালিস-স্থাপিত প্রাদেশিক বিচারালয়গুলি তুলে দিয়ে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর পুনরায় ফৌজদারী বিচারের ভার অর্পণ করা হয় এবং স্থির হয় যে একই ব্যক্তি হবেন ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। আদালতে ফার্সী ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার ব্যবহার প্রবর্তিত হয়।

ভারতীয়দের সরকারী পদে নিয়োগ

লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতীয়দের ক্ষমতা ও মর্যাদাপূর্ণ সরকারী পদে নিযুক্ত হওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন। এইজন্য শিক্ষিত ও যোগ্য ভারতীয়দের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ছিল। **১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের নতুন সনন্দে** ঘোষণা করা হয় যে জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে ভারতীয়দের যোগ্যতা অনুসারে রাজপদে নিযুক্ত হতে কোন বাধা থাকবে না। সাবজজ্, জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর প্রভৃতি সরকারী পদে শিক্ষিত ভারতীয়দের নিযুক্ত করে বেন্টিঙ্ক এই ঘোষিত নীতি আংশিকভাবে কার্যকরী করেছিলেন।* সাম্রাজ্যবিস্তার অপেক্ষা প্রজাকল্যাণমূলক

* ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে বাংলার গভর্নর-জেনারেল ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেলরূপে অভিহিত হন। বেন্টিঙ্ক ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল।

নীতি ও বহুমুখী সংস্কারের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসকদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬) সাম্রাজ্যবিস্তারে উৎসাহী ও তৎপর হলেও আভ্যন্তরীণ সংস্কারের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। জনসাধারণের কল্যাণসাধনের ইচ্ছা ছাড়া তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও উন্নতি সম্বন্ধে সক্রিয় না হলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য সুসংবদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে এবং জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে পারবে না।

লর্ড ডালহৌসীর আভ্যন্তরীণ সংস্কার

বিভিন্ন সংস্ক এবং **নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে ডালহৌসী ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের সূচনায় সহায়তা করেন**। তাঁর সময় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রেলপথ নির্মিত হয়। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সংস্কার, গঙ্গার খালখনন, রাজপথ ণ, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ইত্যাদি করে তিনি যোগাযোগ ও পরিবহণ-ব্যবস্থ. বিশেষ উন্নতি করেন। এই সব কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি পূর্তবিভাগ নামে একটি নতুন বিভাগ স্থাপন করেন। টেলিগ্রাফ এবং দু'পয়সার ডাক টিকিটের প্রবর্তন ছিল ডালহৌসীর আমলের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি

শিক্ষাবিস্তারে ডালহৌসীর বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ভারতে পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার দ্রুত প্রসার হতে থাকে ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস্ উড্ ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে নীতি ঘোষণা করে এক নির্দেশপত্র (Educational Despatch) প্রেরণ করেন। এই নির্দেশ অনুসারে একটি 'শিক্ষাবিভাগ' (Department of Public Instruction) স্থাপিত হয় এবং কিছুকাল পরে **১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।** উডের নির্দেশপত্র কার্যকরী করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যাপারে ডালহৌসী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেও তাঁর উৎসাহ ছিল। বেথুন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় (বর্তমান বেথুন কলেজ) তাঁর আনুকূল্য লাভ করেছিল। রুড়কীর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা তাঁর আর এক কীর্তি।

শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহ

সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রতি ডালহৌসী সহানুভূতিশীল ছিলেন।

বিধবাবিবাহ আইন (১৮৫৬)

হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ ঘোষণা করে তিনি এক আইন প্রবর্তন করেছিলেন (১৮৫৬)। এই আইন পাস হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবাবিবাহ আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয় (পৃষ্ঠা ১৯০-১৯১ দ্রষ্টব্য)। ইতিপূর্বে ধর্মান্তর-গ্রহণকারী ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হতেন। ডালহৌসী এই প্রথা রহিত করেছিলেন। এর ফলে হিন্দুসমাজে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দ আইন

ডালহৌসীর আমলের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দ আইন। প্রতি কুড়ি বছর অন্তর কোম্পানীর সনন্দ পুনরায় মঞ্জুর করা হত। ইতিপূর্বে ১৭৯৩, ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সনন্দ আইন প্রবর্তিত হয়েছিল এবং প্রতিবারই উল্লেখযোগ্য শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারতে কোম্পানীর শাসনের উপর বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৫৩ সালের সনন্দ আইনের দ্বারা আইন প্রণয়নের জন্য একটি ব্যবস্থাপক সভা গঠন এবং বাংলায় একজন পৃথক শাসনকর্তা নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চ সরকারী পদে নিয়োগের নীতিও গৃহীত হয়।

১৮৫৭-এর বিদ্রোহের পরবর্তী যুগের সংস্কারের সংক্ষিপ্তসার

ডালহৌসীর শাসনকালের অব্যবহিত পরেই ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ দেখা দেয়। ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবিস্তার ও আভ্যন্তরীণ সংস্কার নীতিকে এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলে গণ্য করা হয়। এর ফলে বিদ্রোহের পরবর্তী যুগে ইংরাজ সরকার আভ্যন্তরীণ সংস্কার, বিশেষ করে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ সম্রাজ্ঞীর শাসনাধীন ভারতের প্রথম ভাইসরয় **লর্ড ক্যানিং** (১৮৫৬-১৮৬২) সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে কয়েকটি শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করেন। তার মধ্যে হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা, আয়করের প্রবর্তন ও কাগজের মুদ্রার প্রচলন উল্লেখযোগ্য। লর্ড এলগিন, স্যার জন লরেন্স, লর্ড মেয়ো এবং নর্থব্রুকের শাসনকালেও কিছু কিছু সংস্কার প্রবর্তিত হয়।

লর্ড লিটন (১৮৭৬-১৮৮০) ছিলেন একজন প্রতিক্রিয়াশীল ভাইসরয়।

তাঁর শাসনকালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ করেন।

লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন

লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র-পত্রিকার অধিকার খর্ব করেছিলেন ও সরকারী অনুমোদন ছাড়া অস্ত্রব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন (১৮৭৮)। দেশে যখন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চলেছে, সেই সময় যুদ্ধ ও রাজকীয় সমারোহের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করে তিনি জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

লিটনের পরবর্তী ভাইসরয় **লর্ড রিপন** (১৮৮০-১৮৮৪) ছিলেন উদারপন্থী। তিনি ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। দেশীয় সংবাদপত্র-পত্রিকার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, শিক্ষাবিস্তার ও উন্নতির জন্য হাণ্টার কমিশন নিয়োগ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি প্রবর্তন, কাপড় ও লবণের ওপর থেকে শুল্ক রহিত করা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক ও প্রগতিশীল কাজের জন্য তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। রাজস্ব ও কৃষিবিভাগের সংস্কার, শ্রমজীবীদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, আদমসুমারী বা লোকগণনার প্রবর্তন (১৮৮১) ইত্যাদি কাজের জন্যও তিনি খ্যাতিলাভ করেন।

লর্ড রিপন

নবজীবনের প্রাণস্পন্দন

অষ্টাদশ শতাব্দী ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অন্ধকারময় যুগ। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উচ্চাভিলাষী ক্ষমতালিপ্সু আমীর-ওমরাহ ও রাজপুরুষদের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ড সমগ্র দেশের আবহাওয়াকে কলুষিত ও বিষাক্ত করে তোলে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অরাজকতার অশুভ প্রভাবে ভারতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পলাশীর যুদ্ধের কলঙ্কিত ঘটনাবলীতে তৎকালীন জীবনের সার্বিক অধঃপতন প্রতিফলিত হয়েছিল।

অন্ধকারময় অষ্টাদশ শতাব্দী

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালী জীবন

অন্তঃসারশূন্য ও মৃতপ্রায় মনে হলেও এই সময় থেকেই আসন্ন নবজীবনের লক্ষণ অর্ধস্ফুট হয়ে ওঠে। পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক হয়। এর ফলে ভারতীয় চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং নবজীবনের সূচনা হয়। স্যার যদুনাথ সরকার প্রমুখ খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের মতে পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকে ভারতবর্ষে আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়। কিন্তু কেবলমাত্র পাশ্চাত্য সংঘাতের ফলেই ভারতবর্ষে জাগরণ ঘটেনি।

পাশ্চাত্য সংঘাত ও আধুনিক যুগের সূচনা

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে গবেষণালব্ধ জ্ঞান, প্রাচ্যবিদ্যা ও সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চা, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার উন্নতি ও উৎকর্ষ, খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের কার্যাবলী, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বহু মানুষের আবির্ভাব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের সমন্বিত প্রভাবের ফলেই এই জাগরণ দেখা দিয়েছিল।

উনিশ শতকের জাগরণের বিভিন্ন কারণ

বিগত শতকে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রাণচাঞ্চল্য ও পরিবর্তন দেখা দেয়। দীর্ঘ দিনের জড়ত্বের পর ভারতীয় জীবনে প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। প্রথমে বাংলা দেশে সুরু হয়ে এই আলোড়ন দেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রসারিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনারীদের প্রচেষ্টার ফলে সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজসংস্কার প্রভৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ দেশে সদ্য আগত অনভিজ্ঞ তরুণ ইংরাজ রাজকর্মচারীদের শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটির বাংলার নবজাগরণে, বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। উইলিয়াম কেরী এই কলেজের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতের বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। অন্য দিকে শ্রীরামপুর মিশনের তিনি ছিলেন অন্যতম কর্ণধার। শ্রীরামপুর মিশনও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড ছিলেন এই মিশনের অপর দু'জন খ্যাতনামা মিশনারী। উনিশ শতকের নবজাগরণের ক্ষেত্র-প্রস্তুতিতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্সের উদ্যোগে স্থাপিত এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি

নবজীবনের প্রথম লক্ষণ

সম্বন্ধে গবেষণার সূচনা করে। এইসব গবেষণালব্ধজ্ঞান গ্রন্থ ও প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হলে ভারতীয়রা নিজেদের বিস্মৃত গৌরব ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে আত্ম-গৌরব ও আত্ম-বিশ্বাসের উন্মেষ হয়।

রাজা রামমোহন রায়
(১৭৭২।১৭৭৪-১৮৩৩)

রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২, মতান্তরে ১৭৭৪-১৮৩৩) বহুমুখী ও বিস্ময়কর প্রতিভা, অসাধারণ দূরদৃষ্টি ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলে নতুন যুগের সূচনা ত্বরান্বিত হয়েছিল। রামমোহন অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তিনি প্রগতিশীল মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টির প্রয়াস করেছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন তাঁর বন্ধুবান্ধব ও অনুগামীদের নিয়ে **আত্মীয় সভা** নামে একটি ঘরোয়া গোষ্ঠী স্থাপন করেন। এই সভার সদস্যদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নন্দকিশোর বসু, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ-প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিলেন। ধর্মীয়, সামাজিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ এই সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে আলোচিত হত। ডেভিড হেয়ার, উইলিয়াম অ্যাডাম, জেমস্ সিল্ক্ বাকিংহাম প্রভৃতি ভারতহিতৈষী বিদেশীরা ছিলেন রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী।

ধর্মসংস্কার

রামমোহন মনে করতেন যে হিন্দুধর্ম ও সমাজের অধঃপতনের মূল কারণ মূর্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক আড়ম্বরবহুল আচার-অনুষ্ঠান। মূর্তিপূজার তীব্র সমালোচনা করে তিনি নিরাকার ব্রহ্মের আরাধনার শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্থকতা প্রচার করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি **ব্রাহ্ম সমাজ** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৮২৮)। বাংলা ভাষায় উপনিষদ্ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করে তিনি সংস্কৃতচর্চার পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করেছিলেন।

সমাজসংস্কার

সমাজসংস্কারে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলেই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শক্তিশালী ও সার্থক হয়েছিল। প্রগতিশীল ভারতীয় জনমতের সমর্থন না

থাকলে বেণ্টিঙ্কের পক্ষে এই নিষ্ঠুর প্রথা তুলে দেওয়া (১৮২৯) সম্ভব হত না। বহুবিবাহ প্রথা, সমাজে নারীর অমর্যাদা ও তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ইত্যাদির তিনি বিরোধিতা করেছিলেন।

শিক্ষাবিষয়ক মতবাদ

রামমোহন নিজে সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে মধ্যযুগীয় অজ্ঞানতা ও জড়তা দূর করে ভারতীয়দের উন্নত ও প্রগতিশীল করে তুলতে হলে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার একান্ত প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের জ্ঞানালোক ও যুক্তিবাদ ছাড়া ভারতে আধুনিক যুগের সূচনা হতে পারে না। এই কারণেই তিনি কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গভর্নর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট'কে চিঠি লিখেছিলেন (১৮২৩)। তিনি সম্ভবতঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭) প্রাথমিক প্রস্তাবনা ও আলোচনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার এবং ক্রমোন্নতির মূলে ছিলেন ডেভিড হেয়ার। বাংলা দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে এই প্রতিষ্ঠানটি অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে অবদান

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আন্দোলন (১৮১৩), বিচারের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ (১৮২১), ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ভারতীয়দের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও দাবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এবং অন্যান্য নানাভাবে তিনি ভারতে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে সহায়তা করেছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি তাঁর গভীর সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। তাঁর মানবিকতা ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী সে যুগে বিরল ছিল।

অন্যান্য অবদান

রামমোহন সুলেখক ছিলেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে তাঁর বিশিষ্ট অবদান আছে। অন্যান্য নানাবিধ ক্ষেত্রেও রামমোহন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জীবন ও চিন্তার প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ব্রিস্টল শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল ভাবধারার সংঘাত

রামমোহনের মতামত ও কার্যাবলী, বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের কঠোর সমালোচনা রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কলিকাতার অভিজাত ও বিত্তশালী হিন্দুসমাজের নেতা ছিলেন শোভাবাজারের

রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা। সভা-সমিতি, পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের তীব্র নিন্দা করে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করতে উদ্যোগী হন। এইভাবে প্রগতিশীল ও রক্ষণশীলদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে হিন্দুসমাজ যখন আলোড়িত, সেই সময় একদল ইংরাজী শিক্ষিত তরুণের মতবাদ ও আচরণ তুমুল উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

অভিজাত ও বিত্তশালী হিন্দু পরিবারের সন্তানদের পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৮১৭)। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পিছনে ছিল ডেভিড হেয়ারের উদ্যম ও রক্ষণশীল হিন্দুদের সমর্থন ও সাহায্য। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে তরুণ ছাত্রদের মন হিন্দু ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। 'নব্যবঙ্গ' (Young Bengal) নামে অভিহিত এই তীক্ষ্ণধী ছাত্রদলের সবচেয়ে প্রিয় ও আদর্শ পুরুষ ছিলেন **ডিরোজিও** (১৮০৯-১৮৩১) নামে এক বিস্ময়কর প্রতিভাবান তরুণ ফিরিঙ্গী শিক্ষক। স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদে বিশ্বাসী ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের ন্যায়, সততা, সত্যানুসন্ধিৎসা, দেশপ্রেম ও পরহিতৈষণার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে শিক্ষা দিতেন ; বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া ছাত্রদের কোন কিছুই গ্রহণ বা স্বীকার করতে নিষেধ করতেন। তিনি তাঁর অনুগামী ছাত্রদের নিয়ে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন (Academic Association) নামে একটি সমিতি গঠন করেন (১৮২৮)। এই সমিতির অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক হত। তাঁর প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, রাধানাথ শিকদার ও অন্যান্যরা। নবলব্ধ শিক্ষার প্রভাব এবং তারুণ্যের উত্তেজনায় তাঁদের আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তায় উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনার আধিক্য দেখা দেয়। হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে ধ্বংস করাই যেন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য বলে মনে হত। আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হিন্দুনেতারা ডিরোজিওকে এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী মনে করেন। তিনি কলেজ থেকে পদচ্যুত হন এবং কয়েক মাস পরে এই বিস্ময়কর প্রতিভার অকালমৃত্যু হয় (১৮৩১)।

ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গ আন্দোলন

ডিরোজিওর মৃত্যু হলেও তাঁর প্রভাব লুপ্ত হয়নি। তাঁর আদর্শ ও

শিক্ষায় অনুপ্রাণিত তরুণরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেন। নব্যবঙ্গীয়দের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা-গুলির মধ্যে জ্ঞানান্বেষণ, এনকোয়ারার (Enquirer), হিন্দু পায়োনিয়ার, বেঙ্গল স্পেক্টেটর (Bengal Spectator) প্রভৃতি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই তরুণরা ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে Society for the Acquis tion o General Knowledge নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আন্দোলন, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার প্রচলন, শিক্ষা বিস্তার, পাঠাগার স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ জনহিতকর প্রচেষ্টার সঙ্গে নব্যবঙ্গীয়রা সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের সততা, আদর্শবোধ ও দেশপ্রেম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ব্যক্তি-গতভাবেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ নব্যবঙ্গীয়রা বাংলার জনজীবনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নব্যবঙ্গীয় নামে পরিচিত তরুণরা ডেভিড হেয়ারকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং সমস্ত গঠনমূলক কাজে হেয়ারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতেন। হেয়ারও এই তরুণদের সততা, আন্তরিকতা ও দেশকল্যাণের আদর্শকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতেন।

নব্যবঙ্গীয়দের প্রগতিশীল ভূমিকা

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে প্রগতিপন্থী, প্রাচীনপন্থী ও উগ্রপন্থীদের মধ্যে ভাবগত সংঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নবজীবনের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন রামমোহন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানবর্জিত নিরাকার ঈশ্বরের পূজাই হল হিন্দু ধর্মের প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ রূপ। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তকরূপে খ্যাত হলেও রামমোহন নিজেকে হিন্দু ছাড়া অন্য কিছু মনে করতেন না। ব্রাহ্ম ধর্মকে হিন্দু ধর্মেরই সমুন্নত রূপ বলে তিনি মনে করতেন। রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করার (১৮৩০) পর ব্রাহ্ম সমাজ এক সঙ্কটময় অবস্থার মধ্যে পড়ে। কিন্তু রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের আন্তরিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ব্রাহ্ম সমাজকে রক্ষা করেছিল।

ব্রাহ্ম আন্দোলন

রামমোহনের সুহৃদ ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র

দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫) যোগদান করার পর ব্রাহ্ম আন্দোলনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাঁর উৎসাহ ও উদ্যোগে স্থাপিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯) এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) বাংলার শিক্ষা, সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে। দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় অনেকে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ব্রাহ্ম ধর্ম অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। ব্রাহ্ম সমাজের কর্মতৎপরতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির মূলে রাজনারায়ণ বসু ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের বিশেষ অবদান ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিছুকাল পর **কেশবচন্দ্র সেন** (১৮৩৮-১৮৮৪) ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করলে ব্রাহ্ম আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাঁর বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে বহু তরুণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং ব্রাহ্ম আন্দোলন ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রসার লাভ করতে থাকে। কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিভা, একনিষ্ঠতা ও কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই দুজনের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। সমাজ-সংস্কারে কেশবচন্দ্রের আগ্রহ ও অধীরতা এবং উপবীতধারী প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মনোভাব ও মন্তব্য দেবেন্দ্রনাথ সমর্থন করেননি। এই বিরোধের পরিণতিরূপে কেশবচন্দ্র ও তাঁর সমর্থকরা **ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ** (১৮৬৬) নামে এক পৃথক ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। মূল সমাজটি **আদি ব্রাহ্ম সমাজ** নামে পরিচিত হয়।

কেশবচন্দ্র সেন

কেশবচন্দ্র সেন

কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণা ও তরুণ ব্রাহ্মদের উৎসাহের ফলে ব্রাহ্ম

আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করতে থাকে। এই সময় থেকে কেশবচন্দ্রের মধ্যে ভক্তিভাবের আধিক্য দেখা দেয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড যাত্রা করেন ও সেখানে সর্বত্র সমাদৃত হন। কয়েক মাস পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি **ভারতীয় সংস্কার সভা** (Indian Reform Association) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন (১৮৭০)। সমাজ সংস্কার ও জনগণের নৈতিক উন্নতি সাধন ছিল এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ। এই উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র নারী প্রগতি, শিক্ষা-প্রসার, সুলভ সাহিত্য, সেবাকার্য, সুরাপান এবং মাদক দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি প্রগতিশীল ও জনহিতকর কাজে ব্রতী হন। কিন্তু ঘটনাচক্রে অনতিকালপরে কেশবচন্দ্র ও তাঁর একদল অনুগামীর মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। কালের প্রভাবে কেশবচন্দ্রের সমাজসংস্কারবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁদের কাছে যথেষ্ট প্রগতিশীল বলে বিবেচিত হয়নি। তা ছাড়া নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের মধ্যে কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে ভক্তির আধিক্য ও তাঁর ওপর দেবত্ব আরোপ এই তরুণদের পছন্দ হয়নি। অবশেষে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মরা **সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ** নামে একটি পৃথক ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেন।

জনহিতকর কাজকর্ম

দ্বিতীয় অন্তর্বিরোধ (১৮৭৮)

উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনে ব্রাহ্মরা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল প্রগতিশীলতার প্রতীকস্বরূপ। সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু হিন্দুধর্মবহির্ভূত একটি পৃথক ধর্মান্দোলনরূপে ব্রাহ্ম-আন্দোলন জন-মানসে বিশেষ রেখাপাত করতে পারেনি।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের অবদান

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ব্রাহ্ম আন্দোলন প্রসারের জন্য কেশবচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরই উৎসাহে মহারাষ্ট্রে **প্রার্থনা সমাজ** প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মদের মত প্রার্থনা সমাজের সদস্যরাও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ও সমাজসংস্কারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের মত তাঁরা নিজেদের হিন্দুধর্ম ও সমাজবহির্ভূত স্বতন্ত্র কোন ধর্মমতের অনুগামী বলে মনে করতেন না। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদে বিশ্বাসী প্রার্থনা সমাজের সদস্যরা সমাজসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের জন্য নানাবিধ কার্যসূচী গ্রহণ

প্রার্থনা সমাজ

করেছিলেন। প্রার্থনা সমাজের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে **মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বামী দয়ানন্দ ও আর্য সমাজ

পাশ্চাত্য আদর্শ ও ভাবধারার ব্যাপক বিস্তার, খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং প্রার্থনা সমাজের প্রতিষ্ঠার ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বৈদিক আদর্শের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে পাঞ্জাবে **স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী** (১৮২৪-১৮৮৩) **আর্য সমাজ** প্রতিষ্ঠা করেন। এই একেশ্বরবাদী সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, একমাত্র বেদ ছাড়া অন্য সমস্ত ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্র অস্বীকার করেন। তিনি হিন্দু সমাজের ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেন। তিনি 'শুদ্ধি' অর্থাৎ অ-হিন্দু ও ধর্মান্তরিত হিন্দুদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। রামমোহনের ধর্মমত ও ভাবধারার সঙ্গে দয়ানন্দের কিছুটা সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু যুক্তিবাদ, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অন্য ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোনও মিল ছিল না। উত্তর ভারতে জনসাধারণের মধ্যে আর্য সমাজ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং ঐ অঞ্চলে হিন্দু সমাজের হতাশার ভাব দূর করে মনোবল বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছিল।

হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান

উনিশ শতকের সূচনার পূর্ব হতেই খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকরা হিন্দুধর্মকে ভ্রান্ত ও অসার প্রতিপন্ন করে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু ধর্মসংস্কারক ও অন্যান্যরাও হিন্দু ধর্মের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। রামমোহন ব্রাহ্ম ধর্মকে হিন্দু ধর্মের সমুন্নত রূপ মনে করলেও তাঁর মূর্তিপূজাবিরোধী প্রচারের ফলে হিন্দু সমাজে ক্ষোভ ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। কাল-ক্রমে ব্রাহ্ম ধর্ম একটি পৃথক ধর্মমতে পরিণত হয় এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে হিন্দু বলতে ব্রাহ্মদের বোঝায় না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা অবশ্য এই মত সমর্থন করেননি।

হিন্দুধর্মের ওপর আক্রমণ তীব্রতর হওয়ার ফলে এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রক্ষণশীল হিন্দু নেতা ও ধর্মব্যাখ্যাতারা সনাতন হিন্দু ধর্মকে রক্ষা ও প্রচার করতে সচেষ্ট হন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ লেখকদের রচনা হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানে সাহায্য করে। এই সময় হিন্দু ধর্ম ও সমগ্র ধর্মান্দোলনকে

এক নতুন রূপদান ও পথনির্দেশ করেন দক্ষিণেশ্বরের **শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব** (১৮৩৬-১৮৮৬)।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনার কাহিনী সুপরিচিত। ধর্মীয় বিরোধ ও পারস্পরিক নিন্দা-সমালোচনার অবসান ঘটিয়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তিনি প্রচার করেছিলেন। সাকার বা নিরাকার, একেশ্বর বা বহু দেবদেবীর পূজা নিয়ে বিরোধের অসারতা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। 'যত মত তত পথ' তাঁর এই একটি বাণী ধর্ম ও মানবজীবনকে এক নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছিল। জীবকে শিবজ্ঞানে সেবার আদর্শে তিনি তাঁর শিষ্যদের দীক্ষিত করেছিলেন। সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর সংস্পর্শে এসে ও উপদেশ শুনে এক অপূর্ব অনুভূতি ও চিত্তশান্তি লাভ করেছিল। কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত ও শিক্ষার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সবচেয়ে প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ শিষ্য **স্বামী বিবেকানন্দ** ভারতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক অভূত-পূর্ব প্রাণসঞ্চার করেন। বর্জনীয় যা কিছু বর্জন করে ও গ্রহণযোগ্য যা কিছু গ্রহণ করে স্বামীজী হিন্দু ধর্মকে সঞ্জীবিত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় উজ্জীবিত হিন্দু ধর্ম নবজীবন ও আত্মবিশ্বাস লাভ করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে জীবকে শিব জ্ঞানে সেবার আদর্শে দীক্ষিত করেছিলেন। এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ভারতবর্ষে জনসেবা ও জনকল্যাণমূলক কর্মযজ্ঞের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

সমাজ-সংস্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই আন্দোলনের সাফল্য সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করে। কয়েক বছরের মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবাবিবাহ আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহদানের প্রচেষ্টা ইতিপূর্বেও হয়েছিল। কিন্তু **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**

(১৮২০-১৮৯১) এই আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাঁরই একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ফলে বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ বলে ঘোষিত হয় (১৮৫৬)। বিধবাবিবাহ আন্দোলন তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য খ্যাতি অর্জন করলেও বিদ্যাসাগরের অবদান এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশে সমাজ-সংস্কার ও বিদ্যাসাগরের নাম একাত্ম হয়ে রয়েছে। শাণিত যুক্তি এবং শাস্ত্রীয় সমর্থনের সঙ্গে হৃদয়াবেগ ও মানবিকতা যুক্ত করে তিনি সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকে অন্য স্তরে উপনীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনও তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল ও তাঁর সমর্থন লাভ করেছিল।

শিক্ষাবিস্তার ও সংস্কারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা

হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি বেথুনের সহযোগিতা করেন। বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপেও তিনি ঐ কলেজের উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেছিলেন। শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। অন্য দিকে বিরাট

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পণ্ডিত হয়েও তিনি শিশুদের জন্য 'বর্ণপরিচয়' 'কথামালা' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে তাঁর দূরদৃষ্টি ও শিক্ষাবিস্তারের আগ্রহের পরিচয় দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর ছিলেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত। অটুট সঙ্কল্প, দুর্জয় সাহস ও অসীম মনোবলের অধিকারী এই পুরুষসিংহের মন ছিল শিশুর মত কোমল ও পরদুঃখদুর্দশায় কাতর। তাঁর অসীম দয়া, মমতা, করুণার জন্য তিনি 'দয়ার সাগর' ও 'করুণাসাগর' রূপে বর্ণিত হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নায়কদের মধ্যে বিদ্যাসাগর এক বরণীয় ও অনন্য চরিত্র।

অনন্য চরিত্র

ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আলোড়ন ও পরিবর্তন সুরু হয়েছিল তা প্রধানতঃ হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, দেশের মুসলমান জনসাধারণকে বিশেষ স্পর্শ করেনি। প্রথম দিকে মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেননি। গত শতাব্দীর প্রথম দিকে 'স্কুলবুক সোসাইটি' (১৮১৭), 'স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮), হিন্দু কলেজ (১৮১৭) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষা যখন দ্রুত প্রসারলাভ করেছিল তখন মুসলমানরা এই বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তাঁরা ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থায় আত্মসন্তুষ্ট থেকে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও সরকারী উদ্যোগ-আয়োজনকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। মুসলমান শাসন উচ্ছেদ করে ইংরাজরা ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল বলে মুসলমানরা ইংরাজ শাসনকে সুনজরে দেখেননি। এই নির্লিপ্ততা ও বিরোধী মনোভাবের ফলে তাঁরা সমসাময়িক ঘটনাস্রোত থেকে দূরে সরে ছিলেন। এর ফলে মুসলমান সমাজের পরিবর্তন ও অগ্রগতি অনেকখানি ব্যাহত হয়েছিল। তাঁরা হিন্দুদের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিলেন। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অসমতা ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন সম্বন্ধে মুসলমানদের নিস্পৃহতা

স্যার সৈয়দ আহমদ

বিগত শতাব্দীর শেষপাদে ভারতের মুসলমানদের নেতা ছিলেন **স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ** (১৮১৭-১৮৯৮)। দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় তিনি ইংরাজ সরকারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় ইংরাজদের প্রতি তাঁর আনুগত্য অটুট থাকলেও পরবর্তী কালে তিনি এই বিদ্রোহের কারণ বিশ্লেষণ করে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। শ্বেতাঙ্গ সরকারী কর্মচারী ও সর্বশ্রেণীর ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে সংযোগের অভাবই এই বিদ্রোহের কারণ বলে তিনি নির্দেশ করেন। নিজের অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা থেকে সৈয়দ আহমদ উপলব্ধি করেছিলেন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনীহাই মুসলমানদের অনগ্রসরতার প্রধান কারণ। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ না করলে মুসলমানরা কোন দিনই হিন্দুদের সমকক্ষ হতে পারবে না। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি আলিগড়ে **অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ** (১৮৭৭) প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যায়তনটি পরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে ও স্বাতন্ত্র্যবোধ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতীয় রাজনীতি ও জনজীবনে সৈয়দ আহমদ এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ

পঞ্চদশ অধ্যায়

বৃটিশ-বিরোধী প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধের সূচনা

১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ

বৃটিশ-বিরোধী প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধের সূচনা

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বৃটিশ প্রভুত্বস্থাপনের সূচনা হলেও সারা ভারতে বৃটিশ অধিকার বিস্তার সহজ হয়নি। পলাশীর পরবর্তী প্রায় একশো বছর ধরে কিভাবে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ক্লাইভ থেকে সুরু করে ডালহৌসী

ভারতবর্ষ
১৮৫৭ খৃঃ
ইংরেজী মাইল
০ ৫০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০
ইংরেজ রাজ্য
হিন্দু রাজ্য
মুসলমান রাজ্য
তিব্বত
নেপাল
ভুটান
আসাম
কাশ্মীর
শ্রীনগর
আফগানিস্থান
কাবুল
জালালাবাদ
পেশোয়ার
আটক
রাওলপিণ্ডি
গজনী
চিলিয়ানওয়ালা
পাঞ্জাব
লাহোর
সুলেমান পর্ব্বত
মুলতান
কালাত
বাহাওয়ালপুর
রাজপুতানা
আজমীর
জয়পুর
যোধপুর
মহারাজপুর
খয়েরপুর
সিন্ধু দেশ
মিয়ানি
হায়দরাবাদ
করাচী
দিল্লী
মিরাট
আগ্রা
লক্ষ্ণৌ
কানপুর
গোরখপুর
আরা
দার্জ্জিলিং
কুচবিহার
গোয়ালিয়র
এলাহাবাদ
বারাণসী
দিনাপুর
পাটনা
ঝান্সী
রেওয়া
বিহার
বঙ্গদেশ
চন্দননগর
কলিকাতা
ঢাকা
ত্রিপুরা
চট্টগ্রাম
সাউগড়
মালব
ইন্দোর
ভুপাল
নাগপুর
গুজরাট
কাঠিয়াবার
সুরাট
দিউ
দমন
সম্বলপুর
কটক
বেরার
ঔরঙ্গাবাদ
বেসিন
আহম্মদনগর
বোম্বাই
পুনা
নিজাম
সাতারা
হায়দরাবাদ
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
গোয়া
বেলারি
মছলিপত্তন
কুদ্দাপা
মহীশূর
কুর্গ
মাদ্রাজ
তেলিচেরী
মাহী
পণ্ডিচেরী
কালিকট
কারিকল
ত্রিচিনোপলি
তাঞ্জোর
কোচিন
দিন্দিগাল
লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ
ত্রিঙ্কোমালি
সিংহল
মালদ্বীপপুঞ্জ
স্বাধীন ব্রহ্ম
মান্দালয়
অমরপুর
আকিয়াব
নিম্ন ব্রহ্ম
রেঙ্গুন
মৌলমিন
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ

পর্যন্ত ইংরাজ শাসনকর্তারা মারাঠা, মহীশূর, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি ছোট-বড় বহু ভারতীয় রাজ্য একের পর এক গ্রাস করেছিলেন। যদিও ভারতীয়দের মধ্যে তখন রাজনৈতিক চেতনা ও স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ হয়নি, তবুও পুরাতন রাজবংশের উচ্ছেদ এবং প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন রাজ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

ভূমিকা

পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব সম্বন্ধে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সচেতন ছিল না। কিন্তু মীরজাফর ও মীরকাসিম ইংরাজদের যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তার ফলে রাজকোষে অর্থাভাব দেখা দেয়। তাছাড়া কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থলিপ্সা, ভূমি-রাজস্বব্যবস্থার দোষত্রুটি ইত্যাদির ফলে দেশের আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই অর্থনৈতিক শোষণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে।

অর্থনৈতিক শোষণের ফলে দেশের আর্থিক দুরবস্থা

রাজনৈতিক ক্ষমতা ও পদমর্যাদাচ্যুত ব্যক্তিরাও ইংরাজশাসন-বিরোধী ছিলেন। এঁদের মধ্যে মেদিনীপুরের জমিদার, বীরভূমের রাজা এবং বর্ধমানের মহারাজার বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। নবাবের উচ্চপদস্থ ও প্রভাবশালী কর্মচারী **মহারাজ নন্দকুমার** পণ্ডিচেরীর ফরাসী সরকারের সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগ ও কোম্পানীর শাসন-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য ইংরাজদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। অবশ্য ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে অন্য এক অভিযোগে তাঁকে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ নন্দকুমারকে ইংরাজ-বিরোধী সংগ্রামের প্রথম শহীদ বলে আখ্যা দিলেও ঐতিহাসিকরা এই বিষয়ে একমত নন।

বাংলার জমিদারদের বিদ্রোহ

মহারাজ নন্দকুমার

টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর মহীশূরে **ধুন্দিয়া** নামে এক বীর নায়কের নেতৃত্বে কিছুকাল বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম চলেছিল। শেষপর্যন্ত ওয়েলেসলি এই বিদ্রোহ দমন করেন (১৮০০)। পেশোয়া ও অন্যান্য মারাঠা সামন্তনায়করা রাজদের কাছে পরাজিত হলেও মারাঠা রাজ্যে ইংরাজ-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ হয়নি। অযোধ্যার পদচ্যুত নবাব **ওয়াজির আলির বিদ্রোহ** (১৭৯৯-১৮০০), ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে বৃটিশ-বিরোধী কার্যকলাপ ইত্যাদিও

অন্যান্য রাজ্যে বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম

উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধের ফলে কোন প্রচেষ্টাই সর্বভারতীয় রূপ লাভ করতে পারেনি।

অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের অন্যান্য বিদ্রোহের মধ্যে খাসী, খন্দ, ভীল, মীর, কোল প্রভৃতি আদিবাসীদের বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, ফারিদি আন্দোলন, ওয়াহবি আন্দোলন ও তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৮৩১), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইংরাজ শাসন-বিরোধী গণবিদ্রোহ

স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী বর্জিত হলেও এই সব স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহগুলি ছিল ইংরাজশাসন ও রাজ-কর্মচারীদের শোষণের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে এই বিক্ষোভ চূড়ান্ত অভিব্যক্তি লাভ করে।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ

বিদ্রোহের কারণঃ ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে সৃষ্ট ইংরাজ-বিরোধী মনোভাব এবং আরও কয়েকটি কারণের সমাবেশে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশই ছিল এদেশীয় সিপাই। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য এই সৈন্যদের বীরত্ব, যোগ্যতা ও আনুগত্যের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের তুলনায় এদেশীয় সৈন্যদের বেতন, মর্যাদা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছিল অত্যন্ত কম। যোগ্যতা থাকলেও তাদের পদোন্নতির পথ ছিল বন্ধ। সদ্যনিযুক্ত তরুণ শ্বেতাঙ্গ সৈন্যের সমতুল্য বেতন ও মর্যাদালাভের জন্য একজন ভারতীয় সিপাইকে প্রায় তিরিশ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। এ ছাড়া প্রায়ই অন্যায় ও অযৌক্তিক কঠোর আদেশের ফলে ভারতীয় সিপাইদের ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস আহত হত। এই সব বিভিন্ন কারণে ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক বিদ্রোহের পূর্বেই একাধিকবার বিক্ষিপ্তভাবে সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরের বিদ্রোহ এবং ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারাকপুরের সিপাই বিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে আসাম, সোলাপুর, হায়দ্রাবাদ,

ভারতীয় সিপাইদের প্রতি অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণ

পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানেও সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। মৃত্যুদণ্ড-প্রাপ্ত বিদ্রোহী নেতাদের আত্মদান সিপাইরা বিস্মৃত হয়নি। এই সব বিদ্রোহ ভারতীয় সিপাইদের মধ্যে গভীর ও ব্যাপক অসন্তোষের ইঙ্গিত করলেও বেতন, ভাতা, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে বৈষম্যমূলক নীতি ও আচরণের অবসান হয়নি।

হিন্দু সিপাইদের সমুদ্রযাত্রায় আপত্তি

ইতিপূর্বে প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় (১৮৪১) হিন্দু সৈন্যরা সিন্ধুনদ পার হয়ে যুদ্ধ যাত্রা করতে আপত্তি ও বিক্ষোভ জানিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের সময় (১৮৫২) যখন সিপাইদের সমুদ্রপথে ব্রহ্মদেশে যেতে বাধ্য করা হয় তখন তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। সমুদ্রযাত্রায় জাতিনাশের আশঙ্কাই ছিল হিন্দু সিপাইদের আপত্তির কারণ।

এন্‌ফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন

বিভিন্ন কারণে সিপাইরা যখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ঠিক সেই সময় এন্‌ফিল্ড রাইফেল নামে এক নতুন ধরনের বন্দুকের প্রবর্তন সিপাইদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করে। গুজব প্রচারিত হয় যে এই বন্দুকের টোটা শূকর ও গরুর চর্বিতে প্রস্তুত এবং হিন্দু ও মুসলমান সিপাইদের জাতিধর্ম নষ্ট করবার কুমতলবেই এই টোটার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই গুজব ঘৃতাগ্নির মত সিপাইদের ইংরাজ-বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে। প্রকাশ্য বিদ্রোহ সুরু হয়। এই কারণে এন্‌ফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তনকে সিপাই বিদ্রোহের আশু ও প্রত্যক্ষ কারণ মনে করা হয়।

কোম্পানীর রাজ্যগ্রাস নীতির প্রতিক্রিয়া

সিপাইদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভই ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের একমাত্র কারণ ছিল না। নানাবিধ কারণে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের ভারতীয়দের মনে ইংরাজ-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। লর্ড ডালহৌসীর রাজ্য-গ্রাস নীতি ভারতীয় রাজ্যগুলিকে আশঙ্কিত করে তুলেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্রুত বিস্তারের ফলে শুধুমাত্র যে দেশীয় রাজারা রাজ্য ও ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল তা নয়, রাজ্যের জমিদার, তালুকদার, কর্মচারী, সৈন্যবাহিনী ইত্যাদি সকলেরই স্বার্থহানি ঘটেছিল। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল যে, যে সব রাজ্যের রাজা, সামন্তশ্রেণী, সৈন্যদল ইত্যাদি ক্ষমতা ও মর্যাদাচ্যুত হয়েছিল সেই সব রাজ্যের বিদ্রোহ ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করেছিল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানাসাহেব, ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, জগদীশপুরের (বিহার) কুনওয়ার সিংহ, দিল্লীর

মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ প্রভৃতি ব্যক্তিরা, যাঁরা বিদ্রোহের পুরোভাগে ছিলেন অথবা বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁরা সকলেই কোন না কোন কারণে আগে থেকেই ইংরাজদের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন।

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থিতি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবার পর ইংরাজ সরকারের উদ্যোগে একাধিক সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল। এইগুলির মধ্যে সতীদাহ প্রথার বিলোপ, ধর্মান্তরিত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের দাবী সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ইত্যাদি সংস্কারমূলক ব্যবস্থা সাধারণভাবে প্রগতিশীল জনমতের সমর্থন লাভ করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের কার্যকলাপ এবং সরকারী নীতির ফলে বহু গোঁড়া হিন্দুর মনে আশঙ্কা দেখা দেয় যে হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে বিনষ্ট করাই ইংরাজ সরকারের গোপন উদ্দেশ্য। যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ডালহৌসীর আমলে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে এই আশঙ্কা আরও বদ্ধমূল হয়। রক্ষণশীল হিন্দুদের সন্দেহ ও অসন্তোষ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইংরাজ-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি করে।

সংস্কার প্রবর্তনের ফলে রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

ঘটনাচক্রে সিপাই বিদ্রোহের অনতিকালপূর্বে দুটি ধারণা বা বিশ্বাসের ব্যাপক প্রচলন বিদ্রোহীদের আশাবাদী করে তুলেছিল। ইউরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-১৮৫৬) রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিজয় হলেও ইংলণ্ডের সামরিক বিভাগের অব্যবস্থা ও দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল। এর ফলে ভারতে আসন্ন ইংরাজ-বিরোধী বিদ্রোহের পরিকল্পনাকারীদের মনে হয়েছিল যে কোন ব্যাপক বিদ্রোহ ইংরাজবাহিনীর পক্ষে দমন করা সম্ভব হবে না। এই বিশ্বাস বিদ্রোহীদের উৎসাহিত করে।

সমসাময়িক দুটি বহুল-প্রচলিত ধারণার প্রভাব

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলণ্ডের সামরিক বিভাগের দুর্বলতার প্রকাশ

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে বৃটিশ প্রভুত্বের সূচনা হয়েছিল। একটি বহুল-প্রচলিত ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে ভারতে ইংরাজ শাসন একশো বছর স্থায়ী হবে। ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাসী বহুলোকের ধারণা ছিল যে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শতবর্ষপূর্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হবে। এই দুটি বিশ্বাস সিপাইদের

ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

বিদ্রোহ ঘোষণার সময়ের প্রকৃষ্টতা এবং ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত করেছিল।

বিদ্রোহের গতি : পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর এবং কলিকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুরে সিপাই বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয়। ব্যারাকপুরের ঘটনার জন্য সিপাই **মঙ্গল পাণ্ডে** মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। অল্পকালের মধ্যে উত্তর ভারতে আম্বালা ও মীরাটে প্রবল বিদ্রোহ দেখা দেয়। মীরাটে বিদ্রোহী সিপাইরা বহু ইংরাজকে হত্যা করে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং দিল্লী অধিকারের পর তারা বৃদ্ধ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে (মে, ১৮৫৭)। দিল্লীর পতনের সংবাদ সমগ্র দেশে দারুণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং বিদ্রোহ চতুর্দিকে দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করে। উত্তর ভারতের অযোধ্যা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, মধ্য ভারতের ঝান্সি এবং বিহারের জগদীশপুরে বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা গভীর, ব্যাপক ও প্রবল আকার লাভ করে। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন কানপুরে **নানা-সাহেব,** মধ্য ভারতে ঝান্সির **রাণী লক্ষ্মীবাঈ,** মারাঠা বীর **তাঁতিয়া তোপি** এবং জগদীশপুরের জমিদার **কুনওয়ার সিংহ**। বৎসরাধিক কাল ধরে এই বিদ্রোহ চলেছিল এবং একসময় বিদ্রোহের সাফল্য ও ইংরাজ-শাসনের উচ্ছেদের সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হ্যাভেলক, নীল, স্যার কলিন ক্যাম্পবেল, হিউ রোজ প্রমুখ ইংরাজ সেনাপতিদের নেতৃত্বে ইংরাজবাহিনী কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, ঝান্সি ও দিল্লী প্রভৃতি স্থান পুনরুদ্ধারে ও বিদ্রোহ দমনে সফল হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়। ভারতে বৃটিশ অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও কুনওয়ার সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেন। নানাসাহেব নিরুদ্দেশ হন। তাঁতিয়া তোপি বন্দী হন ও তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বন্দী বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ

বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ

বিদ্রোহের ব্যর্থতা

বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ : ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় করা দুরূহ নয়। ব্যাপক বিস্তার লাভ করলেও এই বিদ্রোহ জনসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করতে পারেনি। অযোধ্যা প্রভৃতি দুই একটি অঞ্চলে মাত্র এই বিদ্রোহ গণসমর্থনপুষ্ট হয়ে জাতীয় রূপ লাভ করেছিল। পাঞ্জাবের শিখরা বিদ্রোহে যোগদানের পরিবর্তে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেছিল। বহু দেশীয় রাজাও সঙ্কটমুহূর্তে ইংরাজ সরকারের পক্ষ সমর্থন করে বিদ্রোহদমনে সহায়তা করে। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত ভারতীয়রাও ইংরাজদের প্রতি আনুগত্য ও সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন।

গণসমর্থন ও সহানুভূতির অভাব

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহীরা বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করার ফলে এই বিদ্রোহ পূর্ণশক্তি ও বিস্তার লাভ করতে পারেনি। কার্যপদ্ধতি, আদর্শ ও সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্বন্ধে বিদ্রোহীদের মধ্যে কোন ঐকমত্য ছিল না। ইংরাজ-প্রভুত্বের উচ্ছেদের পর দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গঠন সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধ্যান-ধারণার অভাব ছিল। মতৈক্যের ও সংহতির অভাব বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা ছিল।

বিদ্রোহীদের মধ্যে সংহতি ও সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্বন্ধে মতৈক্যের অভাব

সামরিক উপকরণ, রণ-কৌশল ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও বিদ্রোহীরা ইংরাজ-বাহিনীর তুলনায় হীনবল ছিল। যোগাযোগ-ব্যবস্থাও ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। রণক্ষেত্রে রাণী লক্ষ্মীবাঈ অসীম সাহস ও অপূর্ব আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করার মত সামরিক অভিজ্ঞতা ও কূটবুদ্ধি তাঁর ছিল না। অন্যান্য বিদ্রোহী নেতারাও প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি।

সামরিক উপকরণ ও রণ-কৌশলে ইংরাজদের শ্রেষ্ঠত্ব

উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব

বিদ্রোহের প্রকৃতি : ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র মতভেদ আছে। একটি মতানুসারে এই বিদ্রোহ ছিল ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। সুস্পষ্ট দুর্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের স্বাধীনতাস্পৃহার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল। ভারতে বৃটিশ শক্তির উচ্ছেদই ছিল এই পূর্বপরিকল্পিত ও সংগঠিত রাজনৈতিক ও সামরিক উত্থানের উদ্দেশ্য। সব ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের

বিভিন্ন মত

(১) ১৮৫৭-এর বিদ্রোহই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ

মর্যাদাদানে সম্মত নন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে এই বিদ্রোহ মূলতঃ ছিল বিক্ষুব্ধ সিপাইদের বিদ্রোহ। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কোনও ব্যাপক ষড়যন্ত্রের পূর্বপরিকল্পনা করা হয়নি। কয়েকটিমাত্র অঞ্চলে এই বিদ্রোহ গণবিদ্রোহের রূপ ধারণ করেছিল। বিদ্রোহীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র স্বদেশপ্রেমের মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। অধিকাংশই এই প্রবল বিদ্রোহের ফলে রাজশক্তি ও শাসনব্যবস্থা বিপন্ন হওয়ায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত মনে করে তৎপর হয়েছিল। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত ভারতীয়রাও এই হিংসাত্মক রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থানকে নিন্দা করে ইংরাজ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের বেশীর ভাগই ইংরাজ-সমর্থক ও নিশ্চেষ্ট ছিল। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহকে বৃটিশ-বিরোধী এক বিরাট, ব্যাপক ও প্রচণ্ড সংগ্রাম বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু মাতৃভূমিকে বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলমুক্ত করার কোন সর্বজনীন আদর্শ ও লক্ষ্যের অনুপস্থিতিতে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহকে কোন মতেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের আখ্যা দেওয়া যায় না।

(২)
মূলতঃ সিপাইদের বিদ্রোহ : স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দেওয়া চলে না

উপরোক্ত দুটি পরস্পর-বিরোধী মতবাদ ছাড়া ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও ১৮৫৭-এর রক্তাক্ত সংগ্রামকে কোন কোন ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছেন। এঁদের অন্যতম হলেন ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন। তাঁর মতে সিপাই বিক্ষোভের ফলে সুরু হলেও এই বিদ্রোহ অসামরিক জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছিল। সিপাইদের মধ্যে আরম্ভ হলেও শুধুমাত্র তাদের মধ্যেই এই বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণীর মানুষ এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল ও নানা স্থানে সিপাই বিদ্রোহ গণসমর্থনও লাভ করেছিল। অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন রাজ্যে এই বিদ্রোহ জাতীয় বিপ্লবের আকার ধারণ করেছিল।

(৩)
সিপাই বিদ্রোহ কোন কোন অঞ্চলে জাতীয় বিপ্লবের আকার ধারণ করেছিল

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন বিদ্রোহ সুরু হয় তখনও ভারতে জাতীয়তাবাদের আদর্শ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বিদ্রোহীদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল সংস্কারের ও প্রগতিশীলতার বিরোধী। কিন্তু তবুও এই বিদ্রোহ ছিল অবশ্যম্ভাবী। কোনও জাতি চিরকাল বিদেশী প্রভুত্ব সহ্য

করতে পারে না। শিক্ষিত ভারতীয়রা বিদ্রোহ সমর্থন করেননি, তার কারণ তাঁরা এদেশে বৃটিশ সরকারের প্রগতিশীল নীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আস্থাবান ছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী এই শিক্ষিত সমাজের কাছে বলপ্রয়োগ ও হিংসাত্মক উপায়ে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয়।

শিক্ষিত ভারতীয়দের বিদ্রোহের প্রতি বিরূপ মনোভাবের কারণ বিশ্লেষণ

ফলাফল ও গুরুত্ব ঃ পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্যর্থ হলেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের গুরুত্ব উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বিকাশ ও অগ্রগতিতে এই বিদ্রোহ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিক্ষুব্ধ ভারতীয় জনগণের সম্ভাব্য বিদ্রোহের শক্তি ইংরাজ সরকারকে চিন্তিত করে তুলেছিল। প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গণবিক্ষোভের সম্মুখীন হলে কতখানি বিপন্ন ও অসহায় বোধ করতে পারে, তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। **১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের স্মৃতি পরবর্তী যুগে ভারতীয় বিপ্লববাদীদের অনুপ্রাণিত করেছিল।**

ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বিকাশে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের প্রভাব

ভবিষ্যতের ইঙ্গিত

১৮৫৭-এর বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ এক নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এই বিদ্রোহের ফলে ইংলণ্ডের শাসনকর্তারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী ও ভারতীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ-ভারতের শাসনভার রাণী ভিক্টোরিয়া নিজে গ্রহণ করেন। কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়। এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা (১ নভেম্বর, ১৮৫৮) তিনি ভারতীয়দের অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দান করেন। প্রজাকল্যাণ, ন্যায়নীতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসরণ করার আশ্বাস তিনি প্রদান করেন। চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসানের কথাও তিনি ঘোষণা করেন।

ভারতে নতুন যুগের সূচনা

কোম্পানীর শাসনের অবসান : মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র

ভারতীয় শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়। ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার একজন সদস্য ভারত-শাসন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত হন। তিনি 'ভারত-সচিব' নামে (Secretary of State for India) পরিচিত হন। তাঁকে উপদেশ দান ও সহায়তা করার জন্য পনের জন সদস্যবিশিষ্ট একটি কাউন্সিল

(Council of India) গঠিত হয়। ভারতের গভর্নর-জেনারেল 'ভাইসরয়' (Viceroy) বা রাণীর প্রতিনিধি আখ্যা লাভ করেন। ডালহৌসীর পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং ছিলেন ভারতের প্রথম ভাইসরয়। ভারতস্থ ইংরাজ সৈন্যবাহিনী ও রাজ-কর্মচারীদের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি রোধ এবং শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন

বংশাবলী

হিন্দু যুগ

১। মৌর্য বংশ

চন্দ্রগুপ্ত
|
বিন্দুসার
|
অশোক প্রিয়দর্শী

(অশোকের পর আরও সাত জন রাজা রাজত্ব করেন।)

২। গুপ্ত বংশ

সুলতানী যুগের মুসলমান রাজবংশসমূহ (সিংহাসনারোহণের তারিখসহ)

১। দাস রাজবংশ
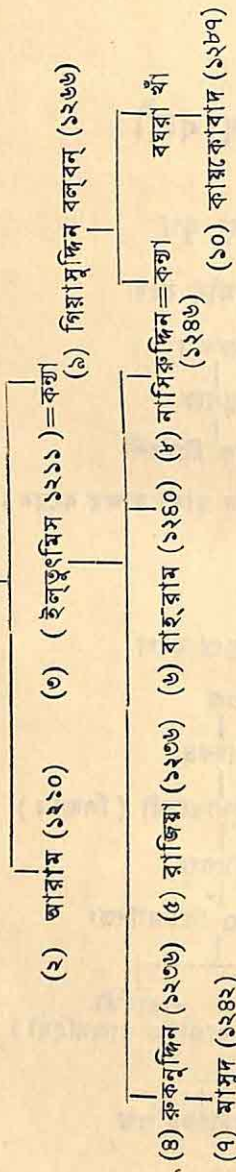
২। খল্‌জী বংশ

(১) জালালুদ্দিন খল্‌জী (১২৯০)
(২) আলাউদ্দিন খল্‌জী (জালালের ভ্রাতুষ্পুত্র) (১২৯৬)
(৩) আলাউদ্দিনের শিশুপুত্র (৩৫ দিন)
(৪) কুতবুদ্দিন মবারক শাহ্‌ (আলাউদ্দিনের পুত্র)(১৩১৬)
(৫) খসরু (অনধিকারী) (১৩২০)

৩। তুঘ্‌লক বংশ

(১) গিয়াসুদ্দিন তুঘ্‌লক (১৩২০)
(২) মহম্মদ তুঘ্‌লক (গিয়াসের পুত্র) (১৩২৫)
(৩) ফিরোজশাহ্‌ তুঘ্‌লক (মুহম্মদের জ্ঞাতি ভ্রাতা)(১৩৫১)
(এর পর কয়েকজন নামেমাত্র রাজা সিংহাসনে বসেছিলেন।)

৪। লোদী বংশ

(১) বাহ্‌লুল লোদী (১৪৫১)
(২) সিকন্দর লোদী (বাহ্‌লুলের পুত্র) (১৪৮৯)
(৩) ইব্রাহিম লোদী (সিকন্দরের পুত্র) (১৫১৭)

মুঘল বংশ
(১) বাবর (১৫২৬)
(২) হুমায়ুন (১৫৩০)
কামরান্
হিন্দাল
আস্‌কারি
(৩) আকবর (১৫৫৬)
মির্জা হাকিম
(৪) জাহাঙ্গীর (সেলিম) (১৬০৫)
মুরাদ
দানিয়েল
খস্‌রু
পার্‌ভিজ
(৫) শাহজাহান (১৬২৮)
শারীয়র
দারা
সুজা
(৬) ঔরংজীব (১৬৫৮)
মুরাদ
মহম্মদ
(৭) বাহাদুর শাহ্ (১ম) বা প্রথম শাহ্ আলম (১৭০৭)
আজম
আকবর
কামবক্স
(১১) নেক্‌সিয়র (১৭১৯)
(৮) জাহান্দার শাহ (১৭১২)
আজিম্-উস্-সান্
রফি-উস্-সান্
জাহান শাহ
(১৫) দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪)
(৯) ফরুখ্-সিয়র (১৭১৩)
(১৩) মহম্মদ শাহ (১৭১৯)
(১৬) দ্বিতীয় শাহ্ আলম (১৭৫৯)
(১৪) আহম্মদ শাহ (১৭৪৮)
(১৭) দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬)
(১৮) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৮)
(১৩) মহম্মদ ইব্রাহিম (১৭২০)
(১২) রফিউদ্দৌলা বা দ্বিতীয় শাহজাহান (১৭১৮)
(১০) রফিউদ্ দারাজৎ (১৭১৯)

পেশোয়া বংশ

- (১) বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-১৭২০)
  - (২) প্রথম বাজীরাও (১৭২০-১৭৪০)
    - (৩) বালাজী বাজীরাও (১৭৪০-১৭৬১)
      - বিশ্বাসরাও (নিহত ১৭৬১)
      - (৪) প্রথম মাধবরাও (১৭৬১-১৭৭২)
      - (৫) নারায়ণরাও (১৭৭২-১৭৭৩)
        - (৭) মাধবরাও নারায়ণ (১৭৭৪-১৭৭৬) (দ্বিতীয় মাধবরাও)
    - (৬) রঘুনাথ রাও (রাঘব) (১৭৭৩-১৭৭৪)
      - অমৃতরাও
      - (৮) দ্বিতীয় বাজীরাও (১৭৯৬-১৮১৮)
        - নানা সাহেব
      - চিমনজী আপ্পা
  - চিমনজী আপ্পা
    - সদাশিব রাও ভাও (নিহত ১৭৬১)
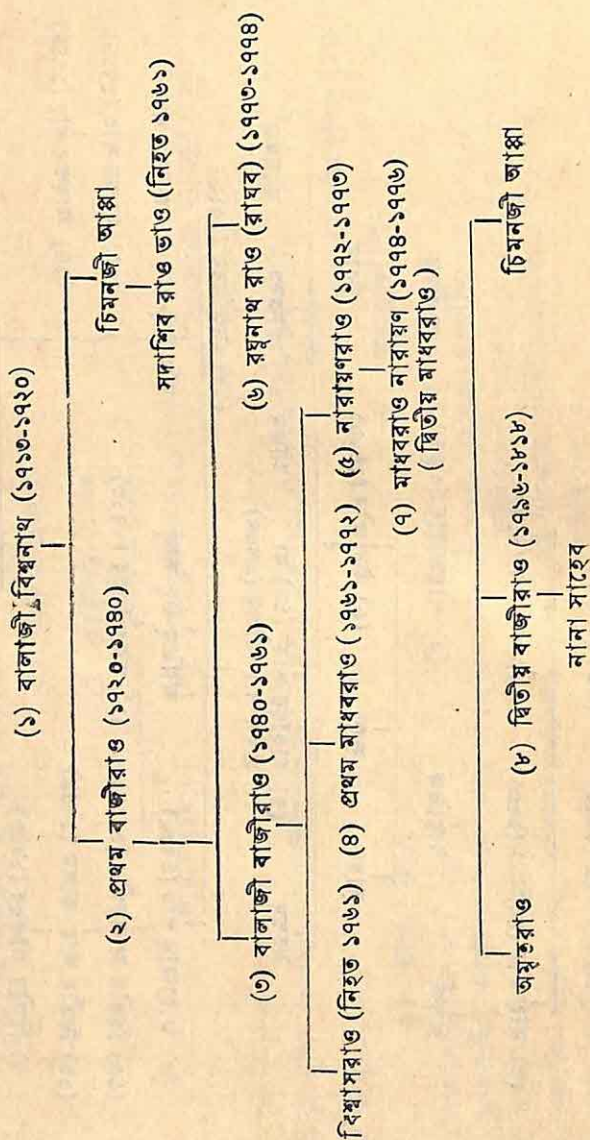
শিখ গুরুগণ

(১) নানক (১৪৬৯-১৫৩৮)

(২) অঙ্গদ (গুরুপদে স্থিতিকাল ঃ ১৫৩৮-১৫৫২)

(৩) অমরদাস (১৫৫২-১৫৭৪)
   |
   কন্যা

বিবি ভানী = (৪) রামদাস (১৫৭৪-১৫৮১)

(৫) অর্জুন (১৫৮১-১৬০৬)

(৬) হরগোবিন্দ (১৬০৬-১৬৪৫)

- গুরুদিত্তা
  - (৭) হররায় (১৬৪৫-১৬৬১)
    - (৮) হরকিষণ (১৬৬১-১৬৬৪)
- (৯) তেগবাহাদুর (১৬৬৪-১৬৭৫)
  - (১০) গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮)
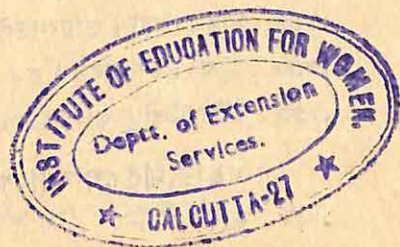
১। বাংলার গভর্নর-জেনারেল (১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে নিযুক্ত)

খ্রীষ্টাব্দ

১৭৭৪ ওয়ারেন্ হেস্টিংস্
১৭৮৫ স্যার্ জন্ ম্যাক্ফারসন্
১৭৮৬ আর্ল (মার্কুইস্) কর্নওয়ালিস্
১৭৯৩ সার্ জন্ শোর (লর্ড টেইন্মাউথ)
১৭৯৮ সার্ এলিউর্ড ক্লার্ক
১৭৯৮ মার্কুইস্ ওয়েলেস্লি
১৮০৫ মার্কুইস্ কর্নওয়ালিস্ (২য় বার)
১৮০৫ স্যার্ জর্জ বার্লো
১৮০৭ আর্ল অব্ মিণ্টো (প্রথম)
১৮১৩ মার্কুইস্ অব্ হেস্টিংস্
১৮২৩ জন্ অ্যাডাম
১৮২৩ ব্যারন্ আর্ল আমহার্স্ট
১৮২৮ উইলিয়ম বাটারওয়ার্থ বেইলি
১৮২৮ লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেন্ডিস্ বেণ্টিঙ্ক

২। ভারতের গভর্নর-জেনারেলগণ (১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট অনুসারে নিযুক্ত)

খ্রীষ্টাব্দ

১৮৩৩ লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেন্ডিস্ বেণ্টিঙ্ক
১৮৩৫ সার্ চার্ল্স্ (লর্ড) মেট্কাফ্
১৮৩৬ ব্যারন (আর্ল অব্) অক্ল্যাণ্ড
১৮৪২ ব্যারন (আর্ল অব্) এলেনবরা
১৮৪৪ সার্ হেন্‌রী (ভায়কাউণ্ট) হার্ডিং
১৮৪৮ আর্ল (মারকুইস্) অব্ ডালহৌসী
১৮৫৬ ভাইকাউণ্ট (আর্ল) ক্যানিং

(মহারাণীর ঘোষণা-পত্র অনুসারে নিযুক্ত প্রথম ভাইসরয়)

১৮৫৮ আর্ল ক্যানিং

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

১। হিমালয় পর্বত কি ভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে ?

২। তিনটি গিরিপথের নাম কর। ভারতবর্ষের ইতিহাসে গিরিপথগুলির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। সিন্ধু নদ কোন্ অঞ্চলে প্রবাহিত ? সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারক কারা ?

৪। কোন্ ঐতিহাসিক ভারতবর্ষকে, 'নৃতাত্ত্বিক যাদুশালা' বলে বর্ণনা করেছেন ? এই কথার তাৎপর্য কি ?

৫। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' কথাটি কোন্ ঐতিহাসিক বলেছেন ? এই কথাটির সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মৌলিক ঐক্যগুলির উল্লেখ কর। ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্য ও সমন্বয় সম্বন্ধে আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। ইতিহাসের 'উপাদান' কাকে বলে ? প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় সাহিত্য ও শিলালিপির কতখানি গুরুত্ব আছে ?

২। কৌটিল্য কে ? তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম কি ? ঐ গ্রন্থে কোন্ যুগের ইতিহাস জানা যায় ?

৩। বাণভট্ট কে ? তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম কি ? ঐ গ্রন্থ থেকে কোন্ রাজা সম্বন্ধে এবং কি জানা যায় ?

৪। আবুল ফজল কে ছিলেন ? তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম কি ?

৫। মুঘল যুগের তিনজন বৈদেশিক পর্যটকের নাম কর।

৬। মহাফেজখানা কাকে বলে ? আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনায় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত উপাদানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

১। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো কোথায় অবস্থিত ? সিন্ধু সভ্যতাকে নাগরিক সভ্যতা বলা হয় কেন ?

২। সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা কারা ছিলেন? তার ধ্বংসের কারণ কি ছিল ?

৩। 'আর্য' শব্দের অর্থ কি? আর্যদের আদি বাসভূমি ও আর্যদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতগুলির উল্লেখ কর।

৪। 'বেদ' কি ? বেদ কয়ভাগে বিভক্ত এবং ভাগগুলির নাম কি ?

৫। আর্যদের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। চতুরাশ্রম বলতে কি বোঝায় ? চতুরাশ্রমের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লেখ।

৭। বর্ণভেদ প্রথা কাকে বলে ? এই প্রথার কি ভাবে জন্ম হয়েছিল ?

৮। আর্যদের সাহিত্যের নাম কি ? ঐ সাহিত্য পাঠ করে আমরা আর্যদের ধর্মজীবন সম্বন্ধে কি জানতে পারি ?

চতুর্থ অধ্যায়

১। জৈন ধর্মের সূত্রপাত কে করেছিলেন ? তাঁর মূলশিক্ষা কি ছিল ?

২। মহাবীরের পূর্বনাম কি ছিল ? তিনি কোথায় জন্মেছিলেন ? তাঁর কোথায় মৃত্যু হয়েছিল ?

৩। পঞ্চ মহাব্রত কে প্রচার করেছিলেন ? পঞ্চ মহাব্রত বলতে কি বোঝায় ?

৪। জৈন নামের উৎপত্তি কি ভাবে হয়েছিল ? জৈন ধর্মের মূল নীতিগুলি কি ?

৫। জৈন ধর্মের দুটি শাখার নাম কর। এই দুটি শাখার জন্ম কি ভাবে হয়েছিল ? দুটি শাখার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর মূল পার্থক্য উল্লেখ কর।

৬। বুদ্ধের জন্মস্থান কোথায় ? বুদ্ধ শব্দের অর্থ কি ? বুদ্ধদেব সর্বপ্রথম কোথায় ধর্মপ্রচার করেছিলেন ? কোথায় তাঁর দেহান্ত হয়েছিল ?

৭। আর্যসত্য কে প্রচার করেছিলেন ? আর্যসত্যগুলি কি কি ?

৮। 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' কাকে বলে ? এই মার্গগুলি কি কি ? 'নির্বাণ' কি ?

৯। 'পঞ্চশীল' কোন ধর্মের বৈশিষ্ট্য ? পঞ্চশীলের উল্লেখ কর।

১০। 'ত্রিপিটক' কি ? ত্রিপিটকের অংশগুলির নাম কর।

১১। 'জাতক' বলতে কি বোঝায় ?

১২। বৌদ্ধ ধর্মের দুটি শাখার নাম কর।

১৩। 'বৌদ্ধ সঙ্ঘ' ও 'বৌদ্ধ সঙ্গীতি' কি ? প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি কেন এবং কোথায় আহ্বান করা হয়েছিল ?

১৪। ভারতবর্ষের বাইরে যে সব দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকটির নাম কর। বৌদ্ধ ধর্মের পতনের কারণগুলি উল্লেখ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

১। ভারতবর্ষে বৈদেশিক আক্রমণের সূচনা কে করেছিলেন ?

২। আলেকজাণ্ডার কোন্ দেশের রাজা ছিলেন ? তিনি যখন ভারত

আক্রমণ করেন তখন মগধে কোন্ বংশের রাজত্ব ছিল ? আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি কে ছিলেন ?

৩। কুষাণদের আদি বাসস্থান কোথায় ? কুষাণবংশের শ্রেষ্ঠ রাজার কৃতিত্বের আলোচনা কর।

৪। কণিষ্ক কোন্ বংশের রাজা ? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল ? তাঁর রাজসভার দুজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম কর।

৫। হূণ কারা ছিল ? একজন হূণ নেতার নাম কর। হূণদের পরাজিত করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এমন এক ভারতীয় রাজার নাম বল।

৬। পুরু কোন্ দেশের রাজা ছিলেন ? তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কেন ?

৭। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কোন্ রাজবংশকে উচ্ছেদ করেছিলেন ? তাঁর সঙ্গে কোন্ গ্রীক সেনাপতির যুদ্ধ হয়েছিল ? এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল ?

৮। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল আলোচনা কর।

৯। গান্ধার কোথায় ? গান্ধার-শিল্পের বিকাশ কোন্ যুগে হয়েছিল ? এই শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য কি ?

১০। বৌদ্ধ ধর্মে বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

১১। ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণের সামাজিক প্রতিক্রিয়া আলোচনা কর।

১২। রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর। তিনটি রাজপুত রাজ্যের নাম কর।

১৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা কে এবং কেন বিখ্যাত ?

কুরুস, আলেকজাণ্ডার, সেলুকাস, কুজল কদফিস্, খারবেল, গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি, মিহিরকুল, যশোধর্মণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে চারটি বৃহত্তর রাজ্যের নাম কর। এইগুলির মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোন্ রাজ্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় ?

২। বিম্বিসার কে ? তাঁর পুত্রের নাম কি ?

৩। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ? তিনি কি ভাবে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ? তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা কে ছিলেন ?

৪। চাণক্য কে ? তাঁর কি অন্য কোন নাম ছিল ? তাঁর গ্রন্থের নাম কি ?

৫। বিম্বিসার কোন্ বংশের রাজা ছিলেন ? বিন্দুসার কোন বংশের রাজা ছিলেন ? বিম্বিসারের পর কে রাজা হয়েছিলেন ? বিন্দুসারের পুত্রের নাম কি?

৬। মেগাস্থিনিস কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন? তিনি কোন্ যুগে ভারতবর্ষে এসেছিলেন? তাঁর গ্রন্থ থেকে আমরা ঐ যুগ সম্বন্ধে কি জানতে পারি?

৭। অশোক 'ধর্মাশোক' নামে কেন খ্যাত হয়েছিলেন?

৮। তুমি কাকে মৌর্যবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট মনে কর? তাঁর কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৯। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? গুপ্তবংশের প্রথম খ্যাতনামা সম্রাট কে ছিলেন? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল?

১০। হরিষেণ কার সভাকবি ছিলেন? তাঁর রচিত প্রশস্তি থেকে আমরা ঐ সম্রাটের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কি জানতে পারি?

১১। গুপ্তবংশের কোন্ সম্রাট 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন? তিনি অন্য কোন্ নামে খ্যাত হয়েছিলেন? তাঁর রাজসভার বিখ্যাত তিন ব্যক্তির নাম কর।

১২। ফা-হিয়েন কার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন? তিনি তাঁর বিবরণে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি লিখেছিলেন?

১৩। হর্ষবর্ধন কোন্ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন? তাঁর সঙ্গে শশাঙ্কের কেন যুদ্ধ হয়েছিল? দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে হর্ষ কোন্ রাজার কাছে বাধা পেয়েছিলেন?

১৪। হিউয়েন-সাঙ কার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন? তাঁর লিখিত বিবরণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

১৫। কো ন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'ত্রি-শক্তি সংগ্রাম' হয়েছিল? কোন্ কোন্ শক্তি এই সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল?

১৬। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? তিনি কি ভাবে সিংহাসনে বসেছিলেন?

১৭। ধর্মপাল কিং ভাবে উত্তর ভারতে অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন? তিনি কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন?

১৮। দেবপালকে পালসাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় কেন?

সপ্তম অধ্যায়

১। প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন্ যুগকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়? তার কারণ কি?

২। কালিদাস কোন্ রাজার সমসাময়িক ছিলেন? তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থের নাম কর। 'মুদ্রারাক্ষস' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

৩। গুপ্তযুগকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সুবর্ণযুগ বলে অভিহিত করার কারণ কি? গুপ্তযুগের অভূতপূর্ব উন্নতির মূলে কি কারণ ছিল?

৪। বাণভট্ট কে? তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থের নাম কর।

৫। প্রাচীন ভারতের একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৬। শীলভদ্র কে? দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ কে ছিলেন? তিনি কোথায় দেহরক্ষা করেছিলেন?

৭। সেনযুগের একজন খ্যাতনামা কবি এবং তাঁর একটি কাব্যের নাম কর।

৮। কৌলীন্য প্রথা কে প্রবর্তন করেছিলেন? কৌলীন্য প্রথার অর্থ কি?

৯। দক্ষিণ ভারতের তিনটি খ্যাতনামা রাজ্যের নাম কর। প্রাচীন তামিল রাজ্যগুলির সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১০। একজন প্রসিদ্ধ তামিল লেখকের নাম কর। তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে 'সঙ্গম' ও 'অষ্টসঙ্কলন'-এর গুরুত্ব কি?

১১। পল্লব, চালুক্য ও চোল শিল্পের একটি করে শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের উল্লেখ কর।

১২। মহাবলিপুরম কোথায়? তার ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণ কি?

১৩। 'আলবার' নামের অর্থ কি? রামানুজ কোন্ ধর্মের সাধক ছিলেন?

১৪। অদ্বৈতবাদ কে প্রচার করেছিলেন? এই মতবাদের মূলকথা কি?

অষ্টম অধ্যায়

১। মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চলে ভারতীয় নগর ও কর্মকেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ কে আবিষ্কার করেছিলেন? আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য কোন্‌টি?

২। অনুরাধাপুর কোথায় অবস্থিত? প্রাচীন যুগে চীনদেশে গিয়েছিলেন, এমন দুজন প্রসিদ্ধ ভারতীয়ের নাম কর।

৩। বোধিসেন কে? শ্রীক্ষেত্র কোন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল? পাগান রাজ্যের রাজধানীর কি নাম ছিল?

৪। 'বৃহত্তর ভারত' শব্দের তাৎপর্য কি? প্রাচীন কম্বুজ রাজ্যের রাজধানী কি ছিল? ঐ শহরের স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কি?

৫। প্রাচীন চম্পা রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল? এই রাজ্য কে স্থাপন করেছিলেন? এই রাজ্যের প্রধান ধর্মকেন্দ্রের নাম কি ছিল?

৬। বরবুদুরের বৌদ্ধস্তূপের স্রষ্টা কারা ছিলেন? যবদ্বীপের প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ঐ রাজ্যের রাজধানীর নাম কি?

নবম অধ্যায়

১। সবুক্তিগীন কোন্ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন? তাঁর পুত্রের নাম কি? ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি কি জন্য প্রসিদ্ধ?

২। দাসবংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন? 'দাসবংশ' নামকরণ কেন হয়েছিল? ইলতুৎমিসকে এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা হয় কেন?

৩। গিয়াসউদ্দীন বলবন কোন্ বংশের শাসক ছিলেন? তিনি কি ভাবে তাঁর সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করেছিলেন?

৪। আলাউদ্দীন খলজী কি উপায়ে সিংহাসন লাভ করেছিলেন? তিনি কি ভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন? তাঁর একজন বিখ্যাত সভাসদের নাম কর।

৫। আনন্দপাল, পৃথ্বীরাজ, মালিক কাফুর এবং আমীর খসরু কে এবং কেন বিখ্যাত?

৬। ইতিহাসে 'পাগলা রাজা' নামে কে পরিচিত? তাঁকে এই নামে অভিহিত করার কারণ কি? এই নামকরণ কি সত্যই যুক্তিসংগত?

৭। মহম্মদ বিন্ তুঘলকের পর কে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন? তাঁর রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৮। বাবরের বংশপরিচয় দাও। তিনি কি ভাবে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন?

৯। মেবারের দুজন বিখ্যাত রাণার নাম কর এবং তাঁদের বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা কর।

১০। কোন্ আফগান নেতা মুঘলদের পরাজিত করে উত্তর ভারতে আফগান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? মুঘল সম্রাটের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কাহিনী বিবৃত কর।

১১। শাসকরূপে শের শাহের কৃতিত্ব পর্যালোচনা কর।

১২। বৈরাম খাঁ কে? তিনি কেন বিখ্যাত? তাঁর পরিণতি কি হয়েছিল?

১৩। সম্রাটরূপে আকবরের সাফল্যের কারণ কি ছিল?

১৪। সুশাসক এবং শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগীরূপে আকবরের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

১৫। নূরজাহান কে ? তাঁর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে কে বিদ্রোহ করেছিলেন?

১৬। শাহজাহানের রাজত্বকাল গৌরবময় বলে খ্যাত কেন? তাঁর রাজত্বকালের শেষ দিকে তাঁর কোন্ কোন্ পুত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধেছিল?

১৭। 'আলমগীর' শব্দের অর্থ কি ? ঔরংজীবের ধর্মনীতি কি ছিল ? এই ধর্মনীতির পরিণাম কি হয় ?

১৮। দুর্গাদাস ও রাজসিংহ কে ছিলেন ? রাজপুতদের সঙ্গে ঔরংজীবের সংঘর্ষের কাহিনী বর্ণনা কর।

১৯। 'পার্বত্য মূষিক' বলতে কাকে বোঝায়? 'দাক্ষিণাত্যের ক্ষত' কথাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি?

২০। ঔরংজীবের চরিত্রের প্রশংসনীয় দিকগুলির উল্লেখ কর। কোন্ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ঔরংজীবের রাজত্বকাল সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেছেন ?

২১। নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ দুরানী কে ছিলেন? নাদির শাহের ভারত আক্রমণের ফল কি হয়েছিল? আহম্মদ শাহ আবদালি কোন্ ঐতিহাসিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন ? ঐ যুদ্ধে তাঁর প্রতিপক্ষ কারা ছিল ?

দশম অধ্যায়

১। মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলনের দুজন পুরোধার নাম কর এবং তাঁদের বাণী আলোচনা কর।

২। শ্রীচৈতন্যদেব কোথায় জন্মেছিলেন ? তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূল কথা কি ? তাঁর একজন প্রধান শিষ্যের নাম কর।

৩। নামদেব ও একনাথ কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন ? তাঁদের শিক্ষার মূল কথা কি ?

৪। শিখ ধর্মের প্রবর্তক কে ? তাঁর প্রচারিত ধর্মমত আলোচনা কর।

৫। দুজন সুফী সাধকের নাম কর। লোকসাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ কর।

৬। 'মনসামঙ্গল', 'পৃথ্বীরাজরাসো,' 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'—এই তিনটি কাব্যের রচয়িতাদের নাম বল। মীরাবাঈ-এর জন্মস্থান কোথায়? তিনি কেন প্রসিদ্ধ?

৭। সুলতানী যুগের শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য কি ছিল ? এই শিল্পরীতির তিনটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের উল্লেখ কর।

৮। মুঘল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৯। মুঘল যুগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১০। মুঘল যুগের দুজন সাহিত্যিক ও তাঁদের একটি করে গ্রন্থের নাম কর।

১১। ইন্দো-পারসীক শিল্প বলতে কি বোঝায়? এই শিল্পরীতির দুটি নিদর্শনের উল্লেখ কর।

১২। মুঘল যুগে প্রচলিত দুটি চিত্রকলার নাম কর। আকবরের সভাসদ একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পীর নাম বল।

একাদশ অধ্যায়

১। মারাঠা জাতীয়তাবাদের উন্মেষে সহায়তা করেছিলেন এমন এক জন ধর্মসংস্কারকের নাম কর। মহারাষ্ট্রের একটি নদী ও একটি পর্বতের নাম বল।

২। শিবাজীর জন্মস্থান কোথায়? তিনি কাদের নিয়ে প্রথম সৈন্যদল গঠন করেন? তিনি প্রথম কোন দুর্গ জয় করেন? তাঁর রাজ্যাভিষেক কোন্ সালে হয়েছিল?

৩। শিবাজীর সঙ্গে ঔরংজীবের সংঘর্ষের কাহিনী বিবৃত কর।

৪। 'পেশোয়া' পদের উৎপত্তি কি ভাবে হয়েছিল? 'চৌথ', 'সরদেশমুখী', 'বারগীর' ও 'শীলাদার', বলতে কি বোঝায়?

৫। পেশোয়াতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন? তাঁর শাসনকাল পর্যালোচনা কর।

৬। 'হিন্দুপাদশাহী' শব্দের অর্থ কি? কে হিন্দুপাদশাহী প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন? তাঁর কৃতিত্বের আলোচনা কর।

৭। মারাঠা রাজ্যসঙ্ঘ বলতে কি বোঝায়? মারাঠা রাজ্যগুলির নাম কর।

৮। বালাজী বাজীরাও কে? তাঁর সময় কোন্ ঐতিহাসিক যুদ্ধ হয়েছিল? ঐ যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং যুদ্ধের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৯। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান কোন্ সন্ধির দ্বারা হয়েছিল? ঐ সন্ধির সর্ত কি ছিল?

১০। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় পেশোয়া কে ছিলেন? এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?

১১। 'গ্রন্থসাহেব' কি? এটি কে সঙ্কলন করেছিলেন? মসন্দ প্রথা কে প্রবর্তন করেন?

১২। তেগ বাহাদুর কে ? তাঁর কিভাবে মৃত্যু হয়েছিল ? তাঁর পুত্রের নাম কি ?

১৩। গুরু গোবিন্দ শিখ ইতিহাসে কিভাবে নবযুগের সূচনা করেছিলেন ?

১৪। মোট ক'জন শিখগুরু ছিলেন ? প্রথম ও শেষ গুরুর নাম কর। 'খালসা' শব্দের অর্থ কি ? 'খালসা' সৃষ্টির তাৎপর্য কি ?

১৫। 'মিসল' এর উৎপত্তি কি ভাবে হয়েছিল ? ঐক্যবদ্ধ শিখরাজ্য কে স্থাপন করেছিলেন ? তাঁর সঙ্গে ইংরাজদের কোন্ সালে সন্ধি হয়েছিল? ঐ সন্ধির নাম কি ? সন্ধির সর্ত কি ছিল?

১৬। বান্দা কে ? তিনি কেন প্রসিদ্ধ ? 'পাঞ্জাব কেশরী' কাকে বলা হয় ? তাঁর কৃতিত্ব আলোচনা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোন্ সালে গঠিত হয় ? ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কোথায় ইংরাজ কুঠি নির্মিত হয় ? কলকাতা নগরীর পত্তন কে কোন্ সালে করেছিলেন ? কলকাতায় নির্মিত দুর্গের নাম কি ছিল ?

২। 'প্রেসিডেন্সি' শব্দের অর্থ কি ? ভারতবর্ষে তিনটি ইংরাজ প্রেসিডেন্সির নাম কর।

৩। ডুপ্লে কে ছিলেন ? তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল ? তাঁর উদ্দেশ্য কেন ব্যর্থ হয়েছিল ?

৪। কটি কর্ণাটকের যুদ্ধ হয়েছিল? কর্ণাটকের তখন নবাব কে ছিলেন? কর্ণাটকের যুদ্ধের দুজন ফরাসী ও একজন ইংরাজ নায়কের নাম কর।

৫। সিরাজদ্দৌলা কোন্ সালে নবাব হন ? তাঁর সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধের কারণগুলি আলোচনা কর।

৬। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পক্ষের দুজন বীর সেনাপতির নাম কর। কোন সর্তে মীরজাফরের সঙ্গে ইংরাজদের ষড়যন্ত্র হয়েছিল ? এই যুদ্ধের গুরুত্ব কি?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। ১৭৫৭, ১৭৬৪ এবং ১৭৬৫—এই তিনটি সালের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

২। মীরকাশিম কোন্ সময় বাংলার নবাব হয়েছিলেন ? তাঁর সঙ্গে ইংরাজদের কেন বিরোধ দেখা দিয়েছিল ? মীরজাফর ও মীরকাশিমের চরিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কি?

৩। হায়দার আলি কে ছিলেন ? তাঁর সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধের কাহিনী বর্ণনা কর। হায়দারের পুত্রের নাম কি ?

৪। টিপু সুলতানের পিতার নাম কি ? টিপুর সঙ্গে ইংরাজদের সংঘর্ষের কাহিনী বিবৃত কর।

৫। অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতির প্রবর্তক কে ? এই নীতিটি ব্যাখ্যা কর।

৬। পিণ্ডারী কারা ? পিণ্ডারীদের কে এবং কিভাবে দমন করেছিলেন ?

৭। প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের কাল নির্ণয় কর। ঐ সময় শিখদের নেতা কে ছিলেন ? কোন্ সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়েছিল ?

৮। স্বত্বলোপ নীতির প্রবর্তক কে ? এই নীতিটি ব্যাখ্যা কর।

৯। ডালহৌসী প্রধানতঃ কোন্ নীতির সাহায্যে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন ? তাঁর উদ্দেশ্য কি ছিল ? ডালহৌসীর নীতির কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ?

চতুর্দশ অধ্যায়

১। দ্বৈতশাসন কে প্রবর্তন করেছিলেন ? দ্বৈতশাসন বলতে কি বোঝায় ? এই শাসনব্যবস্থার কুফল কি হয়েছিল ?

২। প্রথম গভর্নর-জেনারেল কে? তাঁর রাজস্ব ও বিচার-বিষয়ক সংস্কারগুলি আলোচনা কর।

৩। রেগুলেটিং অ্যাক্ট কোন্ সালে প্রবর্তিত হয় ? এই অ্যাক্টের সর্তগুলি উল্লেখ কর।

৪। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোন্ সালে এবং কে প্রবর্তন করেন ? এই বন্দোবস্ত বলতে কি বোঝায় ?

৫। সংস্কারক রূপে উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৬। সতীদাহ প্রথা কোন্ গভর্নর-জেনারেল উচ্ছেদ করেছিলেন ? কোন্ ভারতীয় নেতা এই প্রথার অবসানে সহায়তা করেছিলেন ? বিধবাবিবাহ আইন কোন্ বৃটিশ শাসকের সময় প্রবর্তিত হয়েছিল ? বিধবাবিবাহ আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন ?

৭। উইলিয়াম কেরী এবং ডেভিড হেয়ার কেন প্রসিদ্ধ ?

৮। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালের শিক্ষাসম্বন্ধীয় দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার নাম কর।

৯। শিশুহত্যা প্রথা কে নিষিদ্ধ করেছিলেন? কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ কার শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত হয়? সতীদাহ প্রথার অবসান কোন সালে হয়েছিল? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

১০। উনিশ শতকের নবজাগরণের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

১১। রাজা রামমোহন রায়কে ভারতবর্ষে নবযুগের প্রবর্তক রূপে অভিহিত করার সপক্ষে তাঁর তিনটি উল্লেখযোগ্য কাজের আলোচনা কর।

১২। ব্রাহ্মসমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? এই সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি ছিল? পরবর্তী যুগের ব্রাহ্ম নেতাদের মধ্যে দুজনের নাম কর।

১৩। ডিরোজিও কে ছিলেন? তাঁর অনুগামী ছাত্ররা কি নামে পরিচিত হয়েছিলেন? তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে দুজনের নাম কর।

১৪। নব্যবঙ্গীয় বলে কারা পরিচিত হয়েছিলেন? তাঁদের প্রগতিশীল ভূমিকার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর।

১৫। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ব্রাহ্ম আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা আলোচনা কর।

১৬। রবীন্দ্রনাথের পিতা ও পিতামহের নাম কি? বাংলার নবজাগরণে তাঁদের অবদান কি ছিল?

১৭। প্রার্থনা-সমাজের নীতি ও আদর্শ কি ছিল? এই সমাজের একজন বিশিষ্ট নেতার নাম কর।

১৮। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে? এর মূলনীতি ও কর্মসূচীর আলোচনা কর।

১৯। 'যত মত তত পথ'—এই বাণী কার? তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য কে?

২০। 'দয়ার সাগর' নামে ইতিহাসে কে পরিচিত? শিক্ষাবিস্তারে তাঁর অবদান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২১। আলিগড়ে অ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

১। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের আগে বৃটিশ-বিরোধী তিনটি আন্দোলনের এবং দুজন নেতার নাম কর।

২। মহারাজ নন্দকুমার, ধুন্দিয়া ও ওয়াজির আলি কেন প্রসিদ্ধ?

৩। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

৪। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করার পক্ষে এবং বিপক্ষে যে মতগুলি আছে তা আলোচনা কর।

৫। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের তিনজন নেতার নাম এবং তাঁরা কোথাকার অধিবাসী ছিলেন তা উল্লেখ কর।

৬। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

৭। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের ফলাফল কি হয়েছিল?

বিষয়মুখ প্রশ্ন
(Objective Questions)

(ক) নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলি ভুল না নির্ভুল × চিহ্ন অথবা √ চিহ্ন দিয়ে নির্ণয় কর ঃ

(উদাহরণ ঃ

গঙ্গা ও সিন্ধুনদীর উৎসস্থল হিমালয়। √

প্রাচীন গ্রীসদেশের সভ্যতা "নীলনদের দান" রূপে খ্যাত। ×)

১। প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ ইতিহাস-সচেতন ছিল না। —

২। মধ্যযুগের ইতিহাসের অন্যতম উপাদান ফা-হিয়েনের বিবরণ। —

৩। সিন্ধু সভ্যতা মূলতঃ ছিল নাগরিক সভ্যতা। —

৪। আর্য সভ্যতা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা। —

৫। বৈদিক আরাধনার অন্তর্নিহিত মূল আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল একই ঈশ্বরের পূজা বা একেশ্বরবাদ। —

৬। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় সন্ধান করা বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান লক্ষ্য। —

৭। কুষাণ যুগের সূচনা করেছিলেন কণিষ্ক। —

৮। ঐতিহাসিক স্মিথ সমুদ্রগুপ্তকে "ভারতের নেপোলিয়ন" আখ্যা দিয়েছেন। —

৯। হিউয়েন-সাঙ হর্ষের রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন। —

১০। পাল রাজত্বের সূচনা করেছিলেন শশাঙ্ক। —

১১। কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন বল্লাল সেন। —

১২। আঙ্কোরভাট বিষ্ণুমন্দিরটি সিংহলে অবস্থিত। —

১৩। শৈলেন্দ্রবংশের স্থাপত্যকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বরবুদুরের বৌদ্ধস্তূপ। —

১৪। কুতবউদ্দীন দাসবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। —

১৫। আলাউদ্দীন খলজী দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। —

১৬। বাবর খানুয়ার যুদ্ধে রাণা সঙ্গকে পরাজিত করেন। —

১৭। তানসেন আকবরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। —

১৮। জাহাঙ্গীর হলদিঘাটের যুদ্ধে রাণা প্রতাপকে পরাজিত করেন। —

১৯। শাহজাহানের রাজত্বকাল থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। —

২০। ঔরংজীবের দাক্ষিণাত্য নীতি সাফল্যলাভ করেছিল। —

২১। মুঘল শাসনব্যবস্থা ছিল সামরিক শক্তিনির্ভর ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র। —

২২। শিবাজী আফজল খাঁকে নিহত করেছিলেন। —

২৩। গুরু গোবিন্দ ছিলেন নবম শিখ গুরু। —

২৪। লর্ড ওয়েলেসলি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন। —

২৫। লর্ড ডালহৌসীর সময় দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। —

২৬। উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। —

২৭। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। —

২৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। —

২৯। সৈয়দ আহম্মদ আলিগড়ে অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। —

৩০। লর্ড ক্যানিং ছিলেন ভারতের প্রথম ভাইসরয়। —

(খ) কোন্ উত্তরটি সঠিক নির্দেশ কর ঃ

(উদাহরণ ঃ প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদেশিক আক্রমণের সূচনা করেন (ক) আলেকজাণ্ডার (খ) কুজল কদফিস্ (গ) কুরুস। উত্তর ঃ কুরুস)

১। আর্য সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল ঃ (ক) প্রত্ন-তাত্ত্বিক উপাদান (খ) রামায়ণ-মহাভারত (গ) বৈদিক সাহিত্য (ঘ) বৈদেশিক বিবরণ।

২। মগধ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন ঃ
(ক) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ) বিন্দুসার (গ) অশোক (ঘ) বিম্বিসার।

৩। সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয় ঃ
(ক) মৌর্য যুগকে (খ) কুষাণ যুগকে (গ) পাল যুগকে (ঘ) গুপ্ত যুগকে।

৪। বিক্রমশিলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন ঃ
(ক) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ (খ) শীলভদ্র (গ) জ্ঞানভদ্র (ঘ) বোধিসেন।

৫। ভারতে মুসলমান বিজয়ের সূচনা করেছিলেন ঃ
(ক) বাবর (খ) আলাউদ্দীন খলজী (গ) মহম্মদ বিন্ কাসিম (ঘ) কুতবউদ্দীন।

৬। কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' ও কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' রচিত হয়েছিলঃ (ক) গুপ্তযুগে (খ) সেনযুগে (গ) সুলতানী যুগে (ঘ) মুঘল যুগে।

৭। "চৌথ" ও "সরদেশমুখী" ছিলঃ
(ক) দুজন রাজার নাম (খ) জায়গার নাম (গ) দুই প্রকার কর (ঘ) দুই শ্রেণীর সৈন্য।

৮। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেনঃ
(ক) লর্ড ক্যানিং (খ) লর্ড ডালহৌসি (গ) লর্ড ওয়েলেসলি।

(গ) সমায়ানুক্রমিকভাবে সংখ্যা নির্দিষ্ট কর ঃ

(উদাহরণ ঃ হুমায়ুন ২ ঔরংজীব ৬ জাহাঙ্গীর ৪
বাবর ১ আকবর ৩ শাহজাহান ৫)

১। কুষাণ যুগ
মৌর্য যুগ
হর্ষের রাজত্বকাল
গুপ্ত যুগ
পাল যুগ

২। মেগাস্থিনিস
আবুল ফজল
মহাবীর বর্ধমান
কালিদাস
দয়ানন্দ সরস্বতী

৩। আলাউদ্দীন খলজী
ইব্রাহিম লোদী
মহম্মদ বিন্ তুঘলক
ইলতুৎমিস

৪। দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ
বক্সারের যুদ্ধ
দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ
হলদিঘাটের যুদ্ধ

৫। বিধবা বিবাহ আন্দোলন
ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
সতীদাহ প্রথার অবসান

(ঘ) নিম্নলিখিত তারিখগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি ?

২৭৩ খ্রীঃ পূঃ ; ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ ; ১৫২৬ ; ১৫৫৬ ; ১৭৫৭ ; ১৭৬১ ; ১৭৬৪ ; ১৭৬৫ ; ১৭৯৩ ; ১৮৫৭।

Bose: History of India for Class IX, Bengali.

Rs 5·50